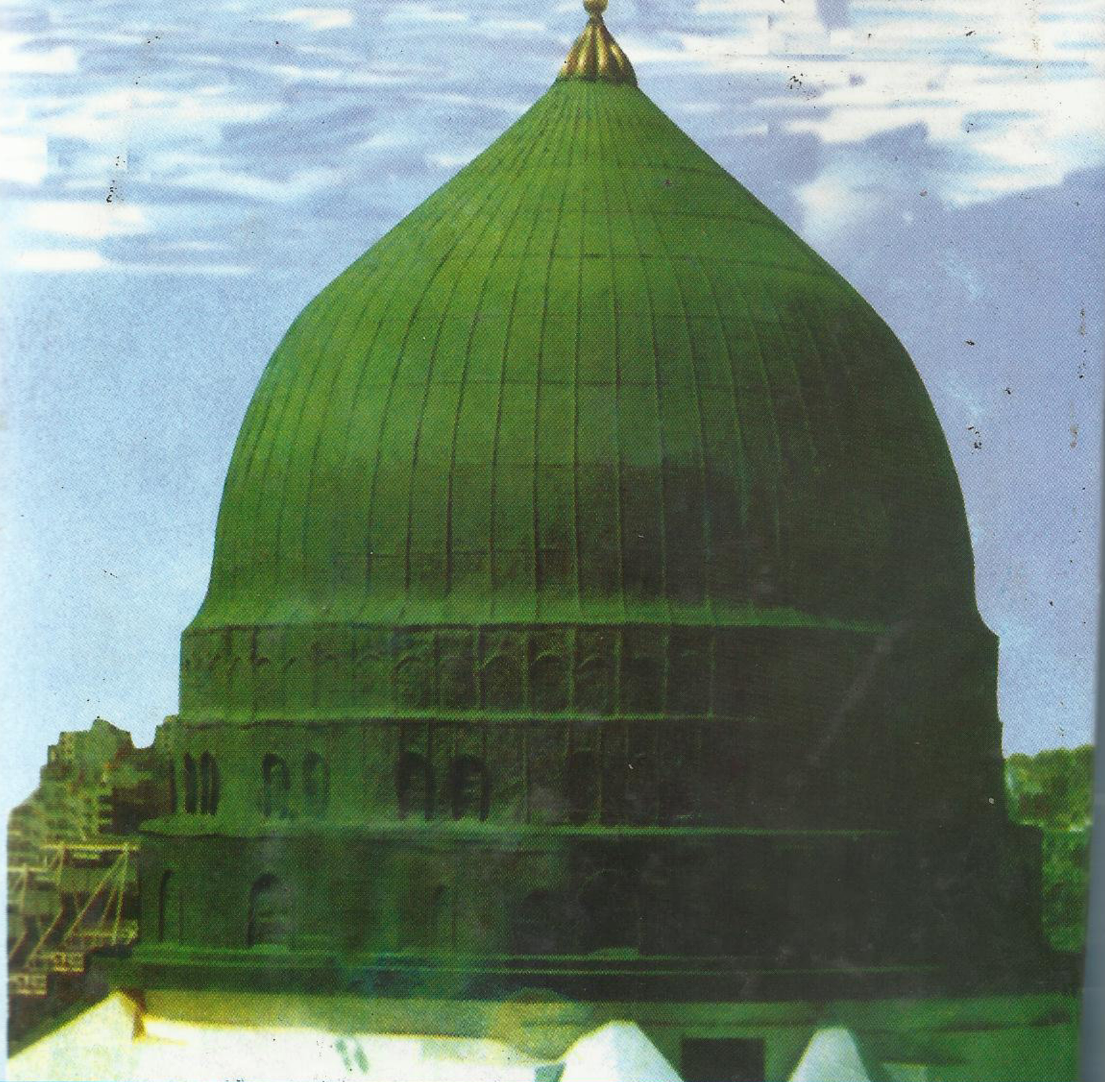
صلی الله علیه وسلم

# فرمانِ مصطفٰی

# ফরমানে মোস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম



রচনায় ঃ মুর্শেদে বরহক রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত হযরতুল আল্লামা আল্হাজ্ব মোহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী আল্-চিশ্তী আস্-সাঈদী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায় ঃ আন্জুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া সাঈদীয়া বাংলাদেশ
ছিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

# ফরমানে মুস্তফা

(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছল্লাম)

فَرْمَانِ مُصْطَفٰے (صلی اللہ علیہ وسلم)


রচনায়

মুর্শেদে বরহক রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও তরিক্বত হযরতুল
আল্লামা আল্হাজ্ব মোহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী
আল্- চিশ্তী আস্-সাঈদী (মা. জি. আ.)



প্রকাশনায়

আন্জুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া সাঈদীয়া,বাংলাদেশ।
ছিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ফরমানে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছল্লাম)

فَرْمَانِ مُصْطَفٰے (صلی اللّٰہ علیہ وسلم)

রচনায়

মুর্শেদে বরহক রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও তরিক্বত হযরতুল
আল্লামা আল্হাজ্ব মোহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী
আল্- চিশ্তী আস্-সাঈদী (মা. জি. আ.)

অনুবাদ
এম, ছগীর আহমদ ওছমানী

প্রথম সংস্করণঃ ১৯৭৮ ইংরেজী
দ্বিতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর ২০০৩ ইংরেজী

সংস্করনে
এম, এম, মহিউদ্দীন

কম্পোজ
এট্যাচ এ্যাড, ৩৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণেঃ
কাজেমী অফসেট প্রিন্টার্স
মোমিন রোড, কদম মোবারক, চট্টগ্রাম।

মুল্যঃ ৯০ (নব্বই) টাকা মাত্র

## সূচীপত্র

**বিষয়** **পৃষ্ঠা**

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

## গুজারিশ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالۡعَاقِبَةُ لِلۡمُتَّقِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصۡحَابِهٖ اَجۡمَعِيۡنَ. اما بعد!

মুসলিম সমাজের খেদমতে অধমের আরজ এই– বর্তমান যুগে বিভিন্ন প্রকার দলাদলি ও ফেরকাবন্দী এবং মুসলমানদের ছহীহ্ আক্বীদা বিকৃতির অপপ্রচেষ্টা চলিতেছে। বিধায় প্রত্যেক দ্বীনদার মুসলমান এবং উদার প্রকৃতির লোকেরা বিভিন্ন ফেৎনা-ফাসাদের খপ্পরে পড়িতেছে। বস্তুতঃ এই যুগে ঈমান রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অধিকন্তু মুসলমান সমাজের ভিতরে আল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহর জিকির হইতে অলসতা প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে। অতঃপর উল্লেখিত সকল বিষয়ের দিকে খেয়াল করিয়া স্বল্পজ্ঞান হেতু অধম দুই-চারটি শব্দ পাঠক সমাজের সম্মুখে পেশ করিলাম, যেন মুসলিম সমাজ ছহীহ্ আক্বীদা এবং সঠিক পথের সন্ধান পায়। এই কিতাবে প্রত্যেক মাছয়ালা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। অত্র কিতাবের নাম 'ফরমানে মুস্তফা' রাখা হইল।

অধম না কিতাব লেখার এমনই মহান দায়িত্বের উপযুক্ত না অধিকারী। উপরন্তু, উক্ত কাজ আন্‌জাম দেওয়ার জন্য এই অধমের সময়ও বা কোথায়? কারণ ইহা সর্বজন বিদিত যে, ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া মাদ্‌রাসার (বর্তমানে অত্র মাদ্‌রাসা কামিল হাদিস,তাফ্ছীর, ফিক্হ ও আবদসহ চার গ্রুপ মাষ্টার্স মানের) যে ভারী বোঝা এই অধমের ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে, উহা হইতে পরিত্রাণও মিলিতেছে না। সুতরাং এইরূপ অবসর ও বিরামহীন অবস্থা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে এই কয়েকটি কথা লেখনী শক্তির জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হইল। নতুবা মাদ্‌রাসার খরচ বহন এবং অন্যান্য কাজের ব্যস্ততা সুযোগ দিতেছে না। এক দিকে তো দায়িত্বের ভার, অপর দিকে জ্ঞানের অভাব। তবুও এই সমস্ত দুর্বলতাকে উপেক্ষা করিয়া বিভিন্ন কিতাব হইতে চয়ন পূর্বক মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই কিতাবটি লেখা হইয়াছে। ভুল-ত্রুটি তো অধমের স্বভাবজনিত ব্যাপার। ইহাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে রাখিয়া ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া মাদ্‌রাসার 'দারুল ইশায়াত' বিভাগকে অবহিত করিবেন, যেন ভবিষ্যতে উহা সংশোধন করা হয়।

সুধী ও জ্ঞানী পাঠক সমাজের নিকট আরজ– আপনারা এই কিতাবটির বিষয়-বস্তুগুলি যত্ন সহকারে পাঠ করিবেন এবং ভালভাবে বুঝিতে যত্নবান হইবেন। জেদ ও হঠকারীতার দিকে কদম ফেলিবেন না। কেহই আমার অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না, বরং রচনার বিষয়-বস্তুর প্রতি ইনসাফ ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে অবলোকন করাই পাঠক সমাজের দায়িত্ব।

আমি হিংসুক এবং আজে-বাজে লোকের সমালোচনার কোন পরোয়া করি না, হ্যাঁ, আমার অনুপযুক্ততা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার অনুভব তো অবশ্যই আছে। কারণ স্বল্প জ্ঞান একটি যথার্থ অপারগতা। উহা স্বীকার করা অপরিহার্য। কিন্তু চেষ্টা করা তো মানবের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আজে-বাজে লোকের সমালোচনা এবং হিংসুক ও অসৎ প্রকৃতি লোকের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি যাহারা প্রতি মুহূর্তে সুযোগের সন্ধানে থাকে এবং ডানা সংযুক্ত করিয়া কাক বানাইয়া উড়াইয়া দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে।

জনৈক কবি সুন্দর বলিয়াছেন–

ان يسْمَعُوا ريبة طَارُوا بِهَا فَرَحًا + منى وَمَاسَمِعُوا مِنْ صَالِحِ دفنُوا

صم اِذَا سَمِعُوا خَيْرًا ذَكرت بِهٖ + وَاِنْ ذَكَرت بِسُوْء عِنْدهُمْ اذنُوْا

"যদি তাহারা আমার সম্পর্কে কোন ত্রুটি ও সন্দেহযুক্ত কথা শুনে, তবে তাহারা ঢাক-ঢোল পিঠাইয়া থাকে। আর যখন আমার কোন সুখ্যাতির কথা শুনে, তখন তাহারা উহাকে গোপন করিয়া ফেলে।

এইরূপ লোকেরা আমার সুখ্যাতি শুনিতে বধির হইয়া পড়ে আর যখন আমার দুর্নাম করা হয়, তখন তাহারা কান পাতিয়া উহা শুনিয়া থাকে।"

অবশেষে আমার অন্তর ইহা বলিয়া উঠিল যে, ঐ রকম আলাপ-আলোচনা তো হইয়াই থাকে, সমালোচনাও হইয়া থাকে এবং ভুল-ত্রুটিও হইয়া থাকে। ইহাতে পিছপা হওয়া সবল চিত্ত লোকদের স্বভাব বিরোধী। কোনকবি বলিয়াছেন–

فَمَنْ ذَا الَّذِىْ تَرضٰى سجَايَاه كلّهَا + كَفٰى اَلْمَرْء نبلا ان تعد معَايبه

"এইরূপ কোন্ মানব সন্তান আছে, যাহার সকল অভ্যাসগুলি পছন্দনীয় হইবে? মানুষের শরাফত ও ভদ্রতার জন্য তাহার ত্রুটি গণনা হওয়াই যথেষ্ট।"



হিংসুক ব্যক্তিদের হিংসাও আমার লক্ষ্যণীয় নহে। যখন কোন কাজে সৎ-নিয়ত এবং সৎ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তখন হিংসুক ব্যক্তি নিজেই নিশ্চুপ হইয়া পড়ে।

اِذَا اَرَادَ اللّٰه نَشر فَضِيْلَة + طَوِيت بِهٖ لِسَان حسُوْد

"আল্লাহপাক যখন কোন গুপ্ত মান-মর্যাদাকে প্রচার করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তখন হিংসুক ব্যক্তিদের মুখ ও কণ্ঠ উহা প্রচার করিতে থাকে।"

اِذَا اَتَتْك مذمتى مِنْ نَاقِص + فَهِىَ الشَّهَادة لِى بانى كَامِل

اِذَا رَضيت عَنّى كرام عَشِيْرَتِىْ + فَلَازال عضبانا عَلٰى لئامِهَا

"যখন তোমার নিকট কোন নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষ হইতে আমার দুর্নাম পৌঁছিয়া থাকে, তখন তুমি মনে করিও যে, ইহাই আমি কামেল হওয়ার প্রমাণ। যদি ভদ্র সমাজ আমার সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে আমি পরোয়া করি না যে, এই হীনমনা এবং অভদ্র লোকেরা আমার বিরাগভাজন হইয়া পড়িবে।"

মোট কথা যে, অধীনের স্বল্প জ্ঞানের সাথে সাথে দরিদ্রতাও উল্লেখযোগ্য।

এই কিতাব ছাপানোর জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। অতঃপর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য ও সহযোগিতায় এই কিতাব ছাপানো হইয়াছে। আল্লাহপাক তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করিবার তৌফিক দান করুন এবং তাঁহাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে তরক্কী দান করুন।

আর মুসলমান সমাজের মঙ্গলার্থে মমতাজুল মুহাদ্দেছীন জনাব মাওলানা ছগীর আহমদ ওছমানী বি, এ, (অনার্স) সাহেব কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া মাদ্‌রাসার 'দারুল ইশায়াত' বিভাগে সমার্পন করা হইল।

পাঠক মহোদয়গণের খেদমতে আরজ– আপনারা এই কিতাব মুদ্রণে সাহায্যকারী, বঙ্গানুবাদক এবং প্রকাশক ব্যক্তিবর্গকে সর্বদা দোয়ায়ে খায়ের এবং মঙ্গল কামনার সহিত স্মরণ করিবেন।

এই কিতাবের সকল প্রকার স্বত্ব ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া

মাদ্‌রাসার নামে ওয়াক্‌ফ করা হইল।

অত্র মাদ্‌রাসার বুনিয়াদ আজ চার বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। (বর্তমানে অত্র মাদ্‌রাসার বয়স ইনত্রিশ বছর পূর্ণ হইতেছে) আল্লাহপাকের অশেষ করুণায়, আপনাদের এবং সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের দোয়া ও সাহায্যে বিশেষতঃ কয়েকজন প্রশংসা উপযোগী দানবীর যাঁহাদের নামোল্লেখ এইখানে সংকুলান হইবে না, তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাহায্য ও সহযোগিতায় ফাজিল (জমাতে উলা) পর্যন্ত সরকারী মঞ্জুরী (বর্তমানে অত্র মাদ্‌রাসা কামিল চার গ্রুপ সম্বলিত মাষ্টার্স মানের) এবং অনেক ছাত্র সংখ্যার একটি হেফজ খানা এই অল্প সময়ে দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। অত্র মাদ্‌রাসার অন্যান্য প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য অবস্থাদি আপনাদের স্বচক্ষে দর্শনের জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে যে, আপনাদের দোয়া এবং সাহায্যের বরকত ও গুণাগুণ কিভাবে বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হযরত হেলাল শাহ্‌ আউলিয়ার রূহানী ফয়েজ এবং তাওয়াজ্জুহও অত্র মাদ্‌রাসার উপর বর্ষিত হইতেছে। (তিনি বড় বড় ওলী উল্লাহ্‌গণের মধ্যে অন্যতম ওলী ছিলেন।) ভবিষ্যতেও অত্র মাদ্‌রাসা আপনাদের দোয়া ও সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের নিকট অধীনের আরজ– আপনারা এই মাদ্‌রাসার সাহায্যকারী, কমিটির সদস্যবৃন্দ, দানবীর মহাত্মাগণের জন্য সর্বদা দোয়ায়ে খায়ের করিবেন এবং এই মাদ্‌রাসাকে আপনার শুভ দৃষ্টিতে রাখিবেন।

অধীন এই কিতাবখানি ছাইয়্যাদুনা ইমামুল মুসলেমীন, নায়েবে মুজতাবা, মুজেজায়ে মুস্তফা হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা (রা.) এবং আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ও মুর্শেদ, মুহাদ্দিছে আযম, গাজ্জালীয়ে জামান, রাজীয়ে ওয়াক্ত, জুব্‌দাতুল আরেফীন নূরে চশ্‌মে আউলিয়া, হযরতুল আল্লামা কেবলা ছৈয়দ আহমদ সাঈদ আল্‌-কাজেমী শাহ্‌ ছাহেব (রাঃ) এর খেদমতে উৎসর্গ করিতেছি। আল্লাহপাক তাঁহাদের ওছিলায় এই সামান্য রচনাটুকু কবুল করুন এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য আর রচনাকারীর নাজাত ও গুনাহ্‌ মাফের সম্বল করে তুলুন। আমীন। ছুম্মা আমীন। বেহুর্‌মাতে ছাইয়্যাদিল মুর্‌ছালীন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন।

আরজগুজার–

**মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্‌-কাদেরী আল্‌- চিশ্‌তী আস্‌-সাঈদী**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# আমার কৈফিয়ত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ امّا بعد!

১৯৭৫ সাল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। নিজ বাড়ী থেকে যাওয়া-আসা করে লেখা পড়া করব। এই আশায় পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষকতা পদে ইস্তফা দিলাম। দুই মাস অবধি নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে নির্বাক-নির্জনতা, নিঃসঙ্গ জীবন নিজের মনকে পীড়া দিতে লাগ্‌ল। মানসিক শান্তিকুঞ্জ, ছায়াঢাকা, পাখী-ডাকা প্রকৃতির রম্য-লীলা ভূমি, স্বনামধন্য শিক্ষা-নিকেতন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতাদের কল-কলতানে মুখরিত সেই ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষাঙ্গন থেকে আজ বিচ্ছিন্ন। অতঃপর ভার্সিটির লেখা-পড়ার ফাঁকে কিছু দ্বীনি শিক্ষা চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া মাদ্‌রাসার নিঃস্বার্থ প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ইজম বিচিত্র রঙে রঞ্জিত বিভিন্ন ফেরকা, নতুন নতুন জামায়াত ও সম্প্রদায়ের বিষ-মিশ্রিত বর্শাঘাতে জর্জরিত মুসলিম সমাজের ত্রাণ-কর্তা, সাধকের সেবক, দুর্বলের সহায়ক, সাথীদের উপদেষ্টা, আহ্‌লে-ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, মুফাচ্ছেরে কুরআন, মুহাদ্দেছে জমান, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা আজিজুল হক আল্‌-কাদেরী সাহেবের শরণাপন্ন হই। তিনি আমার মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার মহান দায়িত্ব অধীনের ঘাঁড়ে চাপিয়ে দিলেন। (বর্তমানে ষোলশহর জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ট) যেন সেই দায়িত্ব পালনের ব্যবস্ততায় আমি ফেলে আসা দিনগুলিকে বিস্মৃতির অন্তরালে টেনে নিতে পারি। কিন্তু স্থানান্তর হেতু নানাবিধ অসুবিধা, শারীরিক শ্রম ও মানসিক কষ্ট অপ্রিয় বিদ্রূপ বাণী নৈরাশ্য আশংকায় ব্যাকুলতা এবং সহাধ্যায়ীগণের অনৈক্য জনিত বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে আমাকে কন্টক বহুল কর্তব্য পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

আলেমকুলের শিরমণি শ্রদ্ধেয় কাদেরী সাহেব মুসলিম সমাজের হাতে হেদায়তের লোকবর্তিকা তুলে দেয়ার জন্য মুসলমানদের ঈমান-আমল,

আক্বীদা-বিশ্বাস, চাল-চলন, রীতি-নীতি, তাহ্‌জীব তামাদ্দুন ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য কতগুলো হাদীস ও তার তরজমা এবং ব্যাখ্যা উর্দু ভাষায় সংকলন করেছিলেন। তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, "আপনি আমার এই পাণ্ডুলিপিগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে পুস্তকাকারে পাঠক সমাজের সম্মুখে উপনীত করুন।" আমি তাঁর উদ্দেশ্যের সার্থকতা সম্বন্ধে সাতিশয় সন্দিহান হয়ে বল্‌লাম, "জনাব! আমি তো কোন সাহিত্যিকও নই, কোন লেখকও নই, খলিফা মনসুরের সেই স্বর্ণ-যুগের কোন অনুবাদকের মত অনুবাদকও নই। হ্যাঁ আমার প্রতি আপনার যে নির্দেশ আরোপিত হয়েছে, উহার মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে সাধারণতঃ মানুষ যেভাবে লেখে, সেভাবে আমি আপনার সংকলিত হাদীস এবং রচিত উর্দু কথাগুলো বাংলা ভাষায় অনুদিত করে দিতে কৃত সংকল্প হলাম। কিন্তু আপনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী, সহজ প্রকাশ-শক্তি সুমার্জিত ও ভাষার আড়ম্বর বর্জিত কথাগুলোকে যথার্থভাবে বাংলা ভাষায় যে সকল রত্ন-রাজি লুক্কায়িত আছে, তদ্দারা অলংকৃত করে পাঠকের অন্তরে পৌঁছায়ে দেয়ার জন্য সাহিত্য-সাধনা, বিভিন্ন ভাষার অভিধান, উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি ইত্যাদির বিশেষভাবে প্রয়োজন। তিনি উত্তরে বললেন–

আমি যেরূপ অবসর ও বিরামহীন অবস্থা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে এই পাণ্ডুলিপি লিখেছি, তদ্রুপ আপনিও অনুবাদ-কার্য চালায়ে যান– করুণাময় খোদাতা'লার শান্তনা বাণী।

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(শীঘ্রই আল্লাহ্ কঠিনের পর সহজ করিবেন) আপনার লেখনী শক্তিকে জোরদার করে তুল্‌বে– ইনশাআল্লাহ্।

অঃতপর আমি এই ঐশিক বাণীকে শিরধার্য করে সর্বপ্রথম তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে চল্লিশটি হাদীসের বঙ্গানুবাদ কার্য আরম্ভ করি। কিছুদিন পরে দেখতে পাই 'ইরশাদে মুস্তফা' নামে একটি পুস্তিকাকারে উহা প্রকাশিত হলো– আল্ হামদুলিল্লাহ!

এর কিছুদিন পর তাঁর রচিত 'আল্ বায়ানুল মুসাফ্‌ফা ফি মাসায়ালাতে আবদিল মুস্তফা' রেছালাটিও বাংলা-ভাষায় অনুদিত করে মাদ্‌রাসার দারুল ইশায়াত বিভাগে হস্তান্তর করলাম। সময় বিশেষে উহাও প্রকাশিত হলো।



এবার পাঠকবৃন্দের চিত্তের দিকে অন্তর্দৃষ্টি রেখে আয়াস সাধ্য বহু পরিবর্ধন ও পরিযোজন সহকারে মুসলিম সমাজের ছহীহ আক্বীদা ও ছেরাতুল মুস্তাকিমের রাহ্‌বুর বা পথ-প্রদর্শক হিসেবে 'ফরমানে মুস্তফা' কিতাবটি অনুবাদ করতে প্রয়াসী হলাম।

এই কিতাব অনুবাদ কালে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় মেজো দাদা জনাব আছহাবুদ্দিন সাহেবের কৃতজ্ঞতা আন্তরিকতার সাথে প্রকাশ করছি।

আর উপযুক্ত পরিবেশ গঠন, উৎসাহ বর্ধন ও প্রেরণা দানের জন্য ছিপাতলী নিবাসী নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক, বিশিষ্ট দানশীল, দুর্বল ও গরীবের বন্ধু শ্রদ্ধেয় মরহুম ফয়েজ আহমদ মিস্ত্রী সাহেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি (আল্লাহপাক তাঁহাকে জান্নাত নছীব করুন)। আমার এই দুস্কর কাজে তাঁর বক্তব্য ছিল–

In this world's board field of battle,
In the bivouace of life,
Be not like drum-driven cattle,
Be a hero in the strife.

"বাপু! বিস্তৃত যুদ্ধের ক্ষেত্র এই যে জগত,
– এর মাঝে জীবনের নিত্য সাধনায়
হইও না ভেড়ী বিতাড়িত পশুবৎ,
হও বীর জীবনের এ যুদ্ধ-যাত্রায়।"

তাঁর এই প্রেরণা মিশ্রিত শান্তনা বাণী শুনে আমি মনকে দৃঢ় করলাম। প্রায় এক বৎসর কাল কাজ করে 'ফরমানে মুস্তফা' অনুবাদ কার্য শেষ করা হয়।

এই কার্যে আমার সহকর্মী বৃন্দকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের পরামর্শ এবং উৎসাহ আমার কার্যকে তরান্বিত করে তোলে।

আমার ভুল-ত্রুটিতো অনস্বীকার্য। পাঠকের মনের উদারতাই আমার লেখনী শক্তিকে আরোও সক্রিয় করে তুলবে।

আমার এই শ্রম, এই সাধনা, আমার এই নগন্য ত্যাগ "আমি যাকে ভালবাসি" তার স্মরণে উৎসর্গ করলাম।

ইতি

অনুবাদক

এম, ছগীর আহমদ ওছমানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ফরমানে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)

## কালেমায়ে তায়্যিবাহ্ পাঠের ফযিলত

عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيْلَ وَمَا اِخْلَاصُهَا قَالَ اَنْ تَهْجُرَهٗ عَنْ مُحَارِمِ اللّٰهِ. (رواه الطبرانى)

অনুবাদঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়িবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। জনৈক সাহাবা আরজ করিলেন, হুজুর! কলেমার এখলাছের চিহ্ন কি? হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উত্তরে বলিলেনঃ উহা সেই ব্যক্তিকে হারাম কাজগুলি হইতে বিরত রাখা। (তাবরানী)

ব্যাখ্যাঃ ইহা অতীব স্পষ্ট যে, যখন হারাম কাজগুলি হইতে বিরত থাকা যাইবে এবং কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'কে স্বীকার করা হইবে, তখন বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার মধ্যে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু যদিও কেহ হারাম কাজগুলি হইতে বিরত না থাকে, তবুও সে তাহার পাপ কর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করার পর ঐ কলেমার বরকতে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর! রোজ কিয়ামতে আপনার শাফায়াত হইতে সর্বাধিক কে লাভবান হইবে? হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ আমার শাফায়াত হইতে সর্বাধিক ঐ ব্যক্তিই লাভবান হইবে, যে অন্তরের একনিষ্ঠতার সহিত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে।



## হযরত মুছা (আঃ)-এর খাছ্ ওজিফা

হাদীস শরীফে আছে একদা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন যে, হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করিলেন, 'মুনিব! আমাকে কিছু ওজিফা শিখাইয়া দিন, যদ্দারা আমি তোমাকে স্মরণ করিতে পারি এবং তোমাকে ডাকিতে পারি। উত্তরে আল্লাহ্ তায়ালা বলিলেন যে, হে মুছা! 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতে থাক। মুছা (আঃ) বলিলেন, হে খোদা! এই কলেমা তো সমগ্র পৃথিবীর লোক বলিয়া থাকে। আল্লাহ বলিলেন, তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহই বলিতে থাক।' মুছা (আঃ) বলিলেন, 'মুনিব! আমি তো এমন কোন বিশিষ্ট জিনিস চাহিতেছি, যাহা শুধু আমাকেই দান করা হইবে।' আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, "যদি সপ্ত আসমান ও সপ্ত জমিন দাড়িপাল্লার এক পাশে রাখা হয় এবং অন্য পাশে কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রাখা যায়, তবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পার্শ্বটি ভারী হইবে।' (নেসায়ী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "এমন কোন আল্লাহ্‌র বান্দা নাই, যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিবে এবং তাহার জন্য আসমানের দরজাগুলি খুলিয়া না যাইবে, যাহাতে তাহার এই কলেমা আরশ পর্যন্ত সোজা পৌঁছিয়া যায়। হ্যাঁ, সে কবীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

## ঈমানকে কিভাবে তাজা করা যায়

অন্য একটি হাদীসে আছে– হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন যে, তোমরা তোমাদের ঈমানকে নতুন ও তাজা করিতে থাক। সাহাবাগণ আরজ করিলন, হুজুর! ঈমানকে কিভাবে নতুন ও তাজা করা হয়? তিনি উত্তরে বলিলেনঃ কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অধিকভাবে পড়িতে থাক। হাদীসে আছে– হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, আমি এইরূপ একটি কলেমা জানি, যে কোন আল্লাহর বান্দা উহা অন্তরের সহিত সত্য মনে করিয়া পাঠ করিবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হইয়া যাইবে। আর উহা হইল কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' হইল বেহেশ্‌তের চাবিকাঠি।

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আরও ফরমাইয়াছেন যে, আরশের সামনে নূরের একটি খুঁটি আছে, যখন কোন ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিবে, তখন ঐ খুঁটি দুলিতে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দেন, হে খুঁটি! স্থির হও। সেই খুঁটি আরজ করিল, প্রভু! কিভাবে আমি স্থির হইব? যেহেতু এখনও কলেমা তাইয়্যেবা পাঠকারীগণের গুনাহ মাফ করা হয় নাই। আল্লাহ্ বলেন, ঠিক আছে, আমি তাহাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিলাম। তখন ঐ খুঁটি স্থির হইয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে– হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– মানব জাতির মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অতি উত্তম, যে প্রতিদিন একশত বার কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে। তারপর তিনি বলিলেন, তাহার চেয়ে ঐ ব্যক্তিই অধিকতর উত্তম, যে শতাধিক উক্ত কলেমা পড়ে। জানিয়া রাখা আবশ্যক যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সহিত 'মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ'ও পাঠ করিবে অথবা, কয়েকবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করার পর 'মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ' পাঠ করিবে।

আরও স্মরণীয় যে, উক্ত কলেমার চেয়ে অন্য কোন উত্তম কলেমা নাই। সুতরাং সকল মু'মিন নর-নারীর কর্তব্য যে, সর্বদা যেন এই কলেমার অজিফা পাঠ করে।

## মু'মিন ও মুশ্‌রিকের মধ্যে পার্থক্য

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَابْنُ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ. (متفق عليه).

অনুবাদঃ হযরত ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার প্রেরিত



পুরুষ। আর হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁহার দাসী (মরিয়মের) পুত্র এবং আল্লাহর বাক্য যাহা মরিয়মের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি রূহ। বেহেশ্‌ত ও দোযখ বাস্তব ও সত্য। তবে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা তাহার পূণ্য কাজের অনুযায়ী বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।"

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীস হইতে কয়েকটি মাছয়ালা জানা যায়। প্রথমতঃ এই হাদীসে তাওহীদ ও রিসালাতের মৌলিক রহস্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং হযরত ঈসা (আঃ), বেহেশত ও দোযখ ইত্যাদি অবিশ্বাসীদের প্রতি উত্তর দেয়া হইয়াছে। জ্ঞাতব্য যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের মাছয়ালা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। মুশরিক ও তাওহীদ পন্থীর মধ্যে পার্থক্য তাওহীদের ভিত্তিতেই হইয়া থাকে আর মুমিন ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য তাওহীদ ও রিসালাতের মাধ্যমেই হইয়া থাকে।

## রিসালত অতীব সূক্ষ্ম রহস্য

ঈমানের অপর মৌলিক রহস্য হইল রিসালাত, আর এই রিসালাত অতীব সূক্ষ্ম রহস্য। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া অনেক লোক পদবিচ্যুত হয়। ফলে তাহারা তাওহীদের উপর অটল থাকা সত্বেও মুশরিক ও অমুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যেমন ইহুদীজাতি তাহাদের পয়গাম্বর মুছা (আঃ)কে তাহাদের মত মানুষ বলিয়া মনে করিত এবং তাঁহার শানে বেআদবী ও বিদ্রুপাত্মক শব্দ ব্যবহার করিত। খৃস্টানজাতি তাহাদের পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ) এর শান-মান ও মর্যদা বৃদ্ধি করিতে গিয়া কখনও খোদা বলিয়াছে আবার কখনও খোদার পুত্র বলিয়াছে (নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং বুঝা গেল যে, রিসালতের রহস্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ইহা তো অন্যান্য নবীগণের রিসালাতের ব্যাপারে বলা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তো নবীগণের নবী ও সরদার। তাঁহার রিসালাতের ব্যাপার তো আরও অধিকতর সূক্ষ্ম ও জটিল হইবে। কোন কোন লোকের ধারণা যে, রাসূলে করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাদের মত একজন মানুষ। শুধু পার্থক্য হইল এই যে, তাঁহার নিকট ওহী আসিয়াছে, আর আমাদের নিকট আসে নাই। বিশ্বনবী জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মুজতাবা ও

আল্লাহর প্রেমাস্পদ হওয়ার পদে উল্লেখিত ধারণা ও পরিচিতি দান অসম্পূর্ণ ও অমূলক। কেননা, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝখানে একটি বিরাট মাধ্যম। আর কোন কোন লোক বলিয়া থাকে যে, হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) অন্যান্য রাসূলগণের মত একজন রাসূল।

কিন্তু এই প্রকার ধারণা ভুল। কুরআন ও হাদীস সাক্ষ্য দান করে যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সমস্ত নবী ও রাসূলগণের সরদার। হ্যাঁ, রিসালাতের পদ হিসাবে সকল নবীই এক সমান। কিন্তু মর্যাদা ও বুজুর্গী হিসাবে মুহাম্মদ মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সমস্ত নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা সকল মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির ও ফকীহগণের সর্বসম্মত রায়। সুতরাং উহার অস্বীকারকারী ফাছেক ও মারদুদ।

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর রিসালতের দ্বারা খোদার প্রভুত্বের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়

হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আল্লাহতায়ালার সম্মানিত বান্দা ও কামেল রাসূল। তিনি বান্দা হওয়ার ফলে আল্লাহর রাবুবীয়াত চমৎকৃত হয় এবং তাঁহার রিসালতের দ্বারা আল্লাহর উলুহীয়াত বা প্রভুত্বের পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর বন্দেগী এবং অন্যান্য লোকের বন্দেগীর মধ্যে আসমান ও জমিন সাদৃশ্য পার্থক্য রহিয়াছে। অন্যান্য লোকের গৌরবের বিষয় এই যে, তাহাদের রব বা প্রতিপালক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আর আল্লাহপাকের গৌরবের বিষয় এই যে, 'আমার বান্দা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' অন্যান্য বান্দা আল্লাহকে রাজী করিতে চাহে, আর আল্লাহ তায়ালা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে রাজী করিতে চাহেন। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নামাজ-রোজা, হজ্ব ইত্যাদি পালন করিয়া থাকেন, ইহার অর্থ এই নহে যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাদের মত মু'মিন। নামাজ-রোজা ইত্যাদি পূণ্য কাজের দ্বারা আমাদের ইজ্জত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ঐ কাজ গুলি সম্পাদন করার ফলে ঐ কাজগুলির শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের গৌরব যে, আমরা নামাজ পড়িয়া থাকি। আর নামাজের গৌরব এই যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নামাজ পড়িয়াছেন।



## খ্রীষ্টানদের ভুল ধারণা

খ্রীস্টানগণ বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র এবং মরিয়ম (আঃ) খোদার স্ত্রী। ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে নবী বলিয়া অস্বীকার করে। আর পূণ্যাত্মা মরিয়মকে অপবাদ দিয়া থাকে। উল্লেখিত হাদীসে উভয় দলের লোকদের জবাব দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান যুগের কাদিয়ানীগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে ইউসুফ নাজ্জারের পুত্র বলিয়া থাকে। আর তাহার সহিত হযরত মরিয়মের বিবাহ প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। উল্লেখিত হাদীসে ইহাও খণ্ডন করা হইয়াছে। কেননা, যদি হযরত ঈসা (আঃ) পিতার ছেলে হইত, তবে তাহাকে তাঁহার পিতার দিকে সম্পর্ক করা হইত। কিন্তু কুরআনে তাঁহাকে 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' বলিয়াছে। হযরত জিব্রাঈল আল্লাহপাকের আদেশে 'কুন্' (হইয়া যাও) বলিয়া হযরত মরিয়মের বুকে ফুঁ দিলেন, যদ্বারা মরিয়ম গর্ভবতী হইলেন।

## হযরত ঈসা (আঃ)কে কেন কলেমাতুল্লাহ বলা হইয়াছে?

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর উপাধি ছিল 'কলেমাতুল্লাহ।' ইহার প্রথম কারণ হইল এই যে, 'কুন' কলেমা দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। হযরত আদম (আঃ)কে 'কলেমাতুল্লাহ' বলা হয় নাই, কেননা মাটি হইতে তাঁহার দেহ সৃষ্টি হয় এবং কলেমা 'কুন' দ্বারা রূহ তৈরী হয়। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) এর দেহ ও রূহ সমস্তই 'কুন' দ্বারা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় কারণ হইল এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর আপাদমস্তক আল্লাহ তায়ালার দলীল স্বরূপ। তাঁহার সারা শরীর যেন আল্লাহর কলেমা। তৃতীয় কারণ এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) একটি ফুঁ দিয়া রোগীকে সুস্থ এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতেন। চতুর্থ কারণ এই যে, তিনি জন্ম হওয়া মাত্রই কলেমা পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন– إِنِّي عَبْدُ اللهِ (ইন্নি আবদুল্লাহে) "আমি আল্লাহর বান্দা।"

## বুজুর্গানে দ্বীনের ঝাড়-ফুঁক হযরত ঈসা (আঃ) এর তরীকা

উল্লেখিত বর্ণনা হইতে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, বুজুর্গানে দ্বীনের ঝাঁড়-ফুঁক হযরত ঈসা (আঃ) এর তরীকার অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত হাদীসে اِنَّ عِيسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ (অর্থাৎ ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল) বলিয়া খ্রীস্টানদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে রহিত করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র। (নাউজুবিল্লাহ)

মোটকথা এই যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন বীর্যের মাধ্যম ব্যতীত হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম হয়। তাঁহার উপাধি 'রূহুল্লাহ'ও ছিল। কেননা, তিনি রূহুল আমিন জিব্রাঈলের ফুঁ দ্বারা জন্ম হন। অথবা তিনি মৃত শরীরে রূহ ঢালিয়া রূহ দান করিতেন।

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ বেহেশ্‌তে হুজুরের সাথে থাকিবেন

বেহেশ্‌ত ও দোযখ সত্য ও বাস্তব। আর ইহা অদৃশ্য বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপনের মাছয়ালা। ইহার ভিত্তিতে মানুষের ভাল-মন্দ বিচার করা হইবে। মর্যাদা অনুসারে বেহেশ্‌ত দেওয়া হইবে। আর নিম্নশ্রেণীর পরহেজগারগণকে বেহেশ্‌তের নিম্নস্থান দেওয়া যাইবে। আর ইহা ঐ ব্যক্তিদের জন্য হইবে, যাহারা স্বীয় কর্মের দ্বারা বেহেশ্‌ত লাভ করিয়াছে। যাহারা অন্যের ওছিলায় বা মাধ্যমে জান্নাতে যাইবেন, তাহারা তাহাদের ওছিলাদানকারী ব্যক্তিদের সহিত থাকিবেন। সুতরাং দুগ্ধপানকারী ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীগণ তাহাদের পিতামাতা ও স্বামীর সহিত থাকিবেন। অতঃপর রাসূলে করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম এবং হুজুরের স্ত্রীগণ বেহেশ্‌তে হুজুরের সাথে থাকিবেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশ ঈমানের ভিত্তিতে হইবে এবং তথাকার মান-মর্যাদা কর্মের ভিত্তিতে হইবে। বেহেশতে প্রবেশ তিন প্রকারে হইবে। (১) কসবী বা নিজের কর্মের মাধ্যমে (২) ওয়াহ্‌বী বা দান করার মাধ্যমে (৩) আতায়ী বা আল্লাহর প্রদানের মাধ্যমে। উক্ত হাদীসে নিজের কর্মের মাধ্যমে বেহেশ্‌তে প্রবেশ সম্পর্কে বলা হইয়াছে।



## শয়তানের মুয়াল্লেমুল মালাকুত উপাধি লাভ

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে প্রকৃত তাওহীদ পূজাকারী কে? এক প্রকার শয়তানী তাওহীদ পূজারক আছে। এই কথা সর্বজন বিদিত যে, শয়তানের মত তাওহীদ পূজাকারী ও আবেদ পৃথিবীতে আর কেহই ছিল না। সে আল্লাহ তায়ালার কোন ইবাদত বাকী রাখে নাই। নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত তাহার চেয়ে অন্য কোন বড় জ্ঞানী ছিল না। ইবাদত ও এলমের দ্বারা সে 'মুয়াল্লেমুল-মালাকুত' বা ফেরেশ্‌তাদের শিক্ষক উপাধি অর্জন করিয়াছিল। শয়তানের মত তাওহীদপন্থী অন্য কেউ ছিল না। ইহা সত্ত্বেও আল্লাহপাকের খলিফা ও প্রতিনিধিকে সম্মান প্রদর্শন না করার ফলে সে সর্বকালের ও সর্বযুগের অভিশপ্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। যদি তাহাকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য হুকুম দেওয়া হইত, তাহা হইলে সে সর্বপ্রথমে অগ্রবর্তী হইয়া এই হুকুম পালন করিত। তাহার দাবীও ইহাই ছিল যে, 'মুনিব! তুমি ব্যতীত আমি কাহারও ইবাদত ও সম্মান করিব? তুমি যাহাকে সম্মান করিবার জন্য আমাকে হুকুম দিতেছ, সে তো ইবাদত ও জ্ঞান-বিদ্যা কোন দিক দিয়া আমার চেয়ে বড় মর্যাদাবান নহে, সুতরাং আমি কেন তাহাকে সম্মান করিব?

## প্রকৃত তাওহীদ পন্থী কে?

পাঠকবৃন্দ! এই প্রকার তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী কোন মুসলমান আছে? নিশ্চয়ই নাই। বর্তমানেও যদি কোন ব্যক্তি সেই প্রকার তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করে, তবে উহা শয়তানী তাওহীদে পরিগণিত হইবে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের সম্মানিত খলিফা বা প্রতিনিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না, সে বাস্তবিক পক্ষে তাওহীদপন্থী বা একত্ববাদী হইবে না বরং সে মুশ্‌রিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। বস্তুতঃ তাওহীদ পন্থী ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং আল্লাহর প্রিয়তম মহাপুরুষগণের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিবে।

## নবী ও ওলীগণের সহিত বে-আদবী করা ও লোক দেখানো ইবাদত করা খারেজী সম্প্রদায়ের লোকের অভ্যাস

উল্লেখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিনিধি নবীগণের প্রতি সম্মান দেখাইবে না এবং আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা আউলিয়া কেরামের সম্মান করিবে না অধিকন্তু তাঁহাদের শানে বে-আদবী ও অশোভনীয় শব্দ প্রয়োগ এবং তাঁহাদের সম্মান হানিকর কথাবর্তা বলিবে সেই ব্যক্তিও শয়তানের মত অভিশপ্ত হইবে। দেখুন, আল্লাহর ইবাদত না করাতে ও আল্লাহর নিস্কলুষ তাওহীদকে অস্বীকারের ফলে সর্ব যুগের অভিশপ্ত ব্যক্তিতে পরিণত হইতে হয় নাই, বরং আল্লাহর নিকটতম ও প্রিয়তম খলিফা হযরত আদম (আঃ)কে সম্মান প্রদর্শন না করার ফলেই আল্লাহর রাহমত ও দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত এবং বেহেশ্‌ত হইতে বিতাড়িত হইল। তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নিকটতম ও প্রিয়তম বান্দা নবী ও ওলীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না, সে শয়তানের ভাই বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং আল্লাহর খাস রাহমত ও দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে।

ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, নবী ও ওলীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা তখনই আল্লাহর রহমতের সহিত লাভবান হওয়া যায়, যখনই আল্লাহর জন্যই ইবাদত করা হয় এবং তাঁহার সহিত অন্য কোন বাতিল ও অস্থায়ী বস্তুকে শরীক করা না হয়, আর নামাজ-রোজা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি শরীয়তের নির্দেশাবলীও পালন করা হয়। কোন কথা-বার্তা ইত্যাদিতে যদি বিন্দুমাত্র বে-আদবী ও অসম্মানীর গন্ধ আল্লাহর পয়গাম্বরগণের শানে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহাও প্রকৃত খাঁটি তাওহীদ হইতে বহির্ভুত এবং শয়তানী তাওহীদে পরিগণিত। অতঃপর সকলকে এই ব্যাপারে খুব সতর্কতার মাধ্যমে কথাবার্তা বলা উচিত, যেন কোথাও বে-আদবীর অবকাশ না থাকে।

যেমন খারেজী লোকদের কর্ণধার জুল খুয়াইশ্‌রাহ্ জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর সহিত বে-আদবী করিয়াছিল। যখন এই খারেজী সম্প্রদায়ের পূর্ণ বিকাশ হইল, তখন তাহারা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সহিত মারাত্মক বে-আদবী করিয়াছিল। মোটকথা এই যে, আল্লাহর নবী ও ওলীগণের সহিত বে-আদবী করা এবং তাঁহাদের



সম্পর্কে মর্যাদা হানিকর কথা বলা খারেজীদেরই অভ্যাস। বর্তমানেও যদি কেহই হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শানে বে-আদবী করে এবং আউলিয়া কেরামের সম্পর্কে মর্যাদা হানিকর অসদাচরণ করে, তাহা হইলে সেও খারেজী সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, "আমরা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তিনি হুনাইন যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মাল সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করিতেছিলেন, জুল খুয়াইশ্‌রাহ (সে বনি তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল, তাহার বংশধর হইতে 'খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়) হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! বন্টনের মধ্যে আপনি ইনসাফ করুন এবং সকলকে সমানভাবে প্রদান করুন।" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সাহাবাগণকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী দান করিতেছিলেন। তিনি জুলখুয়াইশরাহর কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার ক্ষতি হউক, যখন আমিই বে-ইন্‌সাফী ও অন্যায় বিচার করি, তখন আবার কে ইন্ সাফ করিবে? আমি যদি অন্যায় বিচার করি, তবে তুমি নৈরাশ হইয়াছ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ।" অতঃপর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আরজ করিলেন, "হুজুর! আমাকে আদেশ দিন, আমি তাহাকে খতম করিয়া দিই।" রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, না, ওমর! এখন তাহাকে ছাড়িয়া দাও। (হ্যাঁ তখনই হত্যা করা হইবে যখনই তাহারা অধিক সংখ্যক হইবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) যখন তাহাকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন উল্লেখিত শর্তগুলি বিদ্যমান ছিল না। যখন এই দলের লোক হযরত আলী (রাঃ) এর জামানায় প্রকাশ হয়, তখন হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) যে তাহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার এক কারণ, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নিজের জন্য কাহারও নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। যদি আমাদের এই যুগেও কেহই উল্লেখিত জুলখুয়াইশরাহের মত কাজ করে তবে তাহার সম্পর্কে কুফরী ও ধর্মত্যাগীরূপে ফতোয়া দেওয়া হইবে।) কারণ, এই লোকটির বংশ হইতে

এমন একটি জাতি আত্ম প্রকাশ করিবে, যাহারা তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে। তাহারা তোমাদের নামাজকে তাহাদের নামাজের তুলনায় তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। তাহারা লোক দেখানোর জন্য এবং মানুষকে শুনাইবার জন্যই ভালভাবে কেরাত পড়িবে। তাহারা তোমাদের রোজাকে তাহাদের রোজার তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে করিবে। (বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহাদের নামাজ-রোজা ইত্যাদি তোমাদের নামাজ-রোজা অপেক্ষা অধিকতর মজবুত হইবে, যদিও তাহাদের নামাজ-রোজা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।) তাহারা মধুর ও নরম সূরে কুরআন শরীফ পাঠ করিবে এবং কুরআনের তাজবীদ ও তারতীল, শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদি সুন্দর ও অধিকভাবে করিবে, অথচ কুরআন তাহাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাইবে না এবং তাহাদের কেরাত ও আমল আল্লাহর দরবারে কুবল হইবে না। শরীয়তের নির্দেশাবলী তাহাদের মুখ হইতে অতিক্রম করিয়া অন্তর পর্যন্ত পৌছিবে না এবং তাহাদের অন্তরে ইহার কোন প্রভাব সৃষ্টি হইবে না। তীরফলক যেমন ধনুক হইতে বাহির হইয়া যায়, তেমনি তাহারাও ধর্ম হইতে বাহির হইয়া যাইবে। (সংক্ষেপিত বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

## হাদীস দ্বারা খারেজীদের পরিচিতি

قَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشَرَّفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِتَّقِ اللّٰهَ قَالَ وَيْلَكَ اَوَلَسْتُ اَحَقَّ اَهْلِ الْاَرْضِ اَن يَّتَّقِى اللّٰهَ الخ.

অর্থাৎ যখন হুজুর গণিমতের মাল বন্টন করিতেছিলেন, তখন এমন একজন লোক দাঁড়াইয়া গেল, যাহার চক্ষুদ্বয় ভিতরের দিকে ধসিয়া গিয়াছে, কপাল বা গালের টোল দুইটি ফুলিয়া উঠিয়াছে, কপালখানি উঁচু হইয়া গিয়াছে, যাহার দাঁড়ী খুব বেশী ছিল, মথা মুড়ানো ছিল এবং লুঙ্গি উঁচু করিয়া পরিহিত ছিল, সে বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মাল বন্টনের মধ্যে ন্যায় বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখুন আর খোদার হুকুম মানিয়া চলুন।" এই কথা শুনিয়া হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, "তোমার ক্ষতি হউক, জমিনের বাসিন্দাগণের মধ্যে আমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় করার ব্যাপারে



অধিকতর উপযুক্ত নহি। অর্থাৎ আমি সকলের চেয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম অধিকভাবে মানিয়া চলি। তুমি আমাকে হুকুম মানিয়া চলার কি নির্দেশ দিতেছ?" (বুখারী শরীফ)

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) সেই ব্যক্তিকে হত্যার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বারণ করিলেন। অবশেষে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ এই লোকটির বংশ হইতে এমন একটি জাতি সৃষ্টি হইবে। তাহারা সুন্দর ও মধুর সূরে তাজবীদ সহকারে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিবে, কিন্তু এই কোরআন তাহাদের কণ্ঠ নালীর নীচে অতিক্রম করিবে না। তাহারা ইসলাম ধর্ম হইতে এইভাবে বাহির হইয়া যাইবে, যেইভাবে ধনুক হইতে তীর ফলক বাহির হইয়া যায়। যদি আমি সেই দলের লোকগুলিকে পাইতাম এবং আমার জামানায় তাহারা আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করিতাম যেভাবে 'কওমে আদ'কে হত্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে নির্মুলভাবে ধ্বংস ও খতম করিয়া দিতাম। (বুখারী)

উল্লেখিত বর্ণনাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহর নবীগণের শানে বে-আদবী করা খারেজী লোকদের আলামত এবং সেই বে-আদব জুল-খুরাইশরাহর বংশ হইতে যে জাতি জন্মলাভ করিবে, তাহারাও আম্বিয়া ও আউলিয়া কেরামের শানে নানা প্রকার বে-আদবী করিবে। ইহাই খারেজী হওয়ার বড় আলামত।

টীকাঃ হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম মাথায় চুল রাখিতেন, তাঁহারা মাথা মুড়াইতেন না। একমাত্র হযরত আলী (রাঃ) মাথা মুড়াইতেন। তাঁহার কারণ হইল এই যে, তিনি মনে করিতেন, যদি গোসলের পানি মাথায় না পৌছে! তাই তাঁহার জন্য মাথা মুড়ানোর অনুমতি ছিল। কিন্তু সুন্নত হইল নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের আমল অর্থাৎ মাথা না মুড়ানো।

## নামাজের মধ্যে দশটি গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ وَفِيْهَا عَشَرُ خِصَالٍ زَيْنُ الْوَجْهِ وَنُوْرُ الْقَلْبِ وَرَاحَةُ الْبَدَنِ وَاُنْسٌ فِىْ الْقَبْرِ وَمَنْزِلُ الرَّحْمَةِ وَمِفْتَاحُ السَّمَاءِ وَثِقْلُ الْمِيْزَانِ وَمِرْضَاةُ الرَّبِّ وَثَمَنُ الْجَنَّةِ وَحِجَابُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ. (منبهات ابن حجر)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– 'নামাজ ধর্মের খুঁটি এবং ইহার মধ্যে দশটি গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। (১) চেহারার সৌন্দর্য (২) অন্তরের আলোক (৩) শরীরের আরাম (৪) কবরের সাথী (৫) রাহ্‌মাত নাজেল হওয়া (৬) আসমানের চাবিকাঠি (৭) আমলনামার পাল্লাভারী হওয়া (৮) প্রভু আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্টিকারী (৯) বেহেশ্‌তের মূল্য এবং (১০) দোযখে আগুন হইতে প্রতিরোধকারী। আর যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামাজ পড়িয়াছে, সে ধর্মকে স্থির রাখিয়াছে এবং যে ব্যক্তি নামাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, সে নিশ্চয় ধর্মকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। (মুনাব্বাহাতে ইবনে হাজর)

ব্যাখ্যাঃ নামাজ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একটি বড় নেয়ামত। ইহা মুসলমানদের মি'রাজ বিশেষ। নামাজের চেয়ে মুসলমানের জন্য কোন বড় নেয়ামত নাই। এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের দর্শন লাভ করা যায় এবং এই নামাজের বদৌলতে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রিয়তম হইতে পারা যায়। এই নামাজের দ্বারা ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত নেয়ামত হাসিল হয়। খোদায়ী নেয়ামত হাসিলের মাধ্যম হইল একমাত্র নামাজ। সুতরাং আল্লাহপাক কুরআনে মজিদে এবং হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হাদীস শরীফে নামাজের ব্যাপকভাবে তাগিদ করিয়াছেন। বে-নামাজী মারদুদ শয়তানের ভাই।

## প্রকৃত নামাজীকে আল্লাহপাক নয়টি বুজুর্গী দান করিয়াছেন

নামাজের দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হইয়া যায়। তাওহীদকে স্বীকার করিয়া লওয়ার পর নামাজের স্থান। হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন– "যে ব্যক্তি ওয়াক্ত মতে নামাজের হেফাজত করিয়াছে এবং সর্বদা উহা পালন করিয়াছে তবে আল্লাহপাক তাহাকে নয়টি বুজুর্গী দান করিয়াছেন।



প্রথম, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ভালবাসিবেন। দ্বিতীয়, তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। তৃতীয়, ফেরেশ্‌তাগণ তাহার হেফাজত করিবে। চতুর্থ, তাহার ঘরে বরকত নাজিল হইবে। পঞ্চম, তাহার চেহারায় নেক্‌কার ও পরহেজগার ব্যক্তিগণের চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। ষষ্ঠ, আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তর নরম করিয়া দিবেন। সপ্তম, সে বিদ্যুৎগতির মত পুলছেরাত পার হইয়া যাইবে। অষ্টম, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুন হইতে পরিত্রাণ দান করিবেন। নবম, আল্লাহপাক তাহাকে ঐ লোকজনের মধ্যে অবস্থান করাইবেন, যাহাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকিবে না।"

হাদীসে আছে–

اِنَّ الصَّلٰوةَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَالسَّخَاوَةُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

"নামাজ, দান-খয়রাত এবং কলেমায়ে তাইয়্যব 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাছূলুল্লাহ' দ্বারা পাপরাশি দূরীভূত হইয়া থাকে।"

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর জিকির, রাছুলের নাম এবং রাছুলের জিকির তিন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে না। প্রথম, বে-আমল আলেমের উপর। দ্বিতীয়, ঐ দুনিয়াদার ব্যক্তির উপর যাহার অন্তরে দয়া-মায়া থাকে না। তৃতীয়, নামাজ ত্যাগকারী, যে নামাজ রোজা সম্পর্কে কোন অবগত নহে।

মুসলমান ভাইগণ! স্মরণ রাখুন, পানি, গোসল এবং সাবান দ্বারা যেইরূপ বাহ্যিক নাপাক এবং ময়লা দূর হইয়া থাকে এবং জাহেরী পাক-পবিত্রতা হাসেল হয় সেইরূপ নামাজ দ্বারা মানুষের বাতেনী পাক-পবিত্রতা হাসেল হয় এবং আভ্যন্তরীন অপবিত্রতা ও ময়লা দূরীভূত হইয়া থাকে। আল্লাহপাক সকল মুসলমানকে এই মহান নেয়ামত দান করুন। আমীন।

স্মরণ রাখা উচতি যে, বে-নামাজী খোদা ও রাসূলের দুশমন। নামাজ বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই আদায় করা হয়। যেমন সিজদা শুধু আল্লাহ্‌কেই করা যায়। সিজদার উপযুক্ত শুধু আল্লাহ্‌ তায়ালাই। কিয়াম বা নামাজেম দণ্ডায়মান অবস্থা, রুকু ও সিজদা শুধু আল্লাহর জন্যই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও এইগুলির উপযুক্ত মনে করা 'শিরক ফিল ইবাদতে' গণ্য। কিন্তু

নামাজের প্রত্যেক অবস্থা ও রীতি-নীতি জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ও তাঁহার সাহাবায়ে কেরামের রীতি-নীতি মোতাবেক হইতে হইবে। অন্যথায় খাঁটি নামাজে পরিগণিত হইবে না। কেননা পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক দলের লোকে নামাজ তো পড়িয়া থাকে। যেমন, কদরীয়া, শিয়া, কাদিয়ানী প্রভৃতি দলের লোকেও নামাজ পড়ে। কিন্তু তাহাদের ঐ নামাজকে খাঁটি নামাজ বলা হয় না এবং তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম হইতে খারেজ বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, নামাজের একটি রূহ বা প্রাণ আছে। উহা ব্যতীত নামাজ মৃত। আর ঐ রূহ বা প্রাণ হইল জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইশ্‌ক ও মুহাব্বাত।

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর তিনটি প্রিয় বস্তু

হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন–

حُبِّبَ اِلَیَّ مِنْ دُنْیَاکُمْ ثَلٰثٌ اَلطِّیْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنِیْ فِی الصَّلٰوةِ وَکَانَ مَعَهٗ اَصْحَابُهٗ جُلُوْسًا فَقَالَ اَبُوْبَکْرِنِ الصِّدِّیْقُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ صَدَقْتَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَحُبِّبَ اِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا ثَلٰثٌ اَلنَّظْرُ اِلٰی وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَاِنْفَاقُ مَالِیْ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَاَنْ یَکُوْنَ اِبْنَتِیْ تَحْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ– তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিষ আমার পছন্দনীয়। খুশ্‌বু, স্ত্রীলোক (হুজুর এই কারণে স্ত্রী লোককে পছন্দ করিতেন যে, ইহাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব বংশ বিরাজ করে এবং ইহাদের দ্বারা পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় থাকে) এবং নামাজের মধ্যে আমার চক্ষুর শীতলতা স্থির করা হইয়াছে। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট তখন সাহাবায়ে কেরাম উপবিষ্ট ছিলেন।

## হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর তিনটি প্রিয় বস্তু

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরজ করিলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সত্যই বলিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে তিনটি জিনিসই আমার পছন্দনীয়। আল্লাহর রাসূলের চেহারার দিকে তাকাইয়া থাকা, আল্লাহর রাসূলের নিকট



আমার ধন-সম্পদ উৎসর্গ করা এবং আমার মেয়ে আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী হিসাবে থাকা।

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, নামাজ আমার চোখের শান্তি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সত্যিই বলিয়াছেন, কিন্তু আমার চোখের শান্তি হইল জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পবিত্র চেহারাখানা।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নবী করীমের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ওফাতের রোগ অবস্থায় হুজুরের ইঙ্গিতে কয়েকটি ওয়াক্তের নামাজ পড়াইতেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জোহরের নামাজ পাড়াইতেছেন হুজুরের অবস্থা কিছুটা প্রশমিত হওয়াতে তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর করিয়া (এই দুইজনের মধ্যে একজন হযরত আব্বাস ছিলেন) মসজিদে আগমন করিলেন। হযরত আবু বকর নামাজ পড়াকালীন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি পিছনে হাঁটিয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্তু হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা হুজুরকে হযরত আবু বকরের বাম পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। তিনি বসিয়া নামাজ পড়িতেছেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইক্‌তিদা করিতেছিলেন এবং সাহাবাগণ হযরত আবু বকরের ইক্‌তিদা করিতেছিলেন। অন্য এক হাদীসে আছে– হযরত আবু বকর হুজুরের তাকবীরগুলির আওয়াজ মুসল্লীগণের নিকট পৌছাইয়া দিতেছিলেন। মসজিদে হুজুরের ইহাই ছিল শেষ নামাজ।

## নামাজে নবীর খেয়াল করা শিরক নহে

উল্লেখিত বর্ণনাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নামাজ পড়াইতেছিলেন এবং হুজুরের আগমনের খেয়ালও করিতেছিলেন। নামাজ তো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য পড়া হয়। এইরূপ ইবাদতে হযরত আবুবকর (রাঃ) হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সম্মানার্থে পিছন দিকে হঁাটিতে চাহিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথমে মুসল্লীগণের ইমামতি করিতেছিলেন। যখন হুজুর তশরীফ আনিলেন, তখন তিনি তাড়াতাড়ী

হুজুরের মুক্তাদী সাজিয়া গেলেন এবং অন্যান্য মুসল্লীগণ হযরত আবু বকরের মুক্তাদী রহিল।

পাঠকবৃন্দ! নামাজ তো শুধু আল্লাহর সম্মানার্থে পড়া হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নামাজের মধ্যেই নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর প্রতি সম্মান দেখানো কিরূপ শিরক? নামাজ তো আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাওয়ার অপর নাম। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এইরূপ নামাজে হুজুরের আগমনের খেয়ালও করিতেছেন। নামাজের হাকীকত অর্থাৎ আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হওয়াতো এখন হযরত আবু বকর হইতে পৃথক হইয়া গেল না এখনও বাকী রহিয়াছে? হযরত আবু বকর প্রথমে মুসল্লীগণের স্বয়ং ইমাম হওয়ার নিয়ত করিয়া তকবীরে তাহ্‌রীমা বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু হুজুরের আগমনের পর তিনি হুজুরের মুকতাদী হইয়া গেলেন! এখন হযরত আবু বকরের ইমামতি বাকী রহিল কি না? এবং এই নামাজ হুজুরের খেয়াল লইয়া পড়া হইয়াছে কি না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি এই নামাজ হুজুরের খেয়াল ও তা'জীমের সহিত আদায় করিয়াছেন। উল্লেখিত অবস্থাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকর সর্বদাই নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর খেয়াল, ধ্যান ও স্মরণ লইয়াই থাকিতেন এবং সর্বদা হুজুরের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। ইহার নামই হইল আসল ও খাঁটি ঈমান। আর ইহার নাম হইল খাঁটি নামাজ। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর অন্তরে হুজুরের মুহাব্বত ও ভালবাসা পুরাপুরিভাবে ভরিয়া দেওয়া হয়। ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতে গিয়া হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ-

مَافُضِّلَكُمْ اَبُوْبَكْرٍ بِفَضْلِ صَوْمٍ وَّلَاصَلٰوةٍ وَّلٰكِنْ بِشَيْءٍ وُّقِرَ فِيْ قَلْبِهٖ.

অর্থাৎ– সমস্ত সাহাবা ও উম্মতের উপর হযরত আবু বকর (রাঃ)কে নামাজ-রোজার ফজীলতের দ্বারা সম্মান দান করা হয় নাই কিন্তু একটি মাত্র বস্তুর দ্বারা তাঁহাকে সকল মানুষের উপর সম্মানিত করা হইয়াছে, যাহা তাঁহার পবিত্র অন্তরে আমানত রাখা হইয়াছে।

ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর অন্তরে নবী করীমের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তা'জীমের খেয়াল ও মুহাব্বত এতই অধিক ছিল যে, পৃথিবীর মধ্যে ইহার কোন নজীর পাওয়া যায় না।



কোন কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন–

پروانے کو چراغ عنادل پھول بس

صدیق کیلئے ہے خدا کا رسول بس

অর্থাৎ পতঙ্গ সমূহের জন্য বাতিই যথেষ্ট এবং বুলবুলির জন্য ফুলই যথেষ্ট। আর আবু বকর সিদ্দীকের জন্য খোদার রাসূলই যথেষ্ট।

মোটকথা এই যে, নামাজ আদায় করা ব্যক্তিগত ফরজ। এই ফরজ ত্যাগ করিলে কবীরা গুনাহ্ হয়। কোন কোন হাদীস মোতাবেক ইহা পরিত্যাগ করা কুফ্‌রী। আর এই ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়। কিন্তু হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বত ও স্মরণ লইয়াই আদায় করা উচিত। যে মহাপুরুষের মাধ্যমে আল্লাহপাক আমাদিগকে এই নেয়ামত দান করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার স্মরণ করা একান্ত অপরিহার্য্য।

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– সৎ পথের পথিকগণের আক্বীদা আমি এবং আমার সাহাবাগণের আকীদা অনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন, তিনি বলিয়াছেন–

مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ

পাঠকবর্গ! এখন আপনারা দেখুন, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলেন যে, নামাজ আমার চোখের শীতলতা বিশেষ। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সত্য বলিয়াছেন। কিন্তু আমার অন্তরের শীতলতা হইল হুজুরের স্মরণ এবং হুজুরের পবিত্র চেহারা অবলোকন করা। এখন উভয় উক্তিকে মিলাইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হুজুরের স্মরণ ও মুহাব্বত সহকারে নামাজ আদায় করা উচিত। কারণ, নামাজের রূহ বা প্রাণ হইল নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বত ও তাঁহাকে সম্মান করা।

ইবাদতের উপযুক্ত ও মালিক শুধু আল্লাহ তায়ালা ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও আক্বীদা।

## রোজার ফজিলত বর্ণনা

عَنْ عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا . (رواه النسائى)

অনুবাদঃ হযরত ওবায়দা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে, আমি হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে বলিতে শুনিয়াছি "রোজা মানুষের জন্য ঢাল (প্রতিরোধক) বিশেষ, যতক্ষণ সে উহাকে ফাটিয়া না ফেলে।" (নেসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ রোজার দ্বারা মানব-জাতি তাহার চির শত্রু শয়তান হইতে রক্ষা পায় এবং আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি পায়। রোজার ফজীলত অগণিত। তম্মধ্যে নিম্নে কতগুলি বর্ণনা করা হইল।

হাদীসে কুদ্সী শরীফে আছে, আল্লাহপাক বলেন–

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

"রোজা আমার এবং আমি নিজেই উহার ছওয়াব দান করিব।" অর্থাৎ রোজা ব্যতীত অন্যান্য ইবাদাত সমূহে রিয়া বা লোক দেখানোর অবকাশ থাকে, কিন্তু রোজার মধ্যে উহার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। অন্যান্য ইবাদত গুলির ছওয়াব দশ হইতে লক্ষ তথা সাত লক্ষ গুণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু রোজার মধ্যে ছওয়াবের কোন সীমা নাই। ইহার ছওয়াব আল্লাহ নিজেই দাতা আর বান্দা গ্রহীতা। অন্যান্য ইবাদতগুলির ছওয়াব কিয়ামতের দিন ঋণদাতা এবং অন্যান্য হকদারগণ ছিনাইয়া নিতে পারিবে, কিন্তু রোজার ছওয়াব কেহই ছিনাইয়া নিতে পারিবে না। কেননা তখন হকদারগণকে বলা হইবে যে, রোজা আমার, ইহার ছওয়াব তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে)–

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اُجْزٰى بِهٖ

"রোজা আমার এবং ইহার প্রতিদান আমি স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জত।" অর্থাৎ অন্যান্য ইবাদতগুলির প্রতিদানে জান্নাত মিলিবে এবং রোজার প্রতিদানে সমস্ত



সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও মালিক স্বয়ং আল্লাহ পাকই মিলিবে। কেননা, অন্যান্য সমস্ত ইবাদতের মধ্যে খোদার ইতায়াত বা হুকুম পালনের প্রধান্যতা বিরাজ করে রোজার মধ্যে আল্লাহ্‌র খাতিরে পার্থিব সকল কিছুর ত্যাগ হইয়া থাকে। আর অন্যান্য ইবাদতগুলিতে ঐ সমস্ত কাজ পালন হইয়া থাকে। সুতরাং (مطيع) হুকুম পালনকারীর প্রতিদানতো পুরস্কার বটেই, কিন্তু আশেক ও প্রেমিকের প্রতিদান শুধুমাত্র প্রেমাস্পদের দর্শন ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– পবিত্র রমজানের প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে আল্লাহ তায়ালার নিকট জাহান্নামের কয়েদী ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাত্র-দিনে প্রত্যেক মুসলমানের একটি দোয়া নিশ্চয় কবুল হয়।

অন্য একটি হাদীসে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হউক, যে রমজানের পবিত্র মাস পাইয়াও তাহার গুনাহ্ মাফ না হয়।

'তাবরানী' নামক কিতাবের এক বর্ণনায় হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– অনেক রোজাদার এমন আছে, যাহার রোজার প্রতিদানে অনাহার থাকা ছাড়া আর কিছুই মিলে না। আর রাত্রে জাগিয়া অনেক ইবাদতকারী এমন আছে, যাহার ইবাদতের প্রতিদানে রাত্রে জাগিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই হাসিল হয় না।

'তিরমিযী' ও 'আবু দাউদ' নামক হাদীস গ্রন্থে আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "যে ব্যক্তি শরীয়ত সম্পর্কিত অপারগতা (শরীয়তের অনুমতি) ছাড়া নিজের ইচ্ছায় রমজানের একটি দিনেও রোজা ভঙ্গ করে, তবে রমজান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে যদিও সারাটি জীবন রোজা রাখে, ঐ রমজানের একটি রোজার সমতুল্য হইতে পারে না।" সুতরাং সকল মুসলমানের উচিত যে, রমজানের রোজার মত এইরূপ নেয়ামত হাতছাড়া করিবেন না।

## হজ্বের ফজিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ (متفق عليه)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "সওয়াব ও পূণ্য সম্বলিত হজ্বের প্রতিদান বেহেশ্‌ত ছাড়া আর কিছুই নহে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে– "হজ্বের সওয়াব হইল মানুষকে খানা খাওয়ানো এবং মানুষের সাথে নম্রভাবে কথা-বার্তা বলা।" অন্য এটি হাদীসে আছে– হজ্বের সওয়াব হইল মানুষকে খানা খাওয়ানো এবং মানুষকে অধিকভাবে সালাম করা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে– "হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে হজ্ব করিবে, তেমনি সেই হজ্বে মন্দ কথা বলিবে না এবং হজ্বের আরকান ও আহকাম লংঘন করিবে না। তবে সেই ব্যক্তি হজ্ব হইতে এইরূপ নিষ্পাপ হিসাবে ফিরিয়া আসে, যেইরূপ সে তাহার মায়ের পেট হইতে যেদিন এই পৃথিবীতে আসিয়াছিল।"

## কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে উম্মতে মুহাম্মদীর হজ্বে যাওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা

'কান্‌জুল উম্মাল' নামক কিতাবে আছে– নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে আমার উম্মতের আমীর-ওমরাহ্‌গণ শুধুমাত্র দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হজ্ব করিবে এবং আমার উম্মতের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হজ্ব করিবে। তাহারা তাহাদের দেশ হইতে কিছু মাল-পত্র এই দেশে লইয়া আসিবে এবং এই দেশ হইতে কিছু মাল-পত্র তাহাদের দেশে লইয়া যাইবে। আর আমার উম্মতের আলেম সম্প্রদায় লোক দেখানো এবং খ্যাতি অর্জনের জন্য হজ্ব করিবে। নিম্ন শ্রেণী তথা গরীব ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভিক্ষা মাগিবার উদ্দেশ্যে হজ্ব করিতে আসিবে।"



যাহারা পারিশ্রমিক লইয়া বদলী হজ্ব করিয়া থাকে এবং সেই হজ্বের দ্বারা কিছু পার্থিব ধন-সম্পদে লাভবান হইয়া থাকে, তাহারাও উপরোক্ত হুকুমে শামিল রহিয়াছে। কেননা তাহারা এই হজ্বের মাধ্যমে ব্যবসা করিতেছে।

## আরাফাতের দিন অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ্‌ মাফ করা হয়

হাদীসে আছে– হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– আরাফাতের দিনে যত অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ মাফ হয়, অন্য কোন দিনে তত অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ্‌ মাফ হয় না। অপর একটি হাদীসে আছে– যখন আরাফাতের দিন আসে, তখন আল্লাহ পাক সর্বনিম্ন আসমানে আসিয়া ফেরেশ্‌তাগণের সহিত গৌরব করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরা আমার বান্দাগণের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহারা আমার কাছে এইরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে, তাহাদের মাথার চুল উস্কু-খুস্কু, সফর করার দরুণ তাহাদের শরীর ও কাপড় ধুলিময়, তাহাদের কণ্ঠে লাব্বায়কা (হে মুনিব! তোমার দরবারে উপস্থিত) শব্দের আওয়াজ করিতে করিতে দূর-দূরান্ত হইতে আসিয়াছে। আমি তোমাদিগকে সাক্ষী নিযুক্ত করিতেছি যে, আমি তাহাদের সকলের গুনাহ মাফ করিয়া দিলাম। তখন ফেরেশ্‌তাগণ আরজ করিয়া থাকে, হে খোদা! তাহাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি গুনাহ্‌গার এবং জনৈক পুরুষ ও স্ত্রীলোক মহাপাপী। আল্লাহ উত্তরে বলেন– আমি সকলের গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছি। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলেন– ঐ দিনের চেয়ে অন্য কোন দিনে এত অধিক লোক দোযখের আগুন হইতে মুক্তি পায় না। (মিশকাত)

আরাফাতের দিনে সাধারণ ক্ষমার দরুন শয়তানের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে থাকে।

## হাজ্বীদের মর্তবা ও সামর্থবান ব্যক্তিদের হালাল উপার্জিত টাকা দ্বারা হজ্ব করার তাগিদ

রাসূলে করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলেন– যখন তোমরা কোন হাজী সাহেবের সাক্ষাত পাইবে, তখন তাহাকে সালাম কর, তাহার সহিত মুসাফাহা কর এবং সে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহার কাছে তোমাদের

গুনাহ মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিতে আবেদন কর। কেননা, সে তখন নিজের গুনাহ হইতে পাক পবিত্র হইয়া আসিয়াছে।

হাদীস শরীফে আছে– নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্ব করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাড়াতাড়ি করাই উচিত।

অপর এক হাদীসে আছে– হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– যে ব্যক্তির এতটুকু খরচ করিবার শক্তি থাকে এবং সফর করার সুব্যবস্থা রহিয়াছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত গমন করিতে পারিবে, তাহা সত্ত্বেও যদি সে হজ্ব পালন না করে, তবে এই কথার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না যে, ইহুদী হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে অথবা খৃষ্টান হইয়া।

অন্য হাদীসে আছে– রাসূলে করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির বাস্তবিক পক্ষে কোন ওজর বা অপারগতা থাকিবে না, জালেম ও অত্যাচারী সরকারের পক্ষ হইতে কোন প্রকার বাধা হইবে না এবং হজ্ব হইতে বাধা সৃষ্টিকারী এমন কোন জটিল রোগও থাকিবে না, তখন সে যদি হজ্ব না করিয়া মৃত্যুবরণ করে, তবে সে ইহুদী অথবা খৃষ্টান হইয়া মৃত্যুবরণ করার মধ্যে তাহার ইখতিয়ার থাকিবে।

হাদীস শরীফে আছে– হাজী সাহেব যখন হালাল টাকা পয়সা দ্বারা হজ্ব পালন করিয়া থাকে, তখন সে 'লাব্বায়কা' বলার সাথে সাথে ফেরেশতাগণও আসমানে 'লাব্বায়কা' বলিতে থাকে। আর যখন সে হারাম টাকা-পয়সা দিয়া হজ্ব করে, তখন সে 'লাব্বায়কা' বলার সাথে সাথে ফেরেশতাগণ বলিয়া উঠে, 'মা লাব্বায়কা' অর্থাৎ তোমার হাজেরী কবুল হয় নাই, কেননা তুমি হারাম উপার্জিত টাকা পয়সা দিয়া হজ্ব করিতেছ।

মুসলমানগণ! সাবধান, হারাম উপার্জিত টাকা-পয়সা দ্বারা হজ্ব করিবেন না। ইহাতে কবুলিয়াত ও রূহানীয়াত থাকে না। আল্লাহপাক সকলকে হালাল উপার্জন দ্বারা বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করিবার তৌফিক দান করুন। আমীন।



## মদীনা শরীফ মক্কা শরীফ হইতে শ্রেষ্ঠ ও জিয়ারতে মদীনার ফযিলত

عَنْ اِبْنِ عُمَرَرَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ زَارَ قَبْرِیْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِیْ. (رواه الدار قطنی)

অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করিয়াছে, তাহার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। (দারু কুতনী)

ব্যাখ্যাঃ জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব পালন করিবার পর জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে হাজেরী দেওয়ার জন্য রওয়ানা হইবে। আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব সুন্দরই বলিয়াছেন–

اے حاجیو آؤ تم شہنشاہ کا روضہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو.

অর্থাৎ হে হাজীগণ! তোমরা শাহেন্‌শাহে দো-আলম হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর রওজা শরীফ দেখিতে আস। তোমরা কা'বা শরীফ তো দেখিয়াছ, এখন কা'বা শরীফের কা'বা দেখিয়া লও।

'তাবরানী' নামক হাদীসের কিতাবে আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার জেয়ারত উদ্দেশ্যে আসিয়াছে এবং ইহা ছাড়া তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না, তবে তাহার সুপারিশ করা আমার উপর একটি হক বা দাবীতে পরিণত হইয়া গেল।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে 'তাবরানী' কিতাবের অন্য একটি বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার জেয়ারত করিল, তবে সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় জেয়ারত করিল।"

'বায়হাকী' নামক হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়াই আমার জেয়ারত করিল, তবে সে রোজ কিয়ামত আমার নিকটতম প্রতিবেশীর মধ্যে গণ্য হইবে।"

'কিতাবুশ শেফা' নামক গ্রন্থে আছে, হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করিল এবং আমার জেয়ারত করিল না, তবে সেই ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করিল।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হজ্ব করিবার জন্য মক্কায় গেল, তারপর সে আমার উদ্দেশ্য করিয়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) আগমন করিল, তবে তাহার আমলনামায় দুইটি মকবুল হজ্ব লেখা যায়।"

মদীনা শরীফের ফজীলত ও মান-মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কবর শরীফ মক্কা, বায়তুল্লাহ, আরশ-কুর্সী, লওহ-কলম প্রভৃতি হইতে অতি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। একটি হাদীসে আছে–

اَلْمَدِيْنَةُ اَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ

অর্থাৎ মদীনা শরীফ মক্কা শরীফ হইতে উত্তম।

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خُطْبَةِ يَوْمِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَيُّهَا النَّاسُ اَنَّهٗ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَلَااُمَّةَ بَعْدِكُمْ فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسُكُمْ وَاَطِيْعُوْا وُلَاةَ اُمُوْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

(مسند امام احمد)



অনুবাদঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষণে বলিয়াছেন, "হে মানবজাতি! আমার পরে আর কোন নবী নাই এবং তোমাদের পরে আর কোন উম্মত নাই। তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়, তোমাদের মাস রমজানের রোজা রাখ, আনন্দচিত্তে তোমাদের ধন-সম্পদের জাকাত আদায় কর এবং তোমাদের শাসকগণকে মানিয়া চল, তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করিয়া যাও।" (মাসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, হযরত মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) শেষ নবী এবং আমরা শেষ নবীর উম্মত। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পরে অন্য কোন নবী হইবে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ নবী বা অন্য নবীর অনুসারী কোন প্রকার নবী হইতে পারে না। আল্লাহপাক ঘোষণা করেন যে, খোদার প্রেরিত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নবীদের মধ্যে শেষ নবী।

## গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুয়ত দাবী

কোন কোন আলেম কুরআনের এই আয়াতের অর্থ করিতে গিয়া বলেন যে, (ذاتى) স্বয়ংসম্পূর্ণ নবী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু (عارضى) অন্য নবীর অনুসারী নবী হইতে পারিবে। ইহাতে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়াতের দাবী করিয়া বসিল। ভারতের আলেম সম্প্রদায় তাহার বিরোধিতা করিতে গেলে সে বলিলঃ "দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতাও (عارضى) অন্য নবীর অনুসারী নবীর অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। যদি ইহা অসম্ভব হইত, তাহা হইলে এতবড় প্রখ্যাত আলেম কিভাবে ইহা বলিতে পারে? গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এই বক্তব্যের পর দেওবন্দী আলেমগণ ইহার প্রতিবাদ করিতে শুরু করে। কিন্তু গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজের দাবী হইতে বিরত হয় নাই।

আসল কথা হইল এই যে, দেওবন্দী আলেমগণ প্রথমে নবুওয়াতের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন। পরে উহা বন্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যেমন, এক ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়ার পর যদি তাহার ঘরে চোর ঢুকিয়া পড়ে, তবে পরে দরজা বন্ধ করিলে লাভ কি হইবে?

## গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়াত দাবীর বিরুদ্ধে আ'লা হযরতের প্রতিবাদ

আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কুফরী সম্পর্কে শরীয়ত মোতাবেক একটি ফতোয়া লিখিয়া মক্কা ও মদীনা শরীফের ওলামা এবং মুফ্‌তীগণের দস্তখত ও সীলমোহরের অঙ্কিত করিয়া 'হুস্বামুল হেরামাইন" নামক একটি কিতাব প্রকাশ করিলেন। ইহার দ্বারা কাদিয়ানী আন্দোলন হ্রাস পাইতে লাগিল। সাথে সাথে ভারতের অধিক সংখ্যক আলেম কাদিয়ানী আন্দোলনকে মূলোৎপাটন করিতে লাগিয়া গেলেন। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের আলেমগন কাদিয়ানী দলের লোকজনকে কাফের বলিয়া ফতোয়া দিতেছেন কিন্তু এই ব্যাপারে হযরত ছৈয়দ পীর মেহের আলী শাহ্ ছাহেবের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। কেননা, তাঁহার কলম এই ব্যাপারে অধিকতর মজবুত ছিল। আর ইহা পৃথিবী বাসীর অজানা নহে। হযরত গোল্‌ড়বী শাহ্ ছাহেব (রাঃ) মৌখিক ও কলমে প্রত্যেক দিক দিয়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সহিত মুকাবিলা করিতে লাগিলেন। আল্লাহর রহমতে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সর্বদা অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। অবশেষে হযরত শাহ্ ছাহেবের পবিত্র নাম শুনিলে সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। এখন তাহার কলমের জোরও নাই, মৌখিক শক্তিও নাই। তাহার তো ঈমান বলিতে কিছু ছিল না। সুতরাং তাহার শক্তি তো হইতেই পারে না। শেষফলে কাদিয়ানী জামাতের নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পায়খানার সাথী অর্থাৎ পায়খানায় তাহার মৃত্যু হয়।

## কাদিয়ানী দলের ভ্রান্ত মতবাদ

কাদিয়ানী দলের লোকজনের কিছু আকীদা এখানে বর্ণনা করা হইল।

'মিরজায়ীদের কাদিয়ান' জায়গাটি মক্কা ও মদীনার স্থলাভিষিক্ত। 'কাদিয়ান' ভূ-খণ্ডটি এখন সম্মানিত, সৃষ্টির ঝামেলা হইতে ইহা 'হেরেম শরীফের' মত পবিত্র। কাদিয়ানে উপস্থিতি হজ্ব তূল্য। কাদিয়ানে যে মসজিদটি মির্জা গোলাম আহমদ তৈরী করিয়াছিল, উহাই মসজিদে হারাম ও মসজিদে আল্-আকসা। কাদিয়ানে 'বেহেশ্‌তী কবরস্থান' নামে একটি কবরস্থান আছে। যে ব্যক্তি উক্ত কবরস্থানে দাফন হইবে সে বেহেশ্‌তী বলিয়া পরিগণিত হইবে।



মির্জা সাহেবের মুরীদগণ ছাহাবা বিশেষ। তাহার বংশধর "আহলে বায়েত" ও 'খান্দানে নবুওয়াত' আর তাহার স্ত্রীগণকে 'আজওয়াজে মুতাহ্‌হারাত' বা 'পবিত্র রমনী' নামে অভিহিত করা হইত। মির্জা সাহেবের বংশকে 'নবীর বংশ' হিসাবে অলংকৃত করা হইত। মির্জা সাহেবের প্রথম খলিফা হাকিম নূর উদ্দীনকে মির্জায়ী উম্মতদের আবু বকর ছিদ্দিক এবং দ্বিতীয় খলিফা মির্জা বশির আহমদকে সেই উম্মতের ওমর ফারুক বলা হইত। তাহাদের ধারণা ছিল যে, কুরআনের অধিকাংশ আয়াত মির্জা গোলাম আহমদ ও মির্জায়ী জমাতের লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের এক একটি অক্ষরের সহিত আমল করে, কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদকে নবী বলিয়া স্বীকার না করে, তবে সে ইহুদী ও খৃষ্টানের মতই কাফের। মির্জা সাহেবের অস্বীকারকারীগণ জারজ সন্তান। (নাউজুবিল্লাহ) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উপর শুধুমাত্র ঈমান আনিলে যথেষ্ট হইবে না। বরং মুক্তি পাইতে হইলে মির্জা গোলাম আহমদের উপর ঈমান আনিতে হইবে।" এইরূপ তাহাদের আরও অনেক মতবাদ রহিয়াছে। এইখানে পাঠক সমাজের সম্মুখে শুধুমাত্র কতকগুলি মতবাদ পেশ করিলাম। যাহাতে মানুষে জানিতে পারে যে, কাদিয়ানী জামাতের সহিত আমাদের বিরোধিতা কেন? আর তাহাদিগকে কাফের বলিয়া কেন ফতোয়া দেওয়া যাইতেছে?

## হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর আশ্রয় ও জিম্মাদারী হওয়া শিরক নহে

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَاتُخْفِرُوْا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ. (رواه البخارى)

অনুবাদঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "যে ব্যক্তি আমাদের মতই নামাজ পড়ে আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় এবং আমাদের জবেহকৃত জন্তুর মাংস খায়, তবে সে ঐ প্রকার মুসলমান, যাহার সম্পর্কে আল্লাহ ও

তাঁহার রাসূল জিম্মাদার রহিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জিম্মাদারীতে আঘাত হানিও না।" (বুখারী)

**ব্যাখ্যাঃ** জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, বিভিন্ন জামানা ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানদার ব্যক্তির আলামত বা চিহ্নও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সেই কারণে তাহাদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এক সময়ে শুধুমাত্র কলেমা পড়াই ঈমানদারের চিহ্ন ছিল, তখন নামাজ-রোজা ইত্যাদি শরীয়তের অনুশাসনগুলি প্রকাশ পায় নাই। সেই সময়ে বলা হইয়াছিল–

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি কলেমা তাইয়্যাবা পড়িবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" আর যখন নামাজ-রোজা ইত্যাদি ইসলামের অনুশাসন বা আহকাম হিসাবে রূপ ধারণ করিল, তখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। মদীনা শরীফে মুনাফিকও ছিল, তাহারা মুসলমানদের মত নামাজ-রোজা ইত্যাদি আদায় করা সত্বেও ঈমানদার বলিয়া পরিগণিত ছিল না। তখন আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বতই ঈমানের প্রধান আলামত হিসাবে স্থির করা হইয়াছিল। আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করিলেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ .....

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কেহই মু'মিন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল লোকজন হইতে অধিক প্রিয়পাত্র না হই।"

ভবিষ্যত যুগ সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শেষ জামানায় এমন একটি দল আত্মপ্রকাশ করিবে, যাহারা তোমাদের চেয়ে অধিক ইবাদতকারী ও পরহেজগার হইবে, কিন্তু ইসলাম হইতে অধিক দূরে সরিয়া পড়িবে। মোটকথা এই যে, জামানার অবস্থা যেইরূপ, সেইরূপ তাহার আলামতও বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্তমানে মিরজায়ী, রাফেজী প্রভৃতি দলের লোকেরা নামাজ রোজা ইত্যাদি আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা মু'মিন নহে।

এই হাদীস হইতে আরও বুঝা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিরাপত্তায় থাকে। অতঃপর তোমরা তাহাকে কষ্ট দিও না। অন্যথায় তোমরা



আল্লাহ্ ও রাসূলের নিরাপত্তা ভঙ্গকারী হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর আশ্রয় গ্রহণ করা শির্‌ক নহে। বরং ইহা ঈমানের একটি অঙ্গ। আরও প্রমাণিত হইল যে, পরহেজগার মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া ফাছেক ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা অধিক দোষণীয়। কেননা, ইহাতে জুলুম হইয়া থাকে এবং আল্লাহ ও রাসূলের সহিত খেয়ানত করাও হইয়া থাকে।

## রোজ কিয়ামতে সাত ব্যক্তি আরশে আজীমের ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمْ شِمَالُهٗ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ. (متفق عليه).

**অনুবাদঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– "এমন সাতজন ভাগ্যবান ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ঐ দিনে নিজ ছায়া দান করিবেন, যেইদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না। (১) ন্যায়-বিচারক বাদশাহ (২) ঐ যুবক ব্যক্তি যে আল্লাহর ইবাদতে নিজের যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছে (৩) ঐ ব্যক্তি যে মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পর তাঁহার অন্তর মসজিদের সহিত লাগিয়া থাকে, যতক্ষণ না আবার মসজিদে ফিরিয়া না আসে (৪) ঐ দুই ব্যক্তি, যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে, ঐ ভালবাসার উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা উভয়ে একত্রিত হয়, আবার ঐ ভালবাসার উপর ভিত্তি করিয়া উভয়ে পৃথক হয়। (৫) ঐ ব্যক্তি, যে

একাকী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রু বিসর্জন করে। (৬) ঐ ব্যক্তি যাহাকে সুন্দরী, উচ্চ বংশীয় মেয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে আহ্বান করে, অতঃপর সে বলে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করিতেছি। (৭) ঐ ব্যক্তি, যে গোপনে দান-খয়রাত করে, এমনকি তাহার ডান হাত কি দান করিতেছে, উহা বাম হাতে জানিতে পারে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যাঃ** এই হাদীসে উল্লেখিত সাত ব্যক্তি রোজ কেয়ামতে আল্লাহতায়ালার রহমতের ছায়া অথবা আল্লাহর আরশে আজীমের ছায়ার নীচে প্রখর রৌদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ন্যায়-বিচারক বাদশাহ বলিতে মু'মিন বাদশাহ ও শাসকগণকে বুঝায়, যাহারা প্রজাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করে। যেহেতু পৃথিবী তাহাদের ছায়াতলে আশ্রয় পাইত, সুতরাং তাহারা আল্লাহতায়ালার ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে। যুবক তাহার যৌবনকালে গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। যেহেতু যৌবনকালে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী থাকে এবং মন গুনাহ্র প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে, এই কারণে যৌবনকালের ইবাদত বৃদ্ধ অবস্থার ইবাদত হইতে উত্তম।

মসজিদের সহিত অন্তর লাগিয়া থাকার অর্থ এই যে, মাছ যেমন পুকুরে শান্তিতে বাস করে তদ্রুপ মু'মিন ব্যক্তিও মসজিদে অবস্থান করে, আর পাখী যেমন খাঁচায় আবদ্ধ থাকে, তদ্রুপ মুনাফিকও মসজিদে কিছুক্ষণের জন্য আবদ্ধ থাকে। অতএব, নামাজের পর বিনা কারণে তাড়াতাড়ী মসজিদ হইতে বাহির হওয়া ভাল নহে। সকলের আগে মসজিদে আসা, আর সকলের পরে মসজিদ হইতে বাহির হওয়া অত্যন্ত পূণ্য কাজ।

আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসার অর্থ এই যে, যাহাকে ভালবাসার দরুণ আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হইবেন তাহাকে ভালবাসা, আর যাহাকে ঘৃণা করার ফলে আল্লাহপাক খুশী হইবেন, তাহাকে ঘৃণা করা। বিধর্মী ও অসৎ প্রকৃতির সন্তানকে ঘৃণা করা অচেনা পরহেজগার লোকের জন্য ইবাদত গণ্য। এমনিতো ভ্রান্ত আকীদার লোক হইতে বাঁচিয়া থাকা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এইরূপ প্রাণের শত্রুর তাকওয়া পরহেজগারী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তাহার সহিত বন্ধুত্ব করাও সওয়াবের কাজ। আউলিয়া কেরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রাখা পূণ্যের কাজ।



যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে বা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইশ্ক ও মুহাব্বাতে পড়িয়া নিরালায় একাকী বসিয়া কাঁদে, রোজ কেয়ামতে আরশে আজমের ছায়া তাহারও ভাগ্যে জুটিবে। নিরালায় একাকী বসিয়া কাঁদার শর্ত এইজন্যই আরোপ করা হইয়াছে যে, সকলের সামনে কাঁদার মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানোর অবকাশ থাকে। অনেক লোক দেখা যায় যে, তাহারা মানুষের সামনে উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করে, ইহাতেও লোক দেখানোর অবকাশ রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক মুসলমানকে ইহা হইতে রক্ষা করুন।

আর সুন্দরী উচ্চ-বংশীয় মেয়েলোক যে পুরুষকে অসৎ কাজের জন্য আহ্বান করে সেই পুরুষ লোক এই মারাত্মক সময়ে শুধুমাত্র খোদার ভয়ে এই পাপ কাজ হইতে বিরত থাকা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যেই পুরুষ বিরত থাকে, সেও রোজ কেয়ামতে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে।

গোপনে দানকারীও রোজ হাশরে আল্লাহ্র রহ্মতের বা আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে। নফল ছদ্কা, খায়রাত ইত্যাদি গোপনে দান করা এই হাদীসের উদ্দেশ্য। কিন্তু চাঁদা উঠানোর সময় নফল ছদকাও প্রকাশ্যে দান করা মুস্তাহাব, যাহাতে অন্যান্য লোক দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত হয়। আর ফরজ ছদকা যেমন জাকাত ইত্যাদি প্রকাশ্যে দান করাও মুস্তাহাব। (মেরআ'ত ইত্যাদি)

قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ وَالصُّمْتُ اَفْضَلُ
وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَالصُّمْتُ اَفْضَلُ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ
وَالصُّمْتُ اَفْضَلُ وَالْجِهَادُ سِنَامُ الدِّيْنِ وَالصُّمْتُ اَفْضَلُ (منبهات)

হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– "নামাজ ধর্মের স্তম্ভ আর ইহাতে নীরবতা অবলম্বন করা অত্যন্ত ভাল এবং ছদকা-খয়রাত আল্লাহ্র রাগকে নিভাইয়া দেয়, আর ইহাতে নীরব থাকাই অত্যন্ত ভাল এবং রোজা দোযখের আগুন হইতে ঢাল বা প্রতিরোধক বিশেষ, আর ইহাতে নীরবতা অবলম্বন করাই অতি শ্রেয়। এবং জেহাদ ধর্মের চূড়া বিশেষ আর এই কর্মকে প্রকাশ না করা অত্যন্ত ভাল।"

অর্থাৎ– উক্ত কাজগুলি ভাল, কিন্তু এই গুলিতে নীরবতা অবলম্বন করা অত্যন্ত ভাল, অবশ্য যে স্থানে এই কাজগুলি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করার ফলে ফেত্না-ফাসাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে অথবা গুনাহ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে উক্ত কাজগুলি প্রকাশ করা উচিত। সেখানে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত নহে। কেননা, হক্ বা সত্যকথা হইতে নীরবতা অবলম্বনকারী বোবা শয়তান।

## 'ছুব্হানাল্লাহ্' এবং 'আল্-হাম্দুলিল্লাহ্' এই দুইটি তাসবীহ্ পাঠের ছওয়াব বর্ণনা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (رواه البخارى ومسلم)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন– "এমন দুইটি কলেমা বা বাক্য আছে, যাহা মুখের উপর উচ্চারণে খুব হাল্কা, (আমল নামা ওজনের) দাঁড়ি পাল্লায় ওজনে খুব ভারী এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট খুবই আদরণীয়। উহা হইল ছুবহানাল্লাহে ওয়া বেহাম্দিহী, ছুবহানাল্লাহিল আ'জীম।"

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীসের সেই দুইটি কলেমার বিপুল বরকতের দ্বারা কিয়ামতের দিনে সওয়াবের পাল্লা অধিকতর ভারী হইয়া যাইবে। যদিও অন্য কোন প্রকার লাভ না হয়, তবুও ইহার অধিক কি হইতে পারে যে, আল্লাহপাকের নিকট এই দুইটি কলেমা অধিকতর পছন্দনীয়! ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁহার "ছহীহ্ বুখারী" শরীফকে উক্ত কলেমা দুইটির উপরই সমাপ্ত করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই দৈনিক এক হাজার সওয়াবের কাজ করাকে ত্যাগ করিবে না। সে দৈনিক একশত বার 'ছুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী' পড়িয়া লইলে এক হাজার সওয়াবের কাজ হইয়া যাইবে। দৈনিক এতগুলি



গুনাহ্তো ইন্শাআল্লাহ হইবেও না। আর এই তাস্বীহ ছাড়া অন্যান্য যতগুলি নেক আমল করিবে, উহার সওয়াবও পৃথকভাবে পাওয়া যাইবে।

অপর একটি হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় 'ছুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী' একটি তাস্বীহ পাঠ করিবে, তবে তাহার গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে, যদিও সেই গুনাহ সমুদ্রের পানির ফেনা হইতেও অধিকতর হয়।

আর এক হাদীসে আছে– "ছুবহানাল্লাহে ওয়াবিহামদিহী" .......... এই তাস্বীহ পাঠে গুনাহ্ সমূহ এইভাবে ঝরিয়া পড়ে, যেমন শীতকালে বৃক্ষ হইতে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়ে।

অপর এক হাদীসে আছে– আল্লাহ তায়ালা যে জিনিস ফেরেশ্তাগণের জন্য পছন্দ করিয়াছেন, উহাই শ্রেষ্ঠতম জিনিস, আর উহাই হইল 'ছুবহানাল্লাহে ওয়াবিহামদিহী' এই তাস্বীহ পাঠ করা।

একদা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হযরত আবু জার (রাঃ)কে বলিলেন– "হে আবু জার! আমি তোমাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় কালাম কি, তাহা বলিব?" তিনি আরজ করিলেন, 'জি, হ্যাঁ! হুজুর; নিশ্চয় বলুন।' হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, উহা হইল 'ছুবহানাল্লাহে ওয়াবিহামদিহী।'

## নফল ইবাদত সর্বদা করা হারাম নহে

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِىْ اِلَى الْجَنَّةِ مَادَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ اِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِىْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَااَذَّنْتُ قَطُّ اِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا اَصَابَنِىْ حَدَثٌ قَطُّ اِلَّا تَوَضَّاْتُ عِنْدَهٗ وَرَأَيْتُ اَنَّ لِلّٰهِ عَلَىَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا (رواه الترمذى)

অনুবাদঃ হযরত বুরায়দা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) খুব ভোরে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন এবং হযরত বিলাল (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে বিলাল! তুমি

কোন পূণ্যের দ্বারা বেহেশ্‌তে আমার চেয়ে আগ্রবর্তী হইয়াছ? আমি যখনই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করি, তখনই আমার সামনে তোমার পায়ের শব্দ শুনিতে পাই, হযরত বিলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, 'হুজুর! আমি কখনও আযান দিই নাই, কিন্তু আযান দেওয়ার পরেই দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া লই এবং কখনও আমার অজু ভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু আমি অজু ভাঙ্গিবার সাথে সাথে দ্বিতীয়বার অজু করিয়া লই। আর আমি মনে করিয়া থাকি যে, আল্লাহর জন্য দুই রাকাত নামাজ আমার উপর কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।" তখন রাসূলে করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইলেনঃ উক্ত দুই রাকাত নামাজের দ্বারাই (তুমি আমার অগ্রবর্তী হইয়াছ।) (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বেহেশ্‌তে বহুবার পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি শবে মি'রাজে শারিরীক পর্যায়ে বেহেশ্‌তে গমন করিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত অন্যান্যবার রূহানী হিসাবে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি বেহেশ্‌তে গমন করেন, তখনই হযরত বিলাল (রাঃ)কে তাঁহার খাদেম হিসাবে আগে আগে উপস্থিত পাইয়াছিলেন। এখন হযরত বিলাল (রাঃ) জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর খেদমতে আরজ করিতেছেনঃ "হুজুর! আমি সর্বদা অজু এবং পাক পবিত্র অবস্থায় থাকি, আর প্রত্যেক অজুর পর আমি দুই রাকাত 'তাহিয়্যাতুল অজু' নফল নামাজ এবং প্রত্যেক আযানের পর দুই রাকাত 'দুখুলিল মসজিদ' নফল নামাজ পড়িয়া থাকি।" (কিন্তু ইহা হইতে মাকরূহ ওয়াক্তগুলি পৃথক। যেমন মাগরিবের ওয়াক্তে আযানের পর।) হযরত বিলাল (রাঃ) এর কথা শুনিয়া হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, "তুমি উক্ত দুই রাকাত নফল নামাজ অথবা ঐ দুইটি পূণ্য কাজের দ্বারাই এই মর্যাদা পাইয়াছ।"

উক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি নফল ইবাদতকে ওয়াজিবের মত সর্বদা আদায় করে, তবে সেই নফল ইবাদত হারাম হয় না। যেমন, কোন কোন আলেম উহা মনে করেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন–



مَنْ حَافَظَ عَلٰی شَفْعَةِ الضُّحٰی غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ –رواه احمد والترمذى وغيره.

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি এশ্‌রাকের নামাজ (বা সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর দুই রাকাত নফল নামাজ) এর পাবন্দ বা সর্বদা পড়িবে, তবে তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে, যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনারাশির পরিমাণ হয়।

ইমাম মালেকের বর্ণনা মতে জানিতে পারা যায় যে, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) আট রাকাত এশ্‌রাকের নামাজ পড়িতেন। উপরন্তু তিনি বলেতেনঃ

لَوْ نُشِرَ لِىْ اَبَوَاىَ مَاتَرَكْتُهَا.

অর্থাৎ যদি আমার মাতা-পিতার পুনঃ জন্মও হয়, তবুও আমি এই নামাজকে ছাড়িব না।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নফল ও মুস্তাহাব কাজ সর্বদা করা নিষিদ্ধ নহে। বরং উহা সর্বদা পালন করার বরকতে গুনাহ মাফ হয়।

পাঠকবৃন্দ! উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকার আমলের প্রতি লক্ষ্য করুন, তিনি বলেনঃ যদি এশ্‌রাকের সময় আমার কাছে এই সংবাদ পৌছে যে, আমার মাতা-পিতা পুনর্জীবিত হইয়া আসিয়াছেন তবুও আমি তাঁহাদের সাক্ষাতের জন্য এই নফল নামাজ ছাড়িব না। বরং প্রথমে আমি এই নফল নামাজ সমাপ্ত করিব, তারপরেই আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইব।

পাঠকবৃন্দ! নফল ও মুস্তাহাব কাজের উপর সাহাবায়ে কেরামের আমল কিরূপ, তাহা লক্ষ্য করুন। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল কিছু সংখ্যক এমন লোক বাহির হইয়াছে, তাহারা নফল ও মুস্তাহাব কাজগুলিকে এতটুকু হাল্‌কা ও মূল্যহীন করিয়া দিয়াছে যে, এইগুলি ছাড়িয়া দেওয়ার উপর সওয়াবের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। অথচ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ

"আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় উহাই পূণ্য কাজ, যাহা সর্বদা করা হয়, যদিও তাহা অল্প পরিমাণ হইয়া থাকে।" এশ্‌রাক, তাহিয়্যাতুল অজু এবং দুখুলুল মসজিদ ইত্যাদি নামাজগুলি নফল বা মুস্তাহাব। কিন্তু এই মুস্তাহাব কাজগুলি সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে সর্বদা করিয়াছেন, তাহা পাঠকবৃন্দ নিজেরাই চিন্তা করুন।

দেখুন, প্রত্যেক দিন কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব এবং অজুর মধ্যে মাথা মোছেহ করিবার সহিত গর্দান মোছেহ করা মুস্তাহাব। সেইরূপ অনেক আমল রহিয়াছে যে, এইগুলি সর্বদা পালন করা সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে। হ্যাঁ, নফল ও মুস্তাহাব কাজগুলিকে ফরজ এবং ওয়াজিব বলিয়া ই'তিকাদ বা বিশ্বাস করিয়া সর্বদা করা নিষিদ্ধ। এইখানে ইহার যথাযথ বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ নাই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর তাস্‌বীহ ও তকবীর (ছুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর) যদি সর্বদা পাঠ করা হয়, তবে কি উহা হারাম হইবে? কখনও না। অথচ এইগুলি মুস্তাহাবে পরিগণিত।

## দোয়ার সময় হাত উঠানো বেদায়াত নহে

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِیْلَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَیُّ الدُّعَاءِ
اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّیْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلٰوتِ الْمَكْتُوْبَةِ (رواه الترمذی)

অনুবাদঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– জনৈক ব্যক্তি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কাছে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া অধিকতর শ্রবণ করা হয়? হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, শেষরাত্রের মধ্যবর্তী এবং ফরজ নামাজ সমূহের পরবর্তী সময়ে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ দুইটি সময়ে দোয়া অধিকতর কবুল হইয়া থাকে। প্রথমতঃ শেষরাত্রের মধ্যবর্তী সময়ে। দ্বিতীয়তঃ ফরজ নামাজগুলির পরবর্তী সময়ে। অর্থাৎ রাত্রির শেষ অর্ধাংশের মাঝামাঝি সময়ের দোয়া কবুল হয়। পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাজগুলির পরও দোয়া অধিকতর কবুল হয়। সুতরাং ঐ সময়ে দোয়া করা উচিত। আর ছুন্নাত ও নফল নামাজ হইতে অবসর হইলেও দোয়া করিবে।



লক্ষ্যণীয় যে, উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ফরজ নামাজগুলির পর দোয়া কবুল হইয়া থাকে। মাখলুকাতের মধ্যে ছোট হউক বা বড় হউক, প্রত্যেক কিছু আল্লাহর দরবারে মুখাপেক্ষী। সুতরাং প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র দরবারে ভিক্ষুক সাজিয়া দোয়া করা উচিত। আর ইহাই বান্দা হওয়ার একমাত্র চিহ্ন। কিন্তু উল্লেখিত সময়গুলিতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত দোয়া করিবে। কেননা, উহা বিশেষভাবে দোয়া কবুল হওয়ার সময়।

দোয়ার সময় হাত উঠানো দোয়ার আদাব বা নিয়মাবলী হইতে একটি বিশিষ্ট আদব বা নিয়ম। হাদীস শরীফে আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে লজ্জা করে, যে আল্লাহর দরবারে নিজের হাত প্রসারিত করিয়া দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাকে খালি হাতে ফিরাইয়া দিবে। অর্থাৎ কোন বান্দা যখন আল্লাহ্‌র দরবারে ভিক্ষুক সাজিয়া হাত উঠাইবে, তখন তাহাকে খালি হাতে ফিরাইয়া দেওয়া আল্লাহ তায়ালার পক্ষে শোভা পায় না।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা ইহা মনে করিবেন না যে, মুনাজাত ছাড়া নামাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং মুনাজাত নামাজের একটি অংশ বিশেষ। কেননা এইরূপ মনে করা অনুচিত। হ্যাঁ, নামাজের সময় হইল একটি মূল্যবান ও বরকতওয়ালা সময়। সুতরাং ঐ সময়েই মুনাজাত করিলে, উহা অধিকতর কবুল হওয়ার আশা করা যায়। জামায়াত বা একত্রিত হইয়া মুনাজাত করুক অথবা পৃথক পৃথকভাবে মুনাজাত করুক, উভয় প্রকারে জায়েয আছে। অতএব, ফরজ নামাজের পর হাত উঠাইয়া মুনাজাত করা অতি উত্তম।

হাদীস শরীফে আছে যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফজরের নামাজের পর হাত উঠাইয়া দোয়া করিয়াছিলেন। যে কাজ হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পবিত্র জীবনে যদি একবারও করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কখনও বেদয়াত হইতে পারে না।

জামায়াত সহকারে মুনাজাত করা সম্বন্ধে বলা যায় যে, হাদীসে আছে– "মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার সময় দোয়া অধিকতর কবুল হয়।" অধিকন্তু, হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ) এর পক্ষ হইতে নামাজের পর একত্রিত অবস্থায় মুনাজাত করার কথা ছাবেত আছে। বড়ই আনন্দের

বিষয় এই যে, এখানকার মুনাজাত নিষেধকারী ও মুনাজাত অস্বীকারকারী ব্যক্তিগণের পীর ও দেওবন্দী বড় বড় আলেমগণ হাত উঠাইয়া মুনাজাত করাকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন। যেমন, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মুফতি আজিজুর রহমান, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং মাওলানা শামশুল হক আফগানী প্রমুখ আলেমগণের দস্তখত ও মোহর অঙ্কিত ফতোয়া আছে যে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এখন মুনাজাত বিরোধী লোকেরা তাহাদের মুরুব্বীগণের কিতাবগুলি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজের জেদ ও হঠকারিতা হইতে ফিরিয়া আসা উচিত।

## একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক্ব রহিয়াছে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. (متفق عليه).

অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর! ইসলামের মধ্যে কোন কাজটি উত্তম? হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ 'লোকজনকে খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

পরিচিত হউক বা অপরিচিত হউক প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করা ইসলামের উত্তম তরীকা। কিন্তু বাতেল ফেরকার লোককে সালাম করা জায়েয নাই। হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রহিয়াছে। যখন কোন মুসলমান রোগগ্রস্ত হয়, তখন তাহাকে দেখিতে যাওয়া এবং যথাসম্ভব তাহার সেবা শুশ্রূষা করা। যখন কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে, তখন তাহার জানাজার নামাজে শরীক হওয়া। যখন শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না হয়, তখন মুসলমান খানার দাওয়াত দিলে, তাহার দাওয়াত গ্রহণ করা। যখন মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহাকে সালাম করা। যখন কোন



মুসলমানের হাঁচি আসে এবং সে হাঁচির পর আলহামদুলিল্লাহ বলিবে, তখন তাহার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা এবং যখন কোন মুসলমান অনুপস্থিত বা উপস্থিত থাকিবে, তাহার মঙ্গল করা। স্মরণীয় যে, যদি কেহই কোন সম্মানিত ও বুজুর্গ লোকের বিরোধিতা করে, তবে ঐ বিরুদ্ধাচরণকারীর মৃত্যুর পরে তাহার জানাজা নামাজে শরীক হওয়া ঠিক নহে। যেমন নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) রাহ্মাতুল্লিল আলামীন হওয়া সত্ত্বেও জনৈক ব্যক্তির জানাজা নামাজে শরীক হন নাই। কেননা, সেই মৃত ব্যক্তিটি হযরত ওছমান (রাঃ) এর বিরোধিতা করিত।

## সালাম প্রদানের নিয়ম

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارٰى فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ وَتَسْلِيْمَ النَّصَارٰى الْاِشَارَةُ بِالْاَكُفِّ. (رواه الترمذى)

অনুবাদঃ হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– "যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য বিধর্মীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াছে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। তোমরা উহুদী ও খ্রীস্টানগণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিও না। কারণ ইহুদীগণের সালাম হইল আঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করা আর খ্রীস্টানগণের সালাম হইল হাতের তালু দ্বারা ইশারা করা।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "হে মুসলমানগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীস্টানগণের সহিত তাহাদের কজ কর্মে, চলা ফেরায়, কথা-বার্তায় সামঞ্জস্য রাখিও না। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত তাহাদের এই দুইটি কাজে তাহাদের সহিত সমাঞ্জস্য রাখিও না।

ইহুদীগণ সালাম করিবার সময় 'ছালাম' শব্দ না বলিয়া শুধু আঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া থাকে। আর খ্রীষ্টানগণ তাহাদের হাতের তালু দ্বারা ইশারা করিয়া থাকে।

'ছালাম' শব্দ দ্বারা সালাম করা হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁহার বংশধরের মধ্যে আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের ছুন্নাত। যথাসম্ভব হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার ইল্‌মে গায়েবের দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার উম্মতের মধ্যে কোন কোন লোক ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মত আচরণ করিবে। যেমন বর্তমানে সৈন্যগণের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা 'ছালাম' শব্দ বাদ দিয়া শুধু হাতের ইশারায় সালাম করিয়া থাকে। হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উক্ত কাজ হইতে নিষেধ করিয়াছেন। উম্মতে মুহাম্মদীগণের তরিকা হইল যে, তাহারা হাত তুলিয়া 'আচ্ছালামু আলাইকুম' শব্দ সহকারে ছালাম করিয়া থাকেন।

**প্রশ্নঃ** সালাম করিবার সময় যাহারা হাত উঠায় না, তবে কি তাহাদিগকে ওহাবী বলা যাইবে? না অন্য কোন কারণ আছে?

**উত্তরঃ** সালাম করিবার সময় হাত না উঠাইলে তাহাকে ওহাবী বলা যায় না। কারণ, হাত উঠাইয়া অথবা হাত না উঠাইয়া উভয় প্রকারে 'আচ্ছালামু আলাইকুম' শব্দ সহকারে সালাম করা জায়েয আছে। কিন্তু যাহারা হাত উঠাইয়া সালাম করাকে নিষেধ করিয়া থাকে এবং উহাকে খারাপ বেদয়াত (বেদয়াতে ছাইয়্যায়া) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ওহাবী বলা যায়। মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী সালাম করার সময় হাত উঠানোকে জায়েয বলিয়াছেন, যাহাতে কাহাকেও সালাম করিলে সে ভালভাবে জানিতে পারে যে, তাহাকে সালাম করিতেছে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র ইশারায় সালাম করা উল্লেখিত হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ।

## ওহাবীদের একটি বিশিষ্ট আলামত

ওহাবীদের একটি বিশিষ্ট আলামত এই যে, তাহারা প্রত্যেক সৎ কাজ ও জায়েয জিনিসগুলিকে খামোখা খারাপ বেদায়াত বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। ইহাই হইল ওহাবী হওয়ার দলীল। নতুবা কোর্তা, টুপি ও প্রকাশ্য শরীর ও পোষাকে তো অনেক কিছু মনে হয়। কিন্তু শিরক ও বেদায়াতের গোলাবারুদ যেভাবে তাহারা বর্ষণ করে, উহাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। আর তাহাদিগকেই ওহাবী বলা হইয়া থাকে। কোন লোককে বে-ঈমান ও মারদুদ হওয়ার ফতোয়া প্রদানের জন্য তাহার অন্তর ফাটিয়া



দেখার প্রয়োজন হয় না। বরং তাহার মুখ ও কলমের ভাষা তাহার অন্তরের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে যথেষ্ট। যদি কোন লোকের মুখ বা কলমের ভাষার মাধ্যমে কুফরীর শব্দ প্রকাশ পায়, তবে ওলামায়ে কেরাম তাহাকে 'কাফের' বলিয়া ফতোয়া দিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্তর ফাটিয়া দেখেন না। তদ্রুপ আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ কোন বাতিল ফেরকার লোককে যদি কাফের বলিয়া থাকেন তবে উহাও বাতিল ফেরকার লোকদের কুফরী কালামের কারণেই বলিয়া থাকেন। অন্তরের স্পীকার হইল মুখ ও কলম। সুতরাং কাফের বলিয়া ফতোয়া দিতে অন্তর ফাটিয়া দেখার প্রয়োজন হয় না।

হাদীস শরীফে আছে− হযরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন− "মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহপাকের অতি নিকটবর্তী, যে প্রথমে সালাম করিয়া থাকে।" (আহমদ)

## পানাহারের পর ঘরওয়ালার জন্য হাত তুলে দোয়া করা সুন্নাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ اَبُو الْهَيْثَم بْنُ التِّيْهَانِ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَى النَّبِىّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهٖ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ اَثِيْبُوْا اَخَاكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اَثَابَتُهٗ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهٗ فَاَكَلَ طَعَامَهٗ وَشَرِبَ شَرَابَهٗ فَدَعُوْا لَهٗ فَذٰلِكَ اَثَابَتُهٗ.

**অনুবাদঃ** হযরত যাবের ইবেন আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন− আবুল হাইসম ইবনে তিইহান (রাঃ) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ও তাঁহার সাহাবাগণকে খানা খাইতে ডাকিলেন। যখন সকলে খানা খাইয়া অবসর হইলেন, তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে ইহার প্রতিদান দাও। সাহাবাগণ আরজ করিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহার প্রতিদান কি? হুজুর বলিলেনঃ যখন কোন লোক অন্য কোন লোকের ঘরে প্রবেশ করিবে এবং পানাহার করিবে, তারপর ঘরের মালিকের জন্য দোয়া করিবে, তবে ইহাই তাহার প্রতিদান বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীস হইতে বুঝা গেল যে, কোন লোকের ঘরে পানাহার করার পর ঘরওয়ালার জন্য দোয়া করা ছুন্নত। হুজুরের বাণী أَثِيْبُوْا أَخَاكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের ভাইকে প্রতিদান দাও) দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল, যে ব্যক্তি পানাহার করাইবে তাহার বদলা দেওয়া অর্থাৎ তাহার জন্য দোয়া করা মানে তাহার শুকরিয়া আদায় করা। হাদীস শরীফে আছে, "যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করিল না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করিল না।" সুতরাং খানা খাওয়ার পরে ঘরওয়ালার শুকরিয়া আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। আর যখন দোয়া করা প্রমাণিত হইল, তবে সেই দোয়ার মধ্যে হাত উঠানোও প্রমাণিত হইল। কারণ, দোয়া করিবার সময় হাত উঠানো দোয়ার আদাব ও নিয়মাবলীর মধ্যে অন্যতম। যেমন 'হিছনে হাছীন' ইত্যাদি কিতাবে আছে وَمِنْهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ অর্থাৎ দোয়ার নিয়মাবলীর মধ্যে হাত উঠানোও একটি নিয়ম যখন ঐ হাত উঠানোর মধ্যে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি না হয়। অতঃপর পায়খানায় প্রবেশ করিবার সময়ে বাধা সৃষ্টি হওয়াতে তথায় হাত উঠানো নহে। কারণ, ইহা হাত তোলার সময় ও স্থান নহে। সুতরাং এই অবস্থার উপর কিয়াস করিয়া সাধারণতঃ উচিত দোয়ার মধ্যে হাত উঠানোকে নিষেধ করা সুন্নাতের পরিপন্থী। দোয়ার সময়ে হাত উঠানো এই ছুন্নাতটি রাসূলের হাদীসের দ্বারা ছাবেত আছে। রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) দোয়ার মধ্যে হাত তুলিতেন এবং সাহাবাগণও দোয়ার মধ্যে হাত তুলিতেন। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিবার জন্য হাত প্রসারিত করা বান্দার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় এবং হাত তুলিয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলে আল্লাহপাক অত্যন্ত খুশী হইয়া থাকেন।

হাদীস শরীফে আছে, "যখন আল্লাহর বান্দা তাহার সামনে হাত প্রসারিত করিয়া দোয়া করে, তখন বান্দার সেই হাতকে খালি ফিরাইয়া দেওয়া আল্লাহপাক লজ্জা মনে করেন।"

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) খানা খাওয়ার পূর্বে হাত তুলিয়া দোয়া করিয়াছেন, যেমন হাদীসে আছে–



ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى اٰلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ ثُمَّ اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ.

অর্থাৎ– রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার হাত উঠাইয়া সা'দ ইবনে উবাদাহ ও তাঁহার পরিবারের লোকজনের জন্য দোয়া করিয়াছেন, তারপর তিনি আহার করিয়াছেন।

এই হাদীস হইতে ছাবেত হইল যে, হাত উঠাইয়া দোয়া করা এবং ঘরওয়ালার জন্য হাত উঠাইয়া দোয়া করা রসূলের ছুন্নাত।

## মৃত ব্যক্তির চাহারম ও চেহ্‌লাম ফাতেহাখানি হিন্দুদের প্রথা হইতে পারে না

মৃত ব্যক্তির চাহারম ও চেহ্‌লাম ফাতেহাখানির উদ্দেশ্য হইল কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত, সূরা এখলাছ, সূরা ফাতিহা এবং দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করিয়া উহার ছওয়াব আম্বিয়া, আউলিয়া ও মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের রূহে পৌছাইয়া দেওয়া এবং তাহাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা। ইহাকে কোন আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি নাজায়েয ও বেদায়াত বলা তো দূরের কথা, কোন মূর্খ বা জাহেল লোকও নাজায়েয বা বেদায়াত বলিবেন না। কেননা, ইহাতে শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কাজ অন্তর্ভুক্ত নহে।

কোন জিনিস বিধর্মীদের সহিত প্রকাশ্যে সামঞ্জস্য বলিয়া মনে হইলে উহা নাজায়েয হয় না। কারণ, অমুসলমানদের কাজ লাত, উজ্জাহ্ ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজার নিয়তে হইয়া থাকে। আর মুসলমানদের কাজ আল্লাহ ও রসূলের সন্তুষ্টির জন্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক কাজের পাপ-পূণ্য নিয়তের উপর নির্ভর করে। অধিকন্তু, মুসলমানগণ ফাতেহার মধ্যে কুরআন পাঠ করিয়া থাকে। আর হিন্দুগণ তাহাদের পূজা-পার্বনে মন্ত্র ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকে। সুতরাং উভয় সমাজের রীতি-নীতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। হিন্দুদের নিয়ত বা উদ্দেশ্য বাতেল, তাহাদের কাজও বাতেল। তাই তাহাদের জ

ন্য শান্তি রহিয়াছে। অপরপক্ষে মুসলমানদের নিয়ত ভাল, তাহাদের কাজও ভাল। তাই তাহাদের জন্য সওয়াব রহিয়াছে। প্রকাশ্যে সামঞ্জস্য দ্বারা সৎ নিয়ত খারাপ হয় না। যদি বিধর্মীদের সহিত প্রকাশ্যে সামঞ্জস্য দ্বারা মুসলমানদের সৎ নিয়ত খারাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে কোন মুসলমানই উক্ত সামঞ্জস্য হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারে না। দেখুন! মুসলমানেরা রাসূলের ছুন্নাতের উদ্দেশ্যে মিস্ওয়াক করিয়া থাকে, সুতরাং ইহার জন্য তাহারা সওয়াবের ভাগী হয়। হিন্দুস্থানের অনেক হিন্দুরাও মিস্ওয়াক করিয়া থাকে। আর বহু হিন্দু, ইহুদী ও খ্রীস্টান দাড়ি রাখিয়া থাকে। তবে কি বিধর্মীদের সহিত সামঞ্জস্য হয় বলিয়া মুসলমানেরা মিস্ওয়াক করা এবং দাড়ি রাখা ছাড়িয়া দিবে? অনেক হিন্দু ও শিখ ধর্মের লোকেরা লম্বা কোর্তা ও পাগড়ী পরিধান করিয়া থাকে। তাই কি মুসলমানেরা লম্বা কোর্তা ও পাগড়ী পরিধান করা ছাড়িয়া দিতে পারে? মুসলমানেরা বিবাহ-শাদী করিয়া থাকে আর হিন্দুরাও করিয়া থাকে। তবে কি মুসলমানেরা বিবাহ- করা ছাড়িয়া দিবে? (নাউজুবিল্লাহ)। মুসলমানদের দাড়ি রাখা, মিস্ওয়াক করা, লম্বা কোর্তা ও পাগড়ী পরিধান করা এবং বিবাহ শাদী করার মধ্যে সওয়াব লাভ হয়। কিন্তু ইহাতে হিন্দু, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সওয়াব লাভ হয় না। শুধুমাত্র নিয়তের তারতম্যের দ্বারা এইরূপ হইয়া থাকে। মুসলমানদের শত শত কাজ বিধর্মীদের সহিত সামঞ্জস্য হয়। এইখানে ইহা বিস্তারিত বর্ণনা করা সংকুলান হইবে না।

হিন্দুদের মন্ত্র হইল 'হরি রাম, হরি রাম' করা। আর মুসলমানদের মন্ত্র হইল 'আল্লাহ, আল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা। সুতরাং ইহার মধ্যেও বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। আসল কথা হইল যে, শব্দ ও নিয়ত উভয়ের হিসেবে মুসলমান অমুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। শুধুমাত্র বাহ্যিক প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের মাঝে সামঞ্জস্য বিরাজ করে। তাই এই বাহ্যিক রূপের হিসাবে মুসলমানদের নেক আমলগুলিকে নাজায়েয বেদায়াত বলা নিছক গোমরাহী।



## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সামনে খাবার রাখিয়া ফাতেহা খানি করিয়াছেন

মিশকাত শরীফে হযরত আনস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হযরত জয়নাব (রাঃ)কে বিবাহ করেন, তখন আমার মাতা হাদিয়া ও তোহ্ফা স্বরূপ কিছু খানা তৈরি করিলেন এবং আমার দ্বারা উহা হুজুরের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন আর ইহাও বলিয়া দিলেন যে, "হুজুরকে আমার সালাম বলিও এবং তাঁহার কাছে আরজ করিও যেন আমার এই সামান্য হাদিয়া গ্রহণ করেন।" হযরত আনাস ঐ খাবার লইয়া হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার মাতার সালাম ও আরজ পেশ করিলেন। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, "আনাস! তুমি ঐ খাবারগুলি রাখিয়া দাও এবং অমুক অমুক ব্যাক্তিকে ডাকিয়া আন। আমি ডাকিতে লাগিলাম, এমনকি সেখানে তিনশত লোক একত্রিত হইয়া গেল।

فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَضَعُ يَدَهٗ عَلٰى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ.

তখন আমি নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে দেখিলাম যে, তিনি ঐ খাবারের উপর তাঁহার পবিত্র হাত রাখিলেন এবং যাহা ইচ্ছা, পাঠ করিলেন। অতঃপর ঐ খাবারে এত অধিক বরকত হইল যে, সকল লোকই পেট ভরিয়া খাইলেন। তারপর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাকে বলিলেন, "এই যাহা কিছু বাকী রহিল, উহা তুমি লইয়া যাও।" আমি যখন ঐ অবশিষ্ট খাবারটুকু দেখিলাম, তখন আমি অনুমান করিতে পারিলাম না যে, আমি যাহা কিছু আনিয়াছিলাম উহা কি অধিক ছিল, না এই অবশিষ্ট খাবারটুকু অধিক হইবে?

পাঠকবৃন্দ! আপনারা দেখুন, উক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার সামনে খাবার রাখিয়া উহার উপর যাহা ইচ্ছা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ খাবারে অত্যন্ত বরকত হইয়াছে। অতঃপর মৃত ব্যক্তির চাহারম ও চেহ্লামের উদ্দেশ্যে তৈরীকৃত খাবার সামনে রাখিয়া ফাতেহাখানি করা নাজায়েয ও বেদয়াত হইতে পারে না। বরং এইরূপ করা রাসূলের ছুন্নাত।

## দান ছদ্‌কার মাধ্যমে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ لِلّٰهِ مِنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا يَعْفُوْا اِلَّا عِزًّا وَمَاتَوَاضَعَ عَبْدٌ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ. (رواه مسلم والترمذى والمؤطأ)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "ছদকা দেওয়ার দরুণ ধন-সম্পদে কোন ঘাটতি পড়ে না। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রদর্শন করে, আল্লাহপাক তাহার ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি নম্রতা দেখায় এবং নিজকে ছোট বলিয়া প্রকাশ করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার মর্যাদা আরও উচ্চতর করিয়া দেন।"

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল, ছদকা ও খয়রাত করার ফলে ধন-সম্পদে ঘাটতি পড়ে না। বরং ইহা ধন বৃদ্ধির একটি সহজ উপায় এবং ধন-দৌলতকে পাক-পবিত্র করার একটি হাতিয়ার বিশেষ। সুতরাং ছদকা ও খয়রাত হইতে ভয় পাওয়া উচিত নহে। অন্যথায় জগত বিখ্যাত কৃপণ কারুনের ধন-সম্পদের মতই ধ্বংস হইয়া যাইবে। ছদকা খয়রাত করার ফলে ধন-সম্পদে কোন প্রকার ধ্বংস আসে না। বরং ইহার দ্বারা ধন-সম্পদে স্থায়িত্ব আসে।

## ক্ষমাই হচ্ছে মহৎগুন

মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করার ফলে নিজের ইজ্জত ও মান-সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং এইরূপ লোককে আল্লাহতায়ালা ভালবাসেন। যেমন কুরআনের ভাষায় বলা হইয়াছে–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"যাহারা ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় দান করে, নিজের রাগকে দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আল্লাহ তাআলা দানশীল পূণ্যাত্মাগণকে ভালবাসেন।



ক্ষমা করা উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের অভ্যাস। যেমন– হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর একটি দাসী তরকারীর পেয়ালা অন্যমনস্কভাবে ইমামের শরীরে ফেলিয়া দেয়, দাসী তো ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, কিন্তু রাসূলের নয়নমণি হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)কে এক ব্যক্তি একটি থাবা মারিয়াছিল, ইহাতে ইমাম সাহেব বলিলেনঃ "আমি ইহার জন্য তোমার নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিশোধ লইব না। যদি আল্লাহপাক আমাকে ক্ষমা করেন, তবে আমি তোমাকে আমার সাথে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইব।" এইরূপ আরও অনেক ঘটনা কিতাবে উল্লেখ আছে।

ক্ষমা করা উদার, উচ্চ-সাহসী ও উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। যেমন খলিফা হারুন-অর-রশীদের এক ছেলেকে অন্য একজনের ছেলে গালি দিয়াছিল, ইহাতে খলিফার ছেলে তাঁহার দরবারে নালিশ করিল। খলিফা সবকিছু শুনিয়া বলিলেনঃ "বাপু! যদি তোমার মাঝে সাহস থাকে, তবে তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। যদি তাহা না হয়, তবে তুমি তাহাকে একটি গালির পরিবর্তে একটি গালি আর দুই-তিনটি গালির পরিবর্তে দুই-তিনটি গালি দিতে পার। সাবধান! তাহার গালির চেয়ে অধিক যেন না হয়। কারণ, এখন তুমি বাদী আর সে বিবাদী। যদি তুমি তাহাকে একটি শব্দও অধিক গালি দাও, তাহা হইলে সে বাদী আর তুমি বিবাদীতে পরিণত হইবে। ইসলাম ধর্মে প্রতিশোধের হুকুম যথার্থ সম-পরিমাণ। তাহার একবিন্দুও বেশী হইতে পারে না।"

যে ব্যক্তি নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্ঠাচারিতা প্রদর্শন করে, আল্লাহপাক তাহাকে ইহকাল ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা দান করিবে। নম্রতা ও শিষ্ঠাচারিতার মধ্যে আল্লাহতায়ালা যে মর্যাদা ও করুণা নিহত রাখিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা অন্য কোন বস্তুর মধ্যে রাখেন নাই। কোন কবি সুন্দর বলিয়াছেন–

مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو

کہ دانہ خاک میں ملکر گلے گلزار ہوتاہے

"তুমি যদি কিছুটা মর্যাদা পাইতে চাও, তাহা হইলে তুমি তোমার অস্তিত্বকে

বিলীন করিয়া দাও, যেমন একটি বীজ তাহার অস্তিত্বকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া একটি বিরাট বাগানে রূপান্তরিত হয়।”

আত্মগৌরবের দ্বারা মানুষ বে-ইজ্জত ও লাঞ্ছিত হয়। মানব সমাজে তাহার প্রভাব কমিয়া যায়। নম্র ও শিষ্ঠাচার ব্যক্তি যেখানেই যাইবে, সেখানেই তাহার ইজ্জত ও স্থান মিলিয়া যায়। আত্মগৌরবকারী লোককে মানুষে হিংসা ও ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে। নম্র ও শিষ্ঠাচার ব্যক্তির কথা প্রভাব সম্পন্ন হয়। আত্মগৌরবকারী লোকের কথার দাম কম হয় এবং লোকে তাহাদের কথাকে গ্রাহ্য করে না। নম্র, ভদ্র ও শিষ্টাচার ব্যক্তি সৃষ্টি ও স্রষ্টার অতি প্রিয় পাত্র হইয়া থাকে। বিশ্বনবী জনাবে মুস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পুত-চরিত্রে নম্র, ভদ্র ও শিষ্টাচারিতাই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়।

## দো-মুখী লোক ফিৎনা ফসাদের কারণ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُوْ الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ. (رواه مالك)

**অনুবাদঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন– “মানব জাতির মধ্যে অতি নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে দো-মুখী। সে এক দলের নিকট একরূপ লইয়া এবং অন্য দলের নিকট অন্যরূপ লইয়া উপস্থিত হয়।” (মালেক)

**ব্যাখ্যাঃ** সেই দো-মুখী ব্যক্তিটি যেখানে গমন করে, সেখানে খোশামোদ ও তোষামোদের কথা বলিয়া থাকে। প্রত্যেক দলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে চায়। দো-মুখী লোক ফেৎনা-ফাসাদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আর সে নফছ বা আত্মার অধিনস্থ থাকে। ন্যায়বান ও সত্যবাদীলোক কখনও কাহারও খোশামোদের জন্য কথা বলিবে না। যাহা ন্যায় ও সত্য, তাহাই বাস্তবায়ন করিবে। দো-মুখী লোক দ্বারা মানুষ সংশোধন হয় না, বরং অসৎ, অন্যায় ও মিথ্যাবাদী লোকের নিকট গিয়া তাহার পছন্দ সই কথা বলিবে। যদ্বারা অন্যায় মিথ্যাবাদী লোক মিথ্যা বলা ও অন্যায় কাজ করিতে আরও বল পায়।



স্মরণীয় যে, মুসলমানের জিহ্বা আল্লাহ পাকের তলোয়ার বিশেষ। অন্যায় ও অসৎ কথাকে যেখানেই হউক না কেন সর্বদা অন্যায় ও অসৎ বলিয়া প্রচার করিবে।

## ছদকা ও দান-খায়রাত করিলে উহার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছিয়া থাকে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمِّىْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاَظُنُّهَا لَوْتَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ قَالَ نَعَمْ – (بخارى ومسلم)

**অনুবাদঃ** উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর নিকট আরজ করিল– “হুজুর! আমার মাতা হঠাৎ মারা গিয়াছেন এবং আমি খেয়াল করিতেছি যে, তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে তিনি কিছু দান-খয়রাত করিতেন অথবা দান-খয়রাত করিবার জন্য অছিয়ত করিতেন। সুতরাং এখন আমি যদি তাঁহার পক্ষ হইতে কিছু দান-খয়রাত করি, তবে কি উহার সওয়াব তিনি পাইবেন? হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উত্তরে বলিলেনঃ হ্যাঁ, পাইবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যাঃ** এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, ছদকা ও দান-খয়রাত করিলে উহার সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছিয়া থাকে। তদ্রূপ দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিলে উহার দ্বারাও মৃত্যু ব্যক্তি লাভবান হইয়া থাকে। ইহাই হইল আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাযহাব বা আকীদা। আর ইবাদতে বদনী (শারীরিক ইবাদত) যথা– নামাজ ও তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি সম্পর্কে পছন্দনীয় মত হইল এই যে, উহার সওয়াবও মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে। ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ী (রঃ) লিখিয়াছেনঃ “প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ইমাম আবদুচ্ছালাম সাহেব যখন ইন্তিকাল করেন, তারপর তাঁহাকে কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল যে, তিনি বলিতেছেনঃ আমি দুনিয়াতে কুরআন

তেলাওয়াতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট না পৌছা সম্পর্কে হুকুম করিতাম, কিন্তু এই জগতে (অর্থাৎ কবরে) উহার বিপরীত দেখিতে পাইতেছি।"

আকায়েদের কিতাবসমূহে আছে– صَدَقَةُ الْاَحْيَاءِ نَفْعٌ لَهُمْ

"অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তিদের ছদকা ও দান-খয়রাত ইত্যাদি (এর সওয়াব) মৃত ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

## প্রকৃত সম্পদশালী কে?

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ. (متفق عليه)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "অনেক ধন-সম্পদ দ্বারা তাওয়াংগিরী বা ধনশীলতা বুঝায় না। কিন্তু অন্তরের ধনশীলতাই হইল আসল ধনশীলতা।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তির অন্তরে ধৈর্য্য শক্তি রহিয়াছে, সে আত্মনির্ভরশীল এবং উচ্চ-মনা, যে অন্যের দ্বারস্থ হওয়াকে ঘৃণাবোধ করে এবং লোভ-লালসাকে পরিত্যাগ করে, যাহার অন্তরে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের কোন লোভ-লালসা থাকে না, সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক পক্ষে ধনী, প্রকৃত বিত্তশালী। আর যে ব্যক্তি অধিক কিছু অর্জনের জন্য লোভ-লালসায় ডুবিয়া থাকে, সে প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র ও পর মুখাপেক্ষী, যদিও তাহার অনেক ধন-সম্পদ আছে। যে ব্যক্তি অর্জিত সামান্য কিছুর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, লোভ-লালসা হইতে দূরে থাকে এবং আরও অধিক কিছু অর্জনের জন্য লোভ করে না, সে বাস্তবিকই ধনী, যদিও তাহার কোন ধন-সম্পদ না থাকে।

যেমন কোন কবি বলিয়াছেন–

توانگری بدل ست نه بمال

وبزرگی بعقل ست نه بسال

অর্থাৎ তাওয়াংগিরী বা ধনশীলতা অন্তর দ্বারাই অর্জিত হয়, ধন-সম্পদ দ্বারা



নহে। আর ইজ্জত-সম্মান ও বুজুর্গী নিজের বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা অর্জিত হয়, বয়স বৃদ্ধির দ্বারা নহে।

কোন কোন মুহাদ্দেছ বলিয়াছেনঃ অন্তরের তাওয়াংগিরী বলিতে বুঝায় ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে কামালিয়াত অর্জন করা। যাহা ব্যতীত মানবীয় বাক্-শক্তি মাহফুজ ও স্বাধীন থাকে না। অর্থাৎ প্রকৃত তাওয়াংগিরী, আসল দৌলত কামালিয়াতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ধন-সম্পদের মাধ্যমে লাভ হয় না।

হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ) বলিয়াছেন–

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا * لَنَا عِلْمٌ وَلِلْاَعْدَاءِ مَالٌ

فَاِنَّ الْمَالَ يُفْنٰى عَنْ قَرِيْبٍ * وَاِنَّ الْعِلْمَ يَبْقٰى لَايَزَالُ

অর্থাৎ "আমরা (মুসলমানগণ) আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বন্টনকৃত অংশ গ্রহণে রাজী হইয়াছি। আমাদের জন্য ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং শত্রুদের (অমুসলমানদের) জন্য ধন-সম্পদ বন্টন করা হইয়াছে। অতঃপর ধন-সম্পদ অবশ্যই অনতিবিলম্বে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। আর ইল্‌ম বা জ্ঞান অবশ্যই চিরন্তন হিসাবে বাকী থাকিবে।"

এই কথা সর্বজনবিদিত যে, ধন-সম্পদ ফেরাউন, কারুন ও অন্যান্যা সমস্ত কাফের তথা অসৎ প্রকৃতির লোকের মৌরুশী সম্পত্তি। আর ইল্‌ম বা জ্ঞান হইল আম্বিয়া, আউলিয়া এবং ওলামা সম্প্রদায়ের মৌরুশী সম্পত্তি। হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি অতি ভাগ্যবান; যে নিজের ধন-সম্পদকে আল্লাহ্‌র পথে সর্বদা খরচ করিয়া থাকে এবং শয়তানী তথা অসৎ পথে ব্যয় করে না। যেমন মসজিদ-মাদ্‌রাসা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণে, গরীব-মিস্‌কীনের সাহায্যে এবং মদ্‌রাসার ছাত্রগণের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সৎপথে দান-খায়রাত করাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা বলা হয়।

আল্লাহপাক হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলাম ধর্মকে মজবুত ও শক্তিশালী করিয়াছেন বাস্তবিক পক্ষে যদি সিদ্দিকী ফয়েজ হাসিল করার ইচ্ছা হয়, তবে দ্বীনি খেদমতের জন্য নিজের মধ্যে সিদ্দীকি

গুণাগুণ সৃষ্টি করুন। যদ্বারা ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য অর্জন হয়। নিজের ধন-দৌলতকে কারুনী ও ফেরাউনী দৌলতে পরিণত করিবেন না। আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অযথা খরচ করিলে উহার খারাপ পরিণাম নিজের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে।

## পৃথিবীর আগুন ও জাহান্নামের আগুনের তারতম্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُ بَنِىْ اٰدَمَ الَّتِىْ يُوْقِدُوْنَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جَزَءًا مِنْ نَارِجَهَنَّمَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ اِنَّهَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءًا.

(رواه مالك)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "মানব জাতি যে আগুন তাহারা জ্বালাইয়া থাকে, উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ বিশেষ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আগুণই পৃথিবীর যথেষ্ট ছিল। হুজুর বলিলেনঃ এই আগুন হইতে জাহান্নামের আগুন ঊনসত্তর ভাগ বেশী প্রভাব সম্পন্ন।" (মালেক)

ব্যাখ্যাঃ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে পৃথিবীর আগুন হইতে ঊনসত্তর ভাগ জ্বালানী শক্তি ও তেজ অধিক পরিমাণে রহিয়াছে।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন– "তোমরা কি পৃথিবীর আগুনের মত জাহান্নামের আগুনকেও লাল বর্ণের মনে কর? উহা আলকাতরার চেয়েও অধিক কাল বর্ণের হইবে।"

জাহান্নামের দারোয়ান মালিক (ফেরেস্তা) ও জাহান্নামের আগুন হইতে আল্লাহর দরবারে পানাহ্ মাগিয়া থাকেন।

হে ঈমানদার মুসলমান ভাইগণ! জাহান্নামের আগুনের অবস্থা দেখুন। সৎ ও পূণ্য করিয়া এবং অসৎ ও খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকিয়া প্রত্যেক দিন জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি কামনা করা প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য।



আমরা পৃথিবীর এই আগুনকে কতই ভয় করিয়া থাকি। ছোট বড় সকলেই জানে যে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যে জানিয়া শুনিয়া নিজেকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে। কোন লোকই লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়েও নিজের প্রাণকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহে। অতঃপর চিন্তা করিয়া দেখুন, দোযখের সত্তর ভাগের এক ভাগ আগুনে লক্ষ টাকার বিনিময়েও নিজের প্রাণকে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত থাকে না। তবে এমন কোন বোকা ও নির্বোধ লোকও আছে, যে পূর্ণ সত্তর ভাগ আগুনের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিবে?

মুসলমান ভাইগণ! দোযখের আগুনের অবস্থা লক্ষ্য করুন আর নিজেকে এ আগুন হইতে রক্ষা করুন। পৃথিবীর লোভ-লালসায় পড়িয়া নিজেকে দোযখের আগুনের খোরাকে পরিণত না করুন। আল্লাহ্‌পাক সকল মুসলমানকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করুন। আমীন।

## কিয়ামত দিবসে রাসুল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শান- শওকতের বর্ণনা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وُلد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَافَخْرَ وَبِيَدِىْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَافَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سَوَاءَ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِىْ. (رواه الترمذى)

অনুবাদঃ হযরত আবুছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "আমি কিয়ামতের দিনে (যেই দিনে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই একত্রিত হইবেন) সকল আদম-সন্তানের নেতা হইব। কিন্তু ইহাতে আমার গর্ব নহে।" তিনি আরও বলেন– "সেইদিন আমার হাতে 'লেওয়ায়ে হাম্‌দ' বা প্রশংসার পতাকা থাকিবে, কিন্তু ইহাতে আমার গর্ব নহে, সেইদিন আদম (আঃ) ও অন্যান্য প্রত্যেক নবী আমার পতাকার তলে থাকিবেন।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শান-

শওকত এবং মান-মর্যাদার এক অতি নগন্য বর্ণনা রহিয়াছে যাহা রোজ কিয়ামতে প্রকাশ পাইবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের মধ্যে কেহই এইরূপ নাই, যাহার জন্য প্রথমে বেহেশ্‌তের দরজা খোলা হইবে। বেহেশ্‌তের দারওয়ান হাবীবে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর অপেক্ষায় থাকিবেন। আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর নিকটতম অর্থাৎ সকল নবীগণের প্রত্যেকেই হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পতাকাতলে থাকিবেন।

ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রাঃ) 'ফিক্‌হে-আকবর' নামক কিতাবে বলিয়াছেন–

شَفَاعَةُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقٌّ وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ وَلِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمُ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ لِلْعِقَابِ حَقٌّ ثَابِتٌ.

অর্থাৎ (রোজ কিয়ামতে) সমস্ত নবী রাসূল বিশেষতঃ প্রিয়নবী জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সুপারিশ মুসলমান গুনাহ্‌গারদের জন্য এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত যাহারা আজাবের উপযুক্ত তাহাদের জন্য নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান থাকিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন–

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَافَخْرَ

"রোজ কিয়ামতে আমি সকল আদম-সন্তানের নেতা হইব, কিন্তু ইহাতে আমার গর্ব নহে।"

ইবনে মাজাহ্‌ কিতাবের হাদীসে আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন–

مَامِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ وَمَنْ سِوَاءُ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِيْ

"রোজ কিয়ামতে হযরত আদম (আঃ) এবং অন্যান্য সকল নবী আমার পতাকা তলে থাকিবেন।"



তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন–

اَنَا اَوَّلُ مَنْ تُنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ فَاُكْسٰى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُوْمُ ذٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِيْ

"সর্ব প্রথমে জমিন আমার জন্য ফাটা হইবে এবং সর্বপ্রথমে আমাকে বেহেশ্‌তের পোষাক পরিধান করা হইবে তারপর আমি আরশের ডান পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিব, আল্লাহর মাখলুকাতে আমি ব্যতীত অন্য কেহই নাই, যে ঐ স্থানে দাঁড়াইবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَ مُحَمَّدًا عَلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ وَعَلَى الْاَنْبِيَاءِ

"আল্লাহ পাক জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে সমস্ত আসমানবাসী ও সকল নবীর উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন।"

উল্লেখিত হাদীসগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মর্যাদা সমগ্র পৃথিবী ও সকল সৃষ্টির বহু উর্ধ্বে। আর আল্লাহর দরবারে তাঁহার যে ইজ্জত ও মর্যাদা আছে, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

সারকথা এই যে, হুজুর জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সমস্ত সৃষ্টি জগত, আম্বিয়া ও ফেরেস্তাগণের সর্দার এবং ইমাম হওয়ার ব্যাপারে সকল মাযহাবী ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেন। ইহা যে অস্বীকার করে, সে ফাছেক ও সকল লোকের ঘৃণার পাত্র। আর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সুপারিশ সকল মু'মিন গুনাহ্‌গারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। এই সম্পর্কে সমস্ত ইমামগণ একই মতামত প্রকাশ করেন। ইহার অস্বীকারকারী গোমরাহ্‌ ও পথভ্রষ্ট।

## হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর নূরের বর্ণনা

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاجَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ.

**অনুবাদঃ** হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– "হে জাবির! আল্লাহ তাআলা নিজের নূর হইতে সকল বস্তুর আগে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

**ব্যাখ্যাঃ** 'তারীখুল খমীস' নামক কিতাবে আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

"সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আমার নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

'ছির্‌রুল আছরার' নামক কিতাবে আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ رُوْحِىْ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ.

"সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আমার রূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা আমার নূরকে পয়দা করিয়াছেন।"

'দালায়েলুন নবুওয়াত' নামক কিতাবে ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত জাবির (রাঃ) হুজুরের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার পদতলে উৎসর্গিত, আমাকে বলুন যে, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথমে কি জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন? হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উত্তরে বলিলেন, "হে জাবির! আল্লাহতাআলা সমস্ত সৃষ্টি জগতের আগে তোমার নবীর নূরকে তাঁহার নিজের নূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই নূর আল্লাহর কুদরতে আল্লাহপাক যেখানে চাহিয়াছেন আবর্তন করিতে লাগিল। সেই সময়ে লাওহ-কলম, বেহেশ্‌ত-দোযখ, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য ফেরেশ্‌তা, মানব-দানব ইত্যাদি কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর যখন আল্লাহপাক বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করিতে চাহিলেন, তখন



সেই নূরকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রথম ভাগ হইতে কলম, দ্বিতীয় ভাগ হইতে লাওহ, তৃতীয় ভাগ হইতে আর্‌শ সৃষ্টি করিলেন। তারপর চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগে বিভক্ত করেন, প্রথম ভাগ হইতে আর্‌শ বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণ, দ্বিতীয় ভাগ হইতে কুরশী, তৃতীয় ভাগ হইতে সমস্ত ফেরেশ্‌তাকে সৃষ্টি করিলেন। আবার চতুর্থ ভাগকে চার অংশে ভাগ করেন, প্রথম অংশ হইতে আসমান, দ্বিতীয় অংশ হইতে জমিন, তৃতীয় অংশ হইতে বেহেশ্‌ত এবং চতুর্থাংশ হইতে দোযখ সৃষ্টি করিলেন।"

ইমাম আবুল হাছান আশয়ারী (রঃ) বলেন– আল্লাহপাক নূর, কিন্তু উহা অন্যান্য নূরের মত নহে! আর নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর রূহপাক আল্লাহ তাআলার নূরের প্রতিবিম্ব এবং ফেরেশ্‌তাগণ ঐ নূর সমূহের একটি ফুল বিশেষ। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার (ذَاتِى) সত্ত্বাগত নূর হইতে সৃষ্ট। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে–

يَاجَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ

"হে জাবির! আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর আগে তোমার নবীর নূরকে তাহার নিজের নূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই হাদীসে نُوْرِهٖ (নূরিহী) বাক্যাংশটির মধ্যে যে ه (হী) সর্বনাম পদ আছে, উহা আল্লাহ তাআলার জ্বাতী বা সত্ত্বাগত নামের পরিবর্তে বসিয়াছে। আল্লামা জুরক্বানী (রঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

قَوْلُهٗ مِنْ نُوْرِهٖ اَىْ هُوَ ذَاتِهٖ

"আল্লাহ তাআলা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নূরকে ঐ নূর হইতে পয়দা করিয়াছেন, যে নূর আল্লাহর নিজস্ব জ্বাত বা সত্ত্বা।"

অর্থাৎ আল্লাহতাআলা কোন মাধ্যম ছাড়া নিজের সত্ত্বা হইতে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হ্যাঁ, আল্লাহ নিজস্ব সত্ত্বা হইতে হুজুরের নূরকে সৃষ্টি করার এই অর্থ নহে যে, (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহর নিজস্ব সত্ত্বাই হুজুরের রিসালাতের সত্ত্বা। অথবা আল্লাহর সত্ত্বার কিয়দাংশ বা পূর্ণ অংশ নবী হইয়া গিয়াছে। (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলা

অংশ বা টুকরায় পরিণত হওয়া এবং কোন কিছুর সহিত একাত্ম হইয়া যাওয়া অথবা কোন কিছুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইত্যাদি কাজ হইতে পাক-পবিত্র। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে অথবা অন্য কোন বস্তুকে খোদার সত্ত্বার অংশ বা খোদার নিজস্ব সত্ত্বা বলিয়া মনে করা কুফরী।

এখন নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নূরের সৃষ্টিকার্যের রহস্য আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের জ্ঞাতব্য বিষয়। সৃষ্টিজগতের মধ্যে রাসূলের সত্ত্বাকে তো কেহই চিনে না। কিন্তু উহার প্রকাশ্য অর্থ এই যে, আল্লাহপাক সমস্ত সৃষ্টি জগতকে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিমিত্তে পয়দা করিয়াছেন। যদি হুজুরের সৃষ্টি না হইত, তবে কোন কিছুই সৃষ্টি হইত না। আল্লামা জুরক্বানী (রঃ) বলেনঃ

اَىْ مِنْ نُوْرِ هُوَ ذَاتِهٖ لَابِمَعْنٰى اَنَّهَا مَادَّةَ خَلَقَ نُوْرِهٖ مِنْهَا بَلْ بِمَعْنٰى تعلّق الاَرَادَةَ بِهٖ بلاَ وَاسطة شَيْئٍ فِىْ وَجُوْدِهٖ.

"নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আল্লাহ তাআলার নূর হইতে সৃষ্টি হওয়ার এই অর্থ নহে যে, (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহর সত্ত্বাই হুজুরের নূরের সত্ত্বা এবং আল্লাহর ঐ সত্ত্বা হইতে হুজুরের নূরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বরং ইহার অর্থ হুজুরের অস্তিত্ব অন্য কোন বস্তুর মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর ইচ্ছা সংযোগ হওয়া।"

মোটকথা হইল, যেমন আল্লাহপাকের অস্তিত্বের পর্যায়ে শুধুমাত্র এক খোদার সত্ত্বাই বিদ্যমান, আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সবকিছু তাহার অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। তদ্রুপ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সৃষ্টির পর্যায়ে শুধুমাত্র এক মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সত্ত্বাই বিদ্যমান তিনি ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টি জগতের উপর তাঁহার নূরের উল্টা দিকের ফয়েজ বিরাজ করিতেছে।

(مرتبه كون ميس) স্বয়ং অস্তিত্বের পর্যায়ে 'নূরে আহাদী' বা আল্লাহর নূর একটি সূর্য বিশেষ এবং সমস্ত সৃষ্টি জগত উহার আয়েনা স্বরূপ। আর (مرتبه تكوين ميس) নবীর অস্তিত্ব লাভের পর্যায়ে 'নূরে আহমদী' অর্থাৎ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নূর একটি সূর্য বিশেষ এবং সমস্ত সৃষ্টি জগত ঐ নূরের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ।



## রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সমস্ত সৃষ্টি জগতের রূহ

'মাতালেউল-মুছিররাত' নামক কিতাবে আছে, 'নবীয়ে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নাম 'মুহ্য়ী' অর্থাৎ জীবিতকারী। সুতরাং হুজুর আকরম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সারা জাহানের প্রাণ ও জিন্দেগী এবং সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের জন্য কারণ বিশেষ।

উক্ত কিতাবে আরও আছে–

هُوَ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روحُ الْاَكْوَان وحياتها وسر وَجُوْدها ولولاه لذهبت وتلاشت كَمَا قَالَ سيّدى عبد السَّلام رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ لاشيئ الا وَهُوَ بِهٖ منوط اذ لَوْلَا الوَاسطَة لذهب كَمَا قِيْلَ الموسوط.

"রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সমস্ত সৃষ্টি জগতের রূহ ও প্রাণ এবং এই সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বের কারণ বিশেষ। যদি হুজুর না থাকেন, তবে সারা জাহান নেস্ত-নাবুদ হইয়া যাইবে। যেমন আমার মুরুব্বী হযরত আবদুচ্ছালাম (রাঃ) বলিয়াছেনঃ সৃষ্টি জগতের মধ্যে এইরূপ কেহই নাই, যে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর আঁচলের সহিত সংযুক্ত নহে। কেননা, হুজুরের আঁচলের সহিত যাহার সম্পর্ক ছিন্ন হইবে, সে নিজেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।"

ইমাম ইবনে হাজর (রাঃ) "আফজালুল ক্বেরা" নামক কিতাবে বলেনঃ

لانه الممد لهم اذ هو الوارث الحضرة الالهية والمستمد منها بلاواسطة دون غيره فانه لايستمد منها الا بواسطة فلايصل لكامل منها شيئ الا وهو من بعض مدده وعلى يديه.

"সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাহায্যকারী হইলেন নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)। কারণ, হুজুরই একমাত্র আল্লাহপাকের দরবারের ওয়ারিশ। তিনিই একমাত্র আল্লাহর দরবার হইতে কোন মাধ্যম ছাড়া সাহায্য পাইয়া থাকেন। আর সমস্ত সৃষ্টি জগত হুজুরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য পাইয়া থাকে। সুতরাং যে কোন কামেল বা গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বা বস্তু যে কোন গুণ

লাভ করিয়াছে, উহা শুধু হুজুরের সাহায্যের মাধ্যমে এবং হুজুরের পবিত্র হাতের মাধ্যমে লাভ করিয়াছে।"

মোট কথা হইল, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আল্লাহপাকের জাত বা সত্বার তাজাল্লী প্রাপ্ত এবং সমস্ত আম্বিয়া, আউলিয়া তথা সারা বিশ্ব জগত আল্লাহর নাম ও ছিফাত বা গুণাবলীর তাজাল্লী প্রাপ্ত। উল্লেখিত বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে চাহিলে ইমামে আহলে ছুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রেজা খান (রঃ) ছাহেব রচিত 'চেলাতুচ্ছফা ফি নূরীল মুস্তফা' পুস্তিকাটি পাঠ করুন।

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কোন ছায়া ছিল না

عَنْ ذَكْوَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ. (رواه الحكيم الترمذى)

অনুবাদঃ- হযরত জাকওয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "প্রখর রোদে এবং চাঁদের আলোতেও হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কোন ছায়া দৃষ্টিগোচর হইত না।"

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَااُرِيْدُ الْخَطَّ لِئَلَّا يَقَعُ ظِلُّ الْقَلَمِ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى. (رواه الترمذى)

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন- "আমি এই কারণে লিখিতে চাহিতেছিনা, যেন কলমের ছায়া আল্লাহ পাকের নামের উপর না পড়ে।"

فَجَازَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى ذٰلِكَ اَنْ يَّرْفَعَ ظِلَّهٗ عَنِ الْاَرْضِ فَلَا يُوْطَاهُ.

(نسيم الرياض)

"অতঃপর আল্লাহতায়ালা উহার জন্য জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে এই মর্যদা দান করিলেন, তিনি হুজুরের ছায়া জমিন হইতে উঠাইয়া লইলেন, যাহাতে কেহই তাঁহার পবিত্র ছায়ার উপর পা রাখিতে না পারে।" (নছিমুর রেয়াজ)



রৌদ্র, চাঁদের কিরণ এবং অন্যান্য আলো যাহার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও স্নিগ্ধতা রহিয়াছে, সেই আলোগুলি নিজ ব্যতীত অন্যান্য আলোর জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারেনা। অতঃপর সেই গুলির কোন ছায়া পড়ে না।

'ওয়াফাউল্-ওয়াফা' নামক কিতাবের লেখক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন –

قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ الشَّمْسِ اِلَّا غَلَبَ ضُوْءُهٗ ضَوْءَهَا وَلَامَعَ سِرَاجٍ اِلَّا غَلَبَ ضُوْءُهٗ ضُوْءَهٗ.

তিনি বলেনঃ "হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কোন ছায়া ছিলনা, তিনি সূর্যের সামনে দাঁড়াইলে তাঁহার আলো সূর্যের আলোর উপর বাড়িয়া যাইত। আর বাতির আলোর উপর হুজুরের নূরের আলো প্রভাব বিস্তার করিত।"

'কিতাবুশ্ শেফা' নামক গ্রন্থে আছে–

اَنَّهٗ لَاظِلَّ لِشَخْصِهٖ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ لِاَنَّهٗ كَانَ مُنَوَّرًا.

"হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পবিত্র শরীরের কোন ছায়া রোদে এবং চাঁদের কিরণে ছিল না। কারণ, তিনি ছিলেন নূরে আলোকিত।"

'তাফসীরে মাদারেক' এ লিখিত আছে–

قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَااَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِئَلَّا يَقَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ الظِّلِّ.

আমিরুল মুমেনিন হযরত ওছমান (রাঃ) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর খেদমতে আরজ করিলেনঃ "হুজুর! আল্লাহতায়ালা আপনার ছায়াকে জমিনের উপর ফেলেন নাই, যেন ঐ ছায়ার উপর কোন মানুষ তাহার পা ফেলিতে না পারে।" হযরত মুজাদ্দেদ আল্ফে সানী (রাঃ) বলিয়াছেন, ছরকারে দো-আলম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কোন ছায়া ছিলনা।

মোট কথা এই যে, হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ছায়া না থাকা সম্পর্কে অনেক প্রমাণ এবং ওলামাগণের বক্তব্য বিদ্যমান আছে।

এইখানে উহার বিস্তরিত বর্ণনার অবকাশ নাই।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তাঁহার রচিত 'ইম্‌দাদুস্‌ সুলুক' নামক পুস্তকের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ

"بتو اتر ثابت است که آنحضرت صلی اللّٰه علیه وسلم سایه نداشت"

"বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত যে, আঁ হযরত (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কোন ছায়া রাখিতেন না।"

## হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তখনও নবী ছিলেন যখন আদমের কোন অস্তিত্ব ছিল না

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ.

(رواه الترمذی)

অনুবাদঃ- হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- "আমি ঐ সময়ে নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) পানি ও মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দিতেছে, অর্থাৎ তখনও তাঁহার কোন অস্তিত্ব ছিলনা।" (তিরমিযী)

অন্য একটি বর্ণনায় আছে-

وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

"আমি তখনই নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) এর রূহ শরীরের মাঝে অস্তিত্ব লাভ করে নাই।"

যদিও সমস্ত নবীগণের নবুওয়াত আল্লাহর জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রথম হইতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নবুওয়াত সমস্ত ফেরেস্তাগণের সম্মুখে উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট ছিল। তিনি ব্যতীত অন্যান্য নবীগণের নবুওয়াত গোপন অবস্থায় ছিল।

মুহাক্কেক সুফীগণ বলিয়াছেনঃ হুজুরের পবিত্র রূহ অন্যান্য নবীগণের রূহগুলিকে রক্ষণা-বেক্ষণ এবং আল্লাহর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে ফয়েজ দান করেন। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর রিসালাত যেমন যুগ ও কালের ব্যাপকতা হইতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তদ্রূপ স্থান ও জায়গার



ব্যাপকতা হইতেও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর ইহা তাঁহার রিসালাতের বৈশিষ্ট্যাবলী হইতে একটি বৈশিষ্ট্য। (নছিমুর রেয়াজ)

মোট কথা এই যে, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফেরেস্তোকুল, নবী সম্প্রদায়, মানব-দানব, আরশ-কুরশী তথা আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি জগতের সরদার ও নেতা। আর সমস্ত মাখ্‌লুকাত হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ফয়েজের খনি হইতে উদ্ভূত। ইহার উপর সমস্ত উম্মতের ঐক্যমত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করে, সে মুনাফেক ও পথভ্রষ্ট।

হযরত আদম (আঃ) এবং সকল আদম সন্তান হুজুর নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর রূহানী সন্তান। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বনবী জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ঘোষণা করিয়াছেনঃ "আদম ও তাঁহার সকল সন্তান রোজ কেয়ামতে আমার 'লেওয়ায়ে হামদ্‌' বা প্রশংসার পতাকা' তলে অবস্থান করিবে।"

উপরোল্লেখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইল যে, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নবুওয়াত আদম সৃষ্টির পূর্ব কাল হইতে বিরাজমান ছিল। ইহার প্রাথমিক যুগ কখন হইতে শুরু হইয়াছে, তাহা আল্লাহতায়ালাই জানেন।

## আল্লাহ তাআলা এক লক্ষ আদম সৃষ্টি করিয়াছেন

শেখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী তাঁহার রচিত 'ফতুহাতে মক্কীয়া' নামক গ্রন্থে একটি হাদীস নকল করিয়াছেন, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বর্ণনা করেন-

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ مِائَةَ اَلْفِ اٰدَمَ.

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা একলক্ষ আদম সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই হাদীস বর্ণনার পর উক্ত গ্রন্থে শেখ ইব্‌নে আরবী একটি ঘটনা নকল করিয়াছেন–

"এক সময় আমি কা'বা শরীফের তাওয়াফ করিতেছিলাম, তখন আমার এইরূপ মনে হইল যে, আমার সহিত এক জামায়াত লোক তাওয়াফ

করিতেছে এবং আমি তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি নাই। তাহারা তাওয়াফ করার সময়ে দুইটি আরবী কবিতা পাঠ করিলেন, যাহার মর্মার্থ এই যে- "তোমরা যেভাবে এই ঘরের তাওয়াফ করিতেছ, আমরাও একসাথে মিলিয়া কয়েক বৎসর পূর্বে এই বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করিয়াছিলাম।"

যখন আমি এই কবিতা শুনিতে পাইলাম, তখন আমার মনে হইল যে, ইহারা 'আলমে-মেছাল' এর আব্‌দাল হইবেন। তখনই উহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে নজর করিয়া বলিলেন যে, "আমি তোমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের মধ্যে একজন বুজুর্গ।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-গত হইয়াছে এইরূপ কত বৎসর আপনি অতিবাহিত করিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেনঃ গত হইয়াছে এইরূপ চল্লিশ হাজার বৎসর অধিক সময় আমি অতিবাহিত করিয়াছি। আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম– হযরত আদম (আঃ) এর জন্মকাল হইতে এখনও তো সাত হাজার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তিনি বলিলেন– তুমি কোন আদমের কথা বলিতেছ? হ্যাঁ, ইহা ঐ আদম, যিনি এই সাত হাজার বৎসর পূর্বে জন্ম হইয়াছিলেন! শেখ ইবনে আরবী বলেন, তখনই উক্ত হাদীসের কথা আমার মনে পড়িল। ঐ হাদীসে এই ঘটনার সত্যতার প্রমাণ রহিয়াছে।

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল– আদম (আঃ) এর তিন হাজার বৎসর পূর্বে কে ছিলেন? তিনি উত্তরে বলিলেন– আদম ছিলেন। যখন তিনি এই কথা তিনবার বলিলেন, তখন প্রশ্নকারী তাঁহার সামনে মাথা নত করিয়া দিল এবং চুপ হইয়া গেল। সেই সময় হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যদি তুমি ত্রিশ হাজার বার জিজ্ঞাসা করিতে যে, আদমের পূর্বে কে ছিল? তবে আমি উত্তরে বলিতাম– আদম ছিল।

'তারিখে তাবরী' নামক ইতিহাস গ্রন্থে আছে–

হযরত মূছা (আঃ) একদিন আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেনঃ হে খোদা! আসমান-জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন আজ কত বৎসর হইয়াছে? খোদা উত্তরে বলিলেনঃ হে মুছা! তুমি অমুক জঙ্গলে এক কূপের নিকট গিয়া সেই কূপের মধ্যে একটি কাঁকর নিক্ষেপ কর, তবে আসল রহস্য তুমি জানিতে পারিবে



অতঃপর হযরত মুছা (আঃ) সেই কূপের কাছে গেলেন এবং উহার মধ্যে কাঁকর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কূপের ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল– কূপের পাড়ে কে? মুছা (আঃ) উত্তরে তাঁহার নিজের বংশ-তালিকা সহকারে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত গণনা করিয়া বলিলেন যে, আমি মুছা ইবনে ইম্‌রান ইবনে্‌ ইয়াছহার ইবনে .......... আদম। পুনরায় আওয়াজ আসিল যে, প্রত্যেক যুগে এই নাম ও বংশের লোক এই কূপের কাছে আসিয়াছিল এবং এই কূপের ভিতরে একটি কাঁকর নিক্ষেপ করিয়াছিল, এইভাবে কাঁকর নিক্ষেপ করিতে করিতে কূপের অর্ধেক পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

উপরোল্লেখিত সমস্ত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইল যে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নবুওয়াত কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আল্লাহ তাআলাই জানেন। সেই ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অকেজো ও নিষ্ক্রিয়।

## হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সুরতের বর্ণনা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدِىَّ فَعَلِمْتُ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَتَلَا وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (رواه الدارمى)

অনুবাদঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "আমি আমার প্রভু আল্লাহ তাআলাকে খুবই সুন্দর সুরতের মধ্যে দেখিয়াছি। আল্লাহপাক আমাকে প্রশ্ন করিলেনঃ হে নবী! এই সম্মানিত ফেরেশ্‌তাগণ কি ব্যাপারে ঝগড়া করিতেছে? আমি বলিলামঃ মুনিব! তুমিই ভাল জান। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমার দুই কাঁধের মাঝখানে তাঁহার হাতটি রাখিলেন, আমি আমার বুকের মধ্যে উহার শীতলতা অনুভব করিলাম।

তারপর আমি আস্‌মান জমিনের সবকিছু সম্পর্কে অবগত হইলাম। পরে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নিম্নলিখিত আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেনঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ.

"ঐরূপ আমি ইব্রাহীম (আঃ)কে আসমান জমিনের দেশগুলি দর্শন করাইয়াছি, যাহাতে তিনি বিশ্বাসীদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।" (দ্বারমী)

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বাণী رَأَيْتُ رَبِّىْ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলাকে দেখার সময় হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সুরত অত্যন্ত সুন্দর ছিল। আর এই অর্থ নহে যে, আল্লাহ তাআলাকে তাহার সুন্দর সুরতের মধ্যে দেখিয়াছেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা সুরত হইতে পাক-পবিত্র। যেমন আমরা বলিয়া থাকি যে, আমি ভাল কাপড় পরিধান অবস্থায় প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। অর্থাৎ আমি যখন প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তখন আমার পরিধেয় বস্ত্র ভালই ছিল।

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে এল্‌মে গায়েব দান করা হইয়াছে

স্মরণ রাখা উচিত যে, বিশ্বনবী জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাদের নিকট মানবীয় সুরতে তশরীফ আনিয়াছিলেন এবং আল্লাহপাকের সহিত নূরানী সুরতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মানুষের ঘরের পোষাক এক রকম এবং বাহিরের পোষাক অন্য রকম হইয়া থাকে। আর যথাসম্ভব উক্ত ঘটনাটি মি'রাজের বর্ণনা। বস্তুতঃ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) স্বীয় তাঁহার মা'বুদ আল্লাহকে দেখিয়াছেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁহার 'মাহবুব' জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন– "ফেরেশতাগণ কোন প্রকার নেক আমল বা পূণ্যকাজ আমার দরবারে পেশ করার জন্য ঝগড়া করিতেছে যে, একজন বলিতেছে আমি পেশ করিব, অন্য একজন বলিতেছে– আমিই পেশ করিব।" এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নম্রতা হিসাবে অজ্ঞানতাই প্রকাশ করিলেন– "মুনিব! আমি জানি না।" অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহার রাহমতের হাত খানা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পিঠের উপর রাখিলেন এবং ইহার ফয়েজ



জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বুক ও অন্তরে পৌছিয়া গেল। যদ্বারা তাহার পবিত্র হৃদয় আল্লাহ্‌র ইলমের জন্য প্রশস্ত হইয়া গেল।

প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ মোল্লা আলী কারী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত হাদীসটি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জ্ঞানের প্রসারতা ও ব্যাপকতার উপর স্পষ্ট দলীল ও জলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে সাত আসমান তথা উহার উপরস্থিত সমস্ত বস্তু এবং সাত জমিন তথা উহার নিম্নস্থিত বিন্দু বিন্দু বস্তু এবং যে মাছ ও ষাঁড়ের উপর জমিন স্থিরকৃত এইসব কিছুর সার্বিক জ্ঞান দান করিয়াছেন।

শাহ্‌ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহ্‌লভী (রঃ) বলিয়াছেনঃ উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পিঠে আল্লাহর হাত রাখার অর্থ হইল হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে সকল প্রকার জ্ঞান দান করা।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলা তাহার হাবীব (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তথা কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান দান করিয়াছেন। কেননা, পৃথিবীর বুকে মানুষের কাজ-কর্ম এবং উহার সম্বন্ধে আসমানে ফেরেশ্‌তাগণের ঝগড়া কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে, যাহা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মি'রাজ শরীফে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

আর যেসব আয়াত এবং হাদীসে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইল্‌মে গায়েবকে রহিত করা হইয়াছে, উহার অর্থ আল্লাহ্‌র নিজস্ব (ذاتى) ইলম বা সত্ত্বাগত জ্ঞান। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁহার খলিল ইব্রাহীম (আঃ)কে আল্লাহর জগৎ সমূহ দেখাইয়াছেন তদ্রুপ তাঁহার হাবীব জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কেও আল্লাহর জগৎ সমূহ দেখাইয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, মি'রাজ শরীফে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে শুধু মাছয়ালাগুলি বলা হয় নাই। মাছয়ালা তো মৌলভীগণকে বলা হইয়া থাকে। বরং হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে মাছয়ালা বলার সাথে সাথে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি জগতও দেখানো হইয়াছে। নতুবা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কুরআনের উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করিতেন না।

হযরত ফাতেমা জাহ্‌রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ مَامِنْ شَيِّئٍ لَمْ اَكُنْ اريته فِىْ مَقَامِى هَذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّار

(بخارى)

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন যে, আমি আমার এই জায়গা হইতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের সবকিছু দেখিতেছি, এমনকি বেহেশ্‌ত দোযখও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। (বুখারী)

হযরত আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِىْ عَمَّا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ (بخارى)

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ওয়াজ-নছিহত করার সময় সাহাবাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ "তোমরা যাহা ইচ্ছা, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।" এক ব্যক্তি আরজ করিলঃ "হুজুর! আমার পিতা কে? তিনি উত্তরে বলিলেন, "হুজাফা তোমার পিতা।" (বুখারী)

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সবকিছু জানেন।

বুখারী শরীফে আছে– হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন– "একদিন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) পৃথিবীর প্রাথমিক যুগ হইতে কেয়ামতের পরবর্তী ঘটনাগুলি পর্যন্ত আমাদিগকে বলিয়া দেন। ইহার মধ্যে আমাদের কিছু কিছু মনে আছে এবং কিছু কিছু ভুলিয়া গিয়াছি।"

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় আছে– জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন– "আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক হিসাব-নিকাশ ব্যতীত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।"

হযরত ওকাসা (রাঃ) আরজ করিলেন–

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ لِىْ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ لِىْ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَتْ بِهَا عُكَاشَةُ.



"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন আমাকে ঐ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত করে।" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ "তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ।" তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিলঃ "হুজুর! আমাকেও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন।" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ "ওকাসা তোমার উপর অগ্রবর্তী হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ এখন সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট ইল্‌মে গায়েব রহিয়াছে, তিনি সকল কিছুর ইখতিয়ার রাখেন। তাঁহার শাফায়াত হইল সার্বজনীন। তাঁহার শাফায়াত সকলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে। নবী হউক বা ওলী হউক, সকলই তাঁহার শাফায়াতের গণ্ডির ভিতরে অবস্থিত।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন–

اَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ اَنَا اَوَّلُ

شَفِيْعٍ فِىْ الْجَنَّةِ.

"কেয়ামতের দিন সমস্ত নবীকুল আমার পিছনে থাকিবেন, সর্ব প্রথমে আমিই বেহেশ্‌তের দরজায় আঘাত করিব এবং সর্বপ্রথমে আমিই সুপারিশ করিব"।

'তফসীরে খাজেন' ইত্যাদি কিতাবে আছে- হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেনঃ "সৃষ্টির পূর্বে যখন আমার উম্মত মাটির আকারে ছিল, তখন তাহাদিগকে আমার সামনে তাহাদের নিজ সুরতে পেশ করা হইল। যেমন হযরত আদম (আঃ) এর সামনে পেশ করা হইয়াছিল। কে আমার উপর ঈমান আনিবে এবং কে কুফরী করিবে, তাহাও আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।" যখন মুনাফিকগণ এই কথা শুনিল, তখন তাহারা তামাশা ও ঠাট্টা স্বরূপ বলিলঃ "মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ধারণা এই যে, যাহারা এখন জন্মলাভ করে নাই, তাহাদের মধ্যে কে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে আর কে কুফরী করিবে তাহা তিনি জানেন, অথচ আমরা তাঁহার সহিত বসবাস করিতেছি, কিন্তু তিনি আমাদিগকে চিনেন না।"

মুনাফিকগণের এই কথা শুনিবা মাত্র হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মিম্বরে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র তা'রিফ প্রশংসার পর বলিলেন-"ঐ লোকদের কি অবস্থা হইবে? যাহারা আমার জ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনা করে। এখন হইতে কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে, উহাদের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর আর আমি তোমাদিগকে তাহা বলিয়া না দিই।" আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা ছাহ্‌মী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা কে?" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তৎক্ষনাৎ বলিয়া দিলেনঃ 'তোমার পিতা হুজাফা।' অতঃপর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) দাঁড়াইয়া আরজ করিলেনঃ "হুজুর! আমরা আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইসলাম সত্য ধর্ম হওয়ার উপর রাজী হইয়াছি, কোরআন আমাদের ইমাম এবং আপনি নবী হওয়ার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি।" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ "তোমরা কি ফিরিয়া আসিবে? তোমরা কি ফিরিয়া আসিবে?" ইহা বলিতে বলিতে তিনি মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল-

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ.

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা মুমিনগণকে ইহার উপর ছাড়িয়া দিতে পারে না, যাহার উপর তোমরা এখন অবস্থান করিতেছ। যতক্ষণ পর্যন্ত সৎ ও পবিত্রকে অসৎ ও অপবিত্র হইতে পৃথক না করেন। আর আল্লাহ্‌তায়ালা তোমরা সাধারণ মানুষকে গায়েবী ইলম দান করিবে, তাহাও হইতে পারেনা। হাঁ, আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসুলগণ হইতে যাঁহাকে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে গায়েবী ইলম দান করার জন্য বাছিয়া লইবেন।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইল যে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে কেয়ামত পর্যন্ত সকল কিছুর ইলম ও জ্ঞান দান করা হইয়াছে। তাঁহার 'গায়েবী ইলম' সম্পর্কে সমালোচনা করা মুনাফিকগণের একটি তরীকা।



হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-এক গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে হাজির হইয়া আরজ করিতে লাগিলঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এমন কাজের হেদায়েত করুণ, যাহা আমি করিলে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিব।" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উত্তরে বলিলেনঃ "আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিওনা, রীতিমত নামাজ পড়িও, ফরজ জাকাত প্রদান করিও, রমজানের রোজা রাখিও।" সেই লোকটি বলিলঃ "ঐ খোদারই শপথ, যাহার অধিকারে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি ইহা হইতে কিছু বাড়াইব না এবং কিছু কমাইবও না।" যখন ঐ লোকটি চলিয়া যাইতেছিল, তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইলেনঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا.

"যদি কোন বেহেশ্‌তী লোককে দেখিবার জন্য কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই লোকটিকে দেখিয়া লইবে।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

এই হাদীসটির মধ্যে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) প্রশ্নকারী লোকটিকে জান্নাতী বলিয়া নিশ্চিত ফয়সালা দান করিলেন এবং হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট কে জান্নাতী আর কে দোজখী, উহা জানা আছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলিয়া দিলেন যে, এই প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি জান্নাতবাসী লোকদের মধ্য হইতে একটি লোক। সে ঈমান লইয়াই মৃত্যুবরণ করিবে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। সুতরাং হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নিশ্চিতভাবে বলিয়া দিলেন যে এই লোকটি জান্নাতী।

জান্নাতী লোকদিগকে দেখা একটি সওয়াবের কাজ এবং বুজুর্গ লোকের দর্শনের দ্বারা গুনাহ মাফ হইয়া থাকে। উল্লেখিত হাদীসের প্রশ্নকারীর মত অন্য এক ব্যক্তিও হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে-

হযরত তাল্‌হা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ নাজ্‌দ প্রদেশের এক ব্যক্তি উস্কু-খুস্কু চুলে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হইল। তাহার ঘ্যানঘ্যানানী আমরা শুনিতেছিলাম, কিন্তু সে কি বলিতেছে তাহা

বুঝিতেছিনা। এমন কি সেই ব্যক্তি হুজুরের নিকটবর্তী হইয়া ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ "রাত্র-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে হইবে।" সেই ব্যক্তি বলিল "হুজুর! ইহা ছাড়া অন্য কোন নামাজ আমার দায়িত্বে আছে?" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ "নাই। হাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে নফল নামাজ পড়িতে পার।" হুজুর বলিলেনঃ "রমজানের রোজা তোমার উপর ফরজ।" সে বলিলঃ "হুজুর! ইহা ছাড়া অন্য কোন রোজা আমার দায়িত্বে আছে?" হুজুর বলিলেনঃ "নাই। হাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তুমি নফল রোজা রাখিতে পার।" ইহার পর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার জাকাতের কথা উল্লেখ করিলেন। সে বলিলঃ "ইহা ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু কর্তব্য আছে?" হুজুর উত্তর দিলেন, "নাই। কিন্তু তুমি নফল ছদকা-খয়রাত করিতে পার।" বর্ণনাকারী তাল্‌হা (রাঃ) বলিলেন, ইহার পর সেই নাজ্‌দী লোকটি ইহা বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছিল, "আমি ইহার অতিরিক্তও করিবনা এবং কমও করিবনা।" তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ। যদি এই ব্যক্তি তাহার কথায় সত্যবাদী হয় তবে সে সফল হইয়াছে। (মিশ্‌কাত)

এই হাদীসে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, তবে সে সফল হইবে। ইহার পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের প্রশ্নকারীও বলিয়াছিল যে, আমি ইহাতে কম-বেশী করিবনা। তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাহার সম্পর্কে নিশ্চিত হুকুম দিয়াছিলেন যে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। কিন্তু এই নাজ্‌দবাসী লোকের কথায় হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সন্দেহযুক্ত পদ্ধতিতে সফলতার বর্ণনা দিয়াছেন অর্থাৎ সে যদি তাহার ওয়াদায় সত্যবাদী হয় তবে সে কামিয়াব ও সফল হইবে।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, নাজ্‌দবাসী লোকের এবং নাজ্‌দী বংশের মানুষের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।



## মিম্বর ও রওজা শরীফের মধ্যবর্তী জায়গাটির পরিচিতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ (متفق عليه).

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন- "আমার ঘর এবং আমার মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশ্‌তের বাগান সমূহ হইতে একটি বাগান এবং আমার মিম্বর আমার হাউজের উপর অবস্থিত।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মিম্বর এবং রওজা শরীফ উভয়ই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। এখন হাদীসের মর্মার্থ এই যে, মিম্বর ও রওজা শরীফের মধ্যবর্তী জায়গাটি প্রথমে বেহেশ্‌তের বাগান ছিল, উহা বেহেশ্‌ত হইতে এইখানে আনা হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে 'হাজরে আস্‌ওয়াদ' বা 'কাল পাথর' দান করিয়াছেন। আর আল্লাহ্‌র হা'বিব জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্য বেহেশ্‌তের বাগান পাঠাইয়াছে।

অথবা হাদীসের অর্থ এই যে, হুজুরের মিম্বর এবং রওজা শরীফের মধ্যবর্তী জায়গাটি হু-বহু পরকালে বেহেশতের একটি বাগানে পরিণত হইবে। অথবা যে ব্যক্তি এই রওজা এবং মিম্বর শরীফের মাঝখানে আসিয়াছে, সে যেন বেহেশ্‌তের একটি বাগানে প্রবেশ করিয়াছে অর্থাৎ আগামীতে সে ইহার বরকতে নিশ্চয় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। অথবা এই জায়গাটি বেহেশ্‌তের বাগানের মোকাবিলায় অন্য একটি বাগান।

স্মরণীয় যে, তিনটি জায়গা বেহেশ্‌ত হইতে এইখানে পাঠানো হইয়াছে- কা'বা শরীফের 'কালো পাথর' ও 'রুক্‌নে ইয়ামানী' এবং মদীনা শরীফে হুজুরের রওজা শরীফের এই জায়গাটি।

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বাণী وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ এর অর্থ এই যে, আমার মিম্বরের এই জায়গাটি প্রথমে আমার 'হাউজ কাওছার' এর

উপর ছিল, সেইখান হইতে এইখানে আনা হইয়াছে। অথবা, আগামীতে হাওজ-কাউছারের বিপরীত দিকেই আছে। অথবা যে ব্যক্তির ভাগ্যে এই মিম্বরের চুমা দেওয়ার সুযোগ হইয়াছে, সে যেন আমার হাওজ-কাউছারের নিকট পৌঁছিয়া গেল।

## মদীনা শরীফের মাটি প্রত্যেক রোগের জন্য শেফ ও হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সাথে সম্পৃক্ত বস্তু তাবারুক বিশেষ

মদীনা শরীফের মাটি প্রত্যেক রোগের মহৌষধ। হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন غُبَارُ الْمَدِيْنَةِ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ মদীনার মাটি প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা বা আরোগ্যদান কারী বস্তু।

মসজিদে নববী বা মদিনার মসজিদে এক রাকাত নামাজ পড়িলে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজের সওয়াব হয়। মদিনা শরীফে একটি পূণ্য কাজ করিলে পঞ্চাশ হাজার পূণ্য কাজের সওয়াব হয়। এবং সেইখানে একটি পাপের কাজ করিলে একটি গুনাহ্ হয়। সেই গুনাহে কোন বৃদ্ধি হয়না। ইহা জনাবে মুস্তফা হযরত শফিউল মুজনেবীন, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের অছিলায় হইয়া থাকে।

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কবর শরীফ কা'বা বাইতুল্লাহ, আরশ-কুরশী তথা আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্টি জগৎ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। মক্কা শরীফ হইতে মদিনা শরীফ শ্রেষ্ঠ। যেমন নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন- اَلْمَدِيْنَةُ اَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ মক্কা হইতে মদিনা শ্রেষ্ঠ।

মদিনা শরীফের ফজিলত ও মান-মর্যাদা সম্পর্কে অনেক মুহাদ্দিস বিভিন্ন কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন 'ওয়াফাউল-ওয়াফা', 'জাজবুল-কুলুব' ইত্যাদি। এইখানে উহার বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

عَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَاَخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِاَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا



فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُوْرِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهٗ لَنَا فِىْ اِدَاوَةٍ وَاَمَرَنَا فَقَالَ اُخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بَيْعَتَكُمْ وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا قُلْنَا اِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَالْحَرَّ شَدِيْدٌ وَالْمَاءُ يَنْشِفُ فَقَالَ مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ فَاِنَّهٗ لَايَزِيْدُهٗ اِلَّا طِيْبًا.

(رواه النسائى)

অনুবাদঃ- হযরত তলক বিন আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- "আমরা ইসলাম গ্রহণ এবং ইসলামের হুকুম-আহকাম শ্রবণের জন্য আমাদের জাতির পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হইলাম, অতঃপর আমরা তাঁহার হাতে ইসলামের শপথ গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইলাম এবং তাঁহার সাথে নামাজ পড়িলাম এবং তাঁহার কাছে আমরা বর্ণনা করিলাম যে, আমাদের দেশে আমাদের গীর্জা আছে। তারপর আমরা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কাছে তাঁহার অজুর অবশিষ্ট পানিটুকু চাহিলাম, তিনি পানি আনিবার জন্য নির্দেশ দিলেন, পানি আনিবার পর তিনি অজু করিলেন এবং কুলি করিলেন। তারপর তিনি অবশিষ্ট এই পানিটুকু একটি পাত্রে ভর্তি করিয়া আমাদিগকে নির্দেশ দানে বলিলেনঃ "তোমরা এখন তোমাদের দেশে চলিয়া যাও এবং তোমাদের দেশে পৌঁছিয়া তোমাদের গীর্জাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিও এবং ঐ গীর্জার স্থানে এই পানিটুকু ছিটাইয়া দিও আর ঐখানে মসজিদ নির্মাণ করিও।" আমরা বলিলাম- "হুজুর! আমাদের শহরতো দুরে অবস্থিত, গরমও অধিক এবং পানিও শুকাইয়া যায়।" তিনি বলিলেনঃ "এই পানি কমিয়া গেলে তাহার মধ্যে অন্য পানি মিশাইয়া উহা বৃদ্ধি করিতে থাক, তখন উহার বরকতও বৃদ্ধি পাইবে।" (নেসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত হাদীস হইতে অনেক অমূল্য রত্ন লাভ করা যায়।

প্রথমতঃ এই হাদীস হইতে বুঝা গেল, যে জিনিস হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পবিত্র শরীরের সহিত স্পর্শ হয়, তখন উহা তাবারুক হিসাবে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং মদিনা শরীফের মাটি তাবারুক ও আরোগ্য দানকারী ঔষধ।

দ্বিতীয়তঃ হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পরিত্যক্ত ও ব্যবহৃত পানি আন্তরিক অপবিত্রতাকে দুর করিয়া দেয়।

তৃতীয়তঃ যে মসজিদে হুজুরের তাবারুক রহিয়াছে সেই মসজিদগুলি অন্যান্য মসজিদ হইতে অধিক সম্মানিত এবং অতি উত্তম। যেমন দিল্লীর জামে মসজিদ, লাহোর শাহী মসজিদ ইত্যাদির মধ্যে বরকতের জন্য নবী করিম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পবিত্র চুল ও জোব্বা শরীফ রাখা হইয়াছে, ইহার যৌক্তিকতা উল্লেখিত হাদীস হইতে সংগৃহীত।

চতুর্থতঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দা, ওলী বুজুর্গানদের তাবারুক অন্যান্য শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে পাঠানো এবং লইয়া যাওয়া রাসুল এবং সাহাবাগণের সুন্নাত। অনেক লোক ওরশের তাবারুক দূর দূরান্তে পাঠাইয়া থাকে। উক্ত হাদীসই তাহাদের এই কাজের মুল ভিত্তি।

হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মক্কার গভর্ণর হইতে যমযম কূপের পানি মদিনায় আমদানী করিতেন। বর্তমানকালেও যমযম কূপের পানি দেশে-বিদেশে পৌঁছিতেছে।

পঞ্চমতঃ তাবারুকের সহিত অন্য যে জিনিষ যুক্ত হয় উহাও তাবারুকে পরিণত হইয়া যায়। বর্তমানেও যমযম কূপের পানির সহিত অন্য পানি মিশাইয়া পান করা হয়।

ষষ্ঠতঃ মুসলমানেরা হিন্দু ও কাফেরগণের মন্দির ও উপসনালয় ভাঙ্গিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন হিন্দু বা কাফের মুসলমান হইয়া তাহাদের উপসনালয় তাহারা নিজে ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করে, তবে উহা জায়েজ আছে।

বিগত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে অনেক মুসলমান তাহাদের নিজস্ব উদ্যম ও প্রবলতায় হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গিয়া ইবাদতখানা, মসজিদ ইত্যাদি তৈরী করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের উচিত, যেন এই হাদীস হইতে তাহারা উপদেশ অর্জন করে। কেননা, ইসলাম কখনও এইরূপ শিক্ষা প্রদান করে নাই।



সপ্তমতঃ হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পরিত্যক্ত ও ব্যবহৃত পানি এবং কুলির পানি বাহ্যিক ও আন্তরিক অপবিত্রতাকে দুর করে।

অষ্টমতঃ হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর তাবারুকগুলি গুপ্ত ধনভাণ্ডার বিশেষ।

নবমতঃ হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ব্যবহৃত পানির বরকতে কুফরীর ময়লা-দুর্গন্ধ ইত্যাদি চলিয়া যায় এবং হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর তাবারুকের অছিলায় নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত বেশী কবুল হইয়া থাকে। যেই মসজিদে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর তাবারুক আছে, সেই মসজিদ অন্যান্য মসজিদ হইতে অতি উত্তম ও অত্যন্ত সম্মানিত।

## বাইয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জামানায় বাইয়াত শুধু ইসলামের জন্য ছিল। আর বর্তমানের বাইয়াত গুনাহ হইতে বিরত থাকার তাওবা বিশেষ।

একজন পীর-বুজুর্গের মাধ্যমে নিজের খোদার কাছে কিছু অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার নামই হইল 'বাইয়াত।' খুবই পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান কালে পীর-মুরিদী একটি চাকচিক্যময় লোকাচারে পরিণত হইয়াছে এবং বর্তমানকালের অনেক পীরের মুরিদগণ পীর সাহেবের জন্য 'মুরাদ' বা বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে। অধিকন্তু বাইয়াত ও মুরিদকে জীবিকার্জনের একটি পন্থা হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে। অনেক পীর সাহেব সর্বদাই মানুষকে নিজের মুরীদ বানানোর জন্য পাগল প্রায় হইয়া বসিয়াছে। ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবি লোকেরা যেমন তাহার ব্যবসা ও চাকুরীর কাজে মহাব্যস্ত থাকে, তদ্রূপ অধুনা মুসলিম সমাজের অনেক পীর সাহেবও পীর মুরিদীর ব্যবসা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমান সমাজকে তাহাদের এই পাপ কাজ হইতে হেফাজত করুন। আমিন।

## কোরআন শরীফ সাত প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছে

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْد رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ لِكُلِّ اٰيَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ. (رواه فى شرح السنة)

অনুবাদঃ- আবদুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন- "কোরআন শরীফ সাতটি তরীকা বা নিয়মে অবতীর্ণ হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রত্যেক আয়াতের জাহেরী বা প্রকাশ্য অর্থও রহিয়াছে এবং বাতেনী বা অপ্রকাশ্য অর্থও রহিয়াছে। অধিকন্তু প্রত্যেক জাহের ও বাতেনের একটি সীমারেখাও নির্ধারিত আছে। সেই সীমারেখা হইতে জ্ঞান লাভ করা হইয়া থাকে।" (শারহে ছুন্নাহ)

ব্যাখ্যাঃ- কুরআনের সাতটি তরীকা বলিতে বুঝায় আরবের সাতটি ভাষা। অথবা কুরআনের সাত প্রকার কেরাত বা পাঠ রীতি, অথবা কুরআনের সাতপ্রকার অর্থ। যথা-আদেশ, নিষেধ, উদাহরণ, কিস্সা-কাহিনী, সৎকাজের জন্য ভাল প্রতিদানের অঙ্গীকার, অসৎ কাজের জন্য ভয় প্রদর্শন এবং উপদেশাবলী। অথবা কুরআনের সাতটি তরীকা বলিতে সাতটি বস্তুকে বুঝায়। যেমন- আকায়েদ (বিশ্বাস সমুদয়), আহ্কাম (আদেশ ও নিষেধ সমুদয়), আখলাক (চরিত্রাবলী), হারাম, হালাল, (যাহার অর্থ আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল ব্যতীত অন্য কাহারও জানা নাই)।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, কুরআন শরীফের প্রত্যেক আয়াতের প্রকাশ্য মর্মার্থ আছে এবং অপ্রকাশ্য মর্মার্থও আছে। প্রকাশ্য মর্মার্থ বলিতে কুরআনের আয়াতের শাব্দিক অর্থকে বুঝায়। আর অপ্রকাশ্য মর্মার্থ বলিতে আয়াতের উদ্দেশ্য ও রহস্যকে বুঝায়। অথবা জাহের বলিতে শরীয়ত এবং বাতেন বলিতে তরীকতকে বুঝায়। অথবা আয়াতের জাহের হইল শরীয়তের আহ্কাম এবং বাতেন হইল সেই আহ্কামের রহস্যাবলী। অথবা জাহের উহাকে বলে, যাহার সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম অবগত আছেন এবং বাতেন উহাকে বলে, যাহার সম্পর্কে আউলিয়ায়ে কেরাম অবগত আছেন। অথবা জাহের উহাকে বলে, যাহা কুরআনের আয়াত এবং রাসুলের হাদীসের মাধ্যমে



জানিতে পারা যায় এবং বাতেন উহাকে বলে, যাহা 'কাশ্ফ' এর মাধ্যমে জানা যায়।

কুরআন শরীফের জাহের ও বাতেন জানিবার জন্য পৃথক পৃথক স্তর রহিয়াছে। যেমন- কুরআনের জাহের ওলামায়ে কেরাম এবং উহার বাতেন আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে জানা যায়। অথবা জাহের 'ক্বাল' বা বর্ণনার দ্বারা এবং বাতেন 'হাল' বা অবস্থার দ্বারা জানিতে পারা যায়। অথবা, জাহের জ্ঞান ও বিবেকের দ্বারা এবং বাতেন ফানা ও মশ্গুলতার দ্বারাই বুঝা যায়। অথবা জাহের ধর্মীয় কিতাব সমূহের দ্বারা এবং বাতেন আল্লাহর কোন প্রিয় কামেল বান্দার শুভ দৃষ্টির দ্বারা জানিতে পারা যায়।

আল্লামা শেখ সা'দী (রাঃ) এই সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন-

صد کتاب وصد ورق در نار کن

روئے دل را جانب دلدار کن

"কুরআনের আয়াতের বাতেন বা রহস্যাবলী জানিতে চাহিলে প্রথমে তুমি তোমার শত শত কিতাব, বই-পুস্তক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি আগুণে নিক্ষেপ কর। তারপর তোমার অন্তরকে নিজের প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র দিকে ঝুকাইয়া দাও।"

মোট কথা এই যে, কুরআন শরীফের শব্দগুলি মিঞাজীর নিকট হইতে অর্জন করা যায়। 'তাজবীদ' বা কুরআনকে শুদ্ধ রূপে পাঠ করিবার শিক্ষা ক্বারী সাহেব হইতে, কুরআনের অর্থ আলেম সম্প্রদায়ের নিকট হইতে, কুরআনের আহ্কাম মুজ্তাহিদ বা মুসলিম আইন শাস্ত্রবিদগণের নিকট হইতে অর্জন করা যায়। কিন্তু কুরআনের রহস্যাবলী জানিতে হইলে আউলিয়ায়ে কেরাম ও সূফী বা আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষগণের দ্বারস্থ হইতে হয়। তাহাদের নিকট হইতেই কুরআনের রহস্যাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করার জন্য পৃথক পৃথক সীমারেখা টানা হইয়াছে।

স্মরণীয় যে, সূফী ও মশায়েখ ঐ ব্যক্তিগণকে বলা হয়, যাহারা শরীয়ত ও তরীকতের একক কেন্দ্র। যাঁহারা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)

এর প্রেমিক এবং নবুওয়াতের সূর্যের সম্মুখে নিজের প্রাণ উৎসর্গকারী। তাঁহারা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ধর্মের সত্যিকার প্রচারক। যে মূর্খ-অশিক্ষিত সূফী বেশধারী উত্তরাধিকার সূত্রে ওলী সাজিয়া বসিয়াছে। তাহারা ফাসেক ও অসৎ প্রকৃতির লোক। বস্তুতঃ তাহারা মানুষের পীর হইতে পারেনা এবং কোন ওলীও হইতে পারেনা।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার প্রিয় হা'বীব জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে কুরআন শরীফের সকল রহস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান দান করিয়াছেন। আর প্রত্যেক হরফের জ্ঞান তাহা জাহেরী হউক বা বাতেনী, হাজের নাজের হউক বা গায়েব, সমস্ত জ্ঞান তাঁহাকে দান করিয়াছেন। তারপর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ঐ জ্ঞান হইতে সাহাবাগণ, আশেককুল এবং তাঁহার প্রেমিকগণকে দান করিয়াছেন। যথা-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ-

ضَمَّنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ.
(بخارى)

"হযরত রসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাকে তাঁহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্! তাহাকে তোমার কুরআন মজিদের জ্ঞান দান কর।" (বুখারী)

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উক্ত দোয়ার বদৌলতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআন তফসীর কারকগণের নেতা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন-আমি নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে বলিতে শুনিয়াছি

بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمُ (بخارى)

"আমি স্বপ্নে বিভোর ছিলাম, এই সময় আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেওয়া হইয়াছে, অতঃপর আমি সন্তুষ্ট ভাবে পান করিলাম, তারপর আমার অবশিষ্ট



দুধটুকু ওমর ইবনে খাত্তাব কে দিয়া দিলাম। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরজ করিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঐ স্বপ্নের কি তা'বীর (বিশ্লেষণ) করেন? তিনি উত্তরে বলিলেনঃ 'ইল্ম' বা জ্ঞান।"

উক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে এতটুকু ইল্ম বা জ্ঞান দান করা হইয়াছে যে, তিনি তদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) কে দেওয়া হইয়াছে, এই কারণে ফারুকে আযম (রাঃ) হইতে অনেক কাশ্ফ ও কেরামত প্রকাশ পাইয়াছে, বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জাহেরী ও বাতেনী ইল্ম বা জ্ঞানাবলীর অনুমান করা মানবের পক্ষে দুস্কর।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর খেদমতে আরজ করিলাম-

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاهُ قَالَ اُبْسُطْ رِدَاءَكَ
فَبَسَطْتُهٗ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ فَضَمَمْتُ فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدُ.
(بخارى ومسلم)

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট হইতে অনেক হাদীস শুনিতে পাই, কিন্তু তাহা ভুলিয়া যাই।" তিনি বলিলেন, তোমার চাদরখানা বিছাইয়া দাও। আমি আমার চাদরখানা বিছাইয়া দিলাম, তিনি তাহার পবিত্র হাত দুইখানি সেই চাদরে রাখিয়া দিলেন, তারপর আমাকে বলিলেন, "ইহা তোমার বুকে জড়াইয়া রাখ।" তাঁহার নির্দেশ মোতাবেক আমি উহা আমার বুকে জড়াইয়া রাখিলাম, ইহার পর হইতে আমি কখনও একটি বর্ণ এবং শব্দও ভুলি নাই।"

উক্ত হাদীস হইতে ইহাও বুঝা গেল যে, যাঁহার হাত দ্বারা অন্যের ভুল দূরীভূত হয়, তাঁহার পক্ষ হইতে কিভাবে ভুলের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? কখনও না। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কদাচিৎ কিছু ভুলেন নাই। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে যে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে, অন্য কোন সাহাবা হইতে ততগুলি হাদীস বর্ণিত হয়

নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে প্রায় তের হাজার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন-

حَفِظْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَائَيْنِ فَامَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيْكُمْ وَاَمَّا الْاٰخِرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ. (بخارى شريف)

"হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে আমি দুই পাত্র ইলম বা জ্ঞান লাভ করিয়াছি। একটি পাত্রের জ্ঞান আমি প্রকাশ করিয়াছি এবং অপর পাত্রের জ্ঞান যদি আমি প্রকাশ করি, তবে আমার গর্দান কাটা যাইবে।" (বুখারী) অর্থাৎ এই দ্বিতীয় পাত্রের জ্ঞান হইল ইল্‌মে গায়েব' যাহাকে কুরআনের বাতেনী ইল্‌ম বলা হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে কি কি ইলম দান করা হইয়াছে।

পাঠকবৃন্দ! দেখুন, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর চোখ দুইটি দুরবর্তী, নিকটবর্তী, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, কে কোথায়, কি করিতেছে, সবকিছু অবলোকন করিয়া থাকে। তাঁহার দৃষ্টি হইতে কোন কিছু লুকায়িত নাই। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগৎ তথা আরশ-কুরশী, লাওহ-কলম, বেহেশ্‌ত-দোজখ সবকিছু তাহার নখ-দর্পনে দেদীপ্যামান।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন-

رَأَيْتُ جَعْفَرَ يَطِيْرُ فِى الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ (ترمذى)

"হযরত জাফর ইবনে আবু তালিবকে আমি ফেরেশ্‌তাগণের সহিত বেহেশ্‌তে উড়িতে দেখিয়াছি।"

সুবহানাল্লাহ। জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দৃষ্টি হইতে কোন বস্তু লুকায়িত নহে।

টীকাঃ- আল্লাহ্‌র ইবাদত সমুহের মধ্যে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত অত্যন্ত উত্তম ইবাদত। যথা– হাদীসে আছে-



اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ.

"অতি উত্তম ইবাদত হইল কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা।" কুরআনের একটি হরফের জন্য দশটি ছাওয়াব তথা সাত হাজার ছাওয়াব লাভ করা যায়। সুতরাং সর্বদা কুরআন শরীফের তেলাওয়াতের মধ্যে মশগুল থাকা অত্যন্ত বড় সওয়াবের কাজ এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের একটি উত্তম পন্থা।

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর পাঁচটি নামের তাৎপর্য

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِىْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ.

অনুবাদঃ হযরত মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়াম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, "আমার পাঁচটি নাম আছে। (১) 'মুহাম্মদ' বা অতি প্রশংসিত (২) 'আহ্‌মদ বা অতি প্রশংসাকারী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে তিনিই খোদার অধিকতর প্রশংসাকারী (৩) 'মাহী' অর্থাৎ কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করিবে। (৪) হাশের বা সমস্ত মানবজাতির হাশর আমার পদতলেই হইবে। (৫) আক্কেব অর্থাৎ সমস্ত নবীর পরে আগমনকারী, তিনিই শেষ নবী, তাঁহার পরে অন্য কোন নবী আসিবে না।"

ব্যাখ্যাঃ- উল্লেখিত হাদীসে যে 'হাশের' শব্দটি বলা হইয়াছে, উহার অর্থ হইল মানব জাতিকে উত্তোলনকারী অর্থাৎ হাশরের দিবসে প্রথমে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার কবর শরীফ হইতে বাহির হইবেন, তারপর সকল মানুষ নিজ নিজ কবর হইতে বাহির হইয়া হুজুরের পিছনে পিছনে কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। সকল লোকই তাঁহার আশ্রয় ও সুপারিশ কামনা করিবে, এমনকি হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌ সহ হযরত আদম (আঃ) এবং সকল আদম সন্তান হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর 'লেওয়ায়ে-হাম্‌দ' বা প্রশংসার পতাকাতলে আশ্রয় নিবে। সকল লোকের

হাশর হুজুরের পুত-পবিত্র পদতলে হইবে। যেমন উক্ত হাদীস হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অথবা, সকল লোকই কেয়ামতের দিনে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর চারিদিকে একত্রিত হইবে। অথবা, সেই দিন সকল লোক তাঁহার ধর্মভূক্ত হইবে। অথবা, সেইদিন তাঁহার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সকলের হাশর হইবে।

ইমাম আবদুল জলিল কসরী (রাঃ) বলেনঃ "হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর এই পবিত্র নাম দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত ও কর্মগত মহান ফজিলত ও বুজুর্গী ছাবেত হয়।

'হাশর' শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া। কেয়ামতের দিনে বিভিন্ন জায়গা হইতে সকলেই হাশরের ময়দানে একত্রিত হইবে। 'হাশের' শব্দের অর্থ বিভিন্ন জায়গা হইতে নিজের নিকট সকলকে একত্রিতকারী। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক লোককে প্রত্যেক জায়গা হইতে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট একত্রিত করা হইবে এবং সকলেই তাঁহার ছায়া ও তাঁহারই আঁচল ধারণ করিবে। ইহাই হইল হুজুরের সার্বজনীন রাহ্মত ও সুপারিশ। আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব সুন্দর বলিয়াছেন–

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا

کہ انکی شان محبوبی دیکھائی جانے والی ہے

"হাশরের ময়দানে সকলকে একত্রিত করিবার একমাত্র কারণ হইল-সেইদিন আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুব জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শান-মান ও মর্যাদা সকলের সম্মুখে যেন প্রকাশিত ও পরিদৃষ্ট হয়।

উল্লেখিত হাদীসে যে 'মাহী' শব্দ বলা হইয়াছে, উহার অর্থ বিলীনকারী, শির্‌ক ও কুফরী নিশ্চিহ্নকারী। তাঁহার মাধ্যমে যতটুকু কুফরী ও শির্‌ক বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, অন্য কোন নবীর মাধ্যমে ততটুকু হয় নাই। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) যে সময়ে পৃথিবীতে তশরীফ আনিয়াছিলেন, তখন পৃথিবী পৃষ্ঠে সকলই কাফের ও মুশরিক ছিল। অতঃপর তাঁহারই আগমনে কুফরী ও শির্‌ক বিলুপ্ত হইয়াছে। অথবা, তাঁহার মাধ্যমে উম্মতে ইজাবাত বা



মুসলমানগণের পাপরাশী বিলীন করা হইবে। তাই তাঁহার একটি নাম 'মাহী'। হুজুরের অপর এক নাম 'মুহ্‌য়ী' বা জীবিতকারী। যেমন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার পিতা-মাতা ও চাচা আবু তালিবকে খোদার হুকুমে জীবিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা হুজুরের উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। আর তিনি হযরত জাবের (রাঃ) এর পুত্রকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং ঐ ছেলেটি হুজুরের রিসালত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করিয়াছিল।

হযরত জাবেরের জবেহকৃত ছাগল খানা পাকানোর পরে উহার হাঁড়গুলি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নিজের হাতে একত্রিত করিয়া উহাকে জীবিত করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ছাগলটির সহিত কথা-বার্তাও বলিয়াছিলেন! হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আরও অনেক লোকের ছেলেকে জীবিত করিয়াছিলেন এইরূপ আরও অনেক মো'জেজা রহিয়াছে, তাই তাঁহার নাম হয় 'মুহ্‌য়ী।' অথবা, হুজুরের মাধ্যমে ঈমানদারগনের অন্তর জীবন লাভ করিয়াছিল, তাই তাঁহাকে 'মুহ্‌য়ী' বলা হয়। অথবা, হুজুরের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব জগৎ জীবন লাভ করিয়াছিল, সুতরাং হুজুর বিশ্ব জগতের রূহ। এই বিশ্বের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব হুজুরের মাধ্যমেই রহিয়াছে। তাই হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মুহ্‌য়ী বা জীবনদানকারী। ইহার আরও অনেক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির কারণে এইখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর আর একটি নাম হইল 'আক্বেব' বা সকলের পরে আগমনকারী। তাঁহার পরে অন্য কোন নবী আসিবেনা। স্বয়ং সম্পূর্ণ (ذاتی) নবী হউক বা অন্য নবীর অনুসারী হউক। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পরে কোন প্রকার নবী হইবেনা। এই পবিত্র নাম দ্বারা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরাট প্রতিরোধ করা হইয়াছে।

স্মরণীয় যে, যখন হযরত ঈসা (আঃ) শেষ জামানায় আগমন করিবেন, তখন তিনি শরীয়তে মুহাম্মদী মতে কাজ করিবেন এবং বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নবুওয়াতের সামনে মাথা নত করিয়া ইসলামের হুকুম-আহকাম জারী করিবেন। অথবা, 'আক্বেব' অর্থ নবী করীম

(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আল্লাহতায়ালার প্রভুত্বের পরে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। জনৈক কবি সুন্দর বলিয়াছেন–

بعد از خذا بزرگ توئی قصه مختصر

(বাদে আজ খোদা বুজুর্গ তুয়ী কিচ্ছা মুখ্‌তাছার) অথবা, হুজুরের এই পবিত্র নাম জাহান্নামে কার্যকরী হইবে। যখন এই নামের অছিলায় সুপারিশ করা হইবে, তখন জাহান্নামের আগুন ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। যেমন হাদীসে আছে কুরআন ধারণকারী একটি জাতি জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। আল্লাহতায়ালা হুজুরের নাম তাহাদের নিকট হইতে ভুলাইয়া ফেলিবেন। অতঃপর হযরত জিব্রাইল (আঃ) হুজুরের নাম তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। তারপর তাহারা এই নাম স্মরণ করিতে থাকিবে, যদ্বারা জাহান্নামের আগুন ঠান্ডা হইয়া যাইবে।

'আক্বেব' শব্দের অনেক ব্যাখ্যা রহিয়াছে, আমি এইখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি।

## ইয়া রাসূলাল্লাহ্ না বলে ইয়া মুহাম্মদু বলা বেয়াদবী

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ اَحْبَارِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ قَدْفَعُنِىْ فَقُلْتُ اَلَا تَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ اِنَّمَا نَدْعُوْهُ بِاِسْمِهِ الَّذِىْ سَمَّاهُ بِهٖ اَهْلُهٗ. (مسلم)

অনুবাদঃ হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর আযাদকৃত গোলাম হযরত ছাওবান (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

"আমি রাসুল খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম,



এমতাবস্থায় ইহুদী আলেমগণের মধ্যে একজন আলেম হুজুরের দরবারে আসিয়া বলিলঃ আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া মুহাম্মদু" (অর্থাৎ-"হে মুহাম্মদ! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।") তখন আমি তাহাকে এমন একটি ধাক্কা দিলাম যে, সে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। সেই ইহুদী আলেম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ "তুমি কেন আমাকে ধাক্কা দিতেছ?" আমি বলিলাম, "(তুমি হুজুরের নাম লইতেছ এবং) কেন তুমি ইয়া রাসুলাল্লাহ বলিতেছনা??" সে বলিল, "আমরা তাঁহাকে ঐ নামেই ডাকিয়া থাকি, যেই নাম তাঁহার ঘরের লোকেরা রাখিয়াছিল।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ- শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা সরদার আহমদ ছাহেব মুহাদ্দেছে আযম (রঃ) উক্ত হাদীসের টীকায় লিখিয়াছেনঃ "এই হাদীস হইতে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি 'ইয়া মুহাম্মদু' বলিবে এবং 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলিবেনা, তাহাকে ধাক্কা দেওয়া এবং তাড়াইয়া দেওয়া সাহাবায়ে কেরামের ছুন্নাত।"

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ঘরের লোক-জনেরা হুজুরের যে 'মুহাম্মদ' নাম রাখিয়াছেন, উহা হুজুরের ব্যক্তিগত আসল নাম। হুজুরকে ঐ নামে সম্বোধন করা বড় বে-আদবী। হাঁ, ইসলামের প্রথম যুগে হুজুরের আসল নামে কখনও সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই যুগে কোন কোন সাহাবা ও আনসারদের কোন কোন ছেলে হুজুরকে উক্ত নামে ডাকিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে উহা নিষেধ করা হইয়াছে।

কোন কোন সূফী, দরবেশ ও আধ্যাত্মিক লোকেরা 'ইয়া মুহাম্মদু' (اسم ذات) নাম সহকারে জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে দরুদ ও সালাম পেশ করিয়া থাকেন। উহা তাহাদের খাস ও বিশিষ্ট রীতি।

মুহাদ্দেছীন ও মুফাচ্ছেরীনে কেরাম 'ইয়া মুহাম্মদু' নাম সহকারে হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে সম্বোধন করা নিষেধ করিয়াছেন। আর সূফী, দরবেশ ও আধ্যাত্মিক মহাত্মাগণের যে খাস ও বিশিষ্ট রীতি পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের হুকুম আলাদা! কারণ, হয়তো 'ইয়া মুহাম্মদু' নামের ওজিফা দ্বারা তাঁহারা আলাদা স্বাদ ও রুহানী মজা উপলব্ধি করার অবকাশও থাকিতে পারে।

## রাসুল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শাফায়াতের বর্ণনা

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنْ تَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ وَاَهْلِ الْعَظَائِمِ وَاَهْلِ الدِّمَاءِ. (مسند امام اعظم)

**অনুবাদঃ-** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-"আমরা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিয়ামতের দিনে আপনি কোন্ লোকের সুপারিশ করিবেন? তিনি উত্তরে বলিলেনঃ যাহারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হইয়াছে, যাহারা মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা অন্যায়ভাবে খুন করিয়াছে, তাহাদের জন্য আমি সুপারিশ করিব।" (মাস্নাদে ইমাম আজম)

**ব্যাখ্যাঃ-** কেয়ামতের দিনে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সুপারিশ করিবেন। তাহারা দোজখে যাইবার পূর্বে হউক বা দোজখের কিছু শাস্তি ভোগ করিবার পর হউক।

উক্ত হাদীসে যে (عظائم) 'আজায়েম' শব্দটি রহিয়াছে, যেহেতু উহা এক সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত অর্থ বহন করে, সুতরাং উহাতে কয়েকটি অর্থের অবকাশ রহিয়াছে। প্রথমতঃ এই শব্দটি হাদীসে উল্লেখিত 'কবায়ের' শব্দটির ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হইয়াছে। উভয় শব্দের কোন ভিন্ন অর্থ নহে। দ্বিতীয়তঃ 'কবায়ের' শব্দের অর্থ আল্লাহ্র হক সমূহ এবং 'আজায়েম' শব্দের অর্থ বান্দার হক সমূহ। তৃতীয়তঃ ইহা খাস্ বা বিশিষ্ট অর্থের পরে সাধারণ অর্থ হিসাবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 'কবায়ের' অর্থ সাধারণ কবীরা গুনাহ এবং 'আজায়েম' অর্থ ঐ কবীরা গুনাহ সমূহ, যাহার মধ্যে অত্যন্ত বেহায়াপনা রহিয়াছে। যেমন-নামাজ পরিত্যাগ করা, জেনা বা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া। চতুর্থতঃ ইহা সাধারণ অর্থের পরে বিশিষ্ট অর্থ হিসাবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 'কবায়ের' বলিতে কবীরা গুনাহকে বুঝানো হইয়াছে এবং 'আজায়েম' বলিতে প্রত্যেক গুনাহকে বুঝানো হইয়াছে, উহা ছগীরা গুনাহ হউক বা কবীরা গুনাহ হউক। কেননা, আল্লাহ্র নৈকট্যলাভকারী বান্দাগণের নিকট ছগীরা



গুনাহও কবীরা গুনাহে গন্য হইয়া তাকে। তাঁহারা আল্লাহর আদেশের বিপরীত এক বিন্দু পরিমাণও হঠকারিতাকে নিজের জন্য কেয়ামত তুল্য মনে করেন। যেমন, আল্লাহপাক বলিয়াছেন–

وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ "উহা আল্লাহর নিকট মহাপাপ।"

উল্লেখিত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মু'মিন এবং সুপারিশ পাওয়ার উপযোগী। কেননা, কাফেরদের সম্পর্কে সুপারিশ কুরআনেও ছাবেত নাই এবং হাদীসেও নাই। কাফেরগণকে সুপারিশ করার ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে রহিত করা হইয়াছে। হুজুরের শাফায়াত সম্পর্কে যতগুলি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, ঐগুলি 'হাদীসে মুতাওয়াতের' বা অগণিত বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত হাদীসের কাছাকাছি। যেমন–

شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ

অর্থাৎ "আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য আমার শাফায়াত থাকিবে।" এই হাদীসটি মুতাওয়াতের। ইহা ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত যাবের (রাঃ) হইতে এবং তাবরাণী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এবং খতিব (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর যাহারা হুজুরের সুপারিশকে অস্বীকার করে, তাহারা পথভ্রষ্ট।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-আল্লাহতায়ালা দোজখের মধ্যে গুনাহগার মুসলমান ও মুশরিকগণকে একত্রিত করিবেন, তখন মুশরিকগণ বলিবেঃ "হে মুসলমানগণ! তোমরা যাহার ইবাদত করিয়াছিলে অথবা যাহার উপর ঈমান আনিয়াছিলে, তিনি তোমাদের কোন উপকার করিলেন না। এই কথা শুনিয়া আল্লাহতায়ালা রাগান্বিত হইয়া উঠিবেন এবং ঐ গুনাহগার মুসলমানগণকে নিজের করুনায় দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন।

ইমাম জালালুদ্দিন ছাইয়ুতী (রঃ) তাঁহার রচিত 'আল্ কান্‌জুল মাদফুন' নামক

কিতাবে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শাফায়াতকে আটভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-(১) 'শাফায়াতে উজ্মা' যাহা সমস্ত নবী ও রাসুলের মধ্য হইতে শুধু নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্যই খাস। এই শাফায়াত তখনই হইবে, যখন সমস্ত সৃষ্টি জগতের মোকাদ্দমা ফয়সালা হইতে থাকিবে। (২) ঐ শাফায়াত; যাহা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার হিসাব তাড়াতাড়ি গ্রহণের জন্য আল্লাহর দরবারে করা হইবে। (৩) যেই মানুষকে দোজখে নিক্ষেপ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইবে, সেই প্রকার মানুষের জন্য সুপারিশ করা হইবে, তাহারা হুজুরের সুপারিশে দোজখের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে।

হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের একদল লোককে দোজখে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দেওয়া হইবে, তখন তাহারা বলিতে থাকিবে, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।" আমি ফেরেশতাগণকে বলিবঃ তাহাদিগকে একটু ধরিয়া রাখ, তারপর আমি চলিয়া যাইব এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির জন্য দরখাস্ত করিব, তখন সিজদা করিবার জন্য আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। পরিশেষে আমাকে বলা হইবে, "প্রিয়তম! যাও তুমি এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া লও।" (৪) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার চাচা আবু তালিব সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন, যদ্বারা তাঁহার আজাব দূরিভূত হইবে। খাজা আবু তালিবের নাজাত সম্পর্কে অধীনের লিখিত 'আল্-বায়ানুন্ নাজীহ ফি নিজাতে আম্নিন্নবী' পুস্তিকায় বিস্তারিত প্রমাণসহ বর্ণনা করা হইয়াছে, আগ্রহী পাঠকবর্গ উহা দেখিতে পারেন। (৫) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান লোকের জন্য সুপারিশ করিবেন, উহা দ্বারা তাঁহারা হিসাব-নিকাশ ব্যতীত জান্নাতে চলিয়া যাইবেন। (৬) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ঐ ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশ করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন, যাহাদের জান্নাতের হুকুম মিলিয়াছে। (৭) তিনি ঐ বেহেশ্‌তী লোকদের জন্য সুপারিশ করিবেন, ইহাতে তাহাদের নেক আমলের তুলনায় বেহেশ্‌তে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হইবে। (৮) তিনি কবীরা গুনাহে লিপ্ত দোজখবাসীদের জন্য সুপারিশ করিবেন, তাঁহার সুপারিশে এই কবীরা গুনাহগার লোকগণকে দোজখ হইতে বাহির করা হইবে এবং বেহেশ্‌তে দাখিল করা হইবে।



## দরূদ শরীফের বর্ণনা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلٰوةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهٗ عَشْرَ دَرَجَاتٍ. (رواه النسائى)

অনুবাদঃ- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন- "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করিবেন এবং তাহার দশটি গুনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে, আর তাহার দশটি স্তর উন্নীত করা হইবে।" (নেসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ- উল্লেখিত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, একবার দরূদ শরীফ পাঠে ত্রিশটি ফায়েদা বা গুণাগুণ রহিয়াছে। দশটি স্তর উন্নয়ন। ঐ ব্যক্তিরা অতি ভাগ্যবান, যাহাদের জিহ্বা সর্বদা দরূদ শরীফ পাঠে দুলিতে থাকে। দরূদ শরীফ পাঠ প্রত্যেক দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শর্ত সাপেক্ষ। হযরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) এর বর্ণনায় দেখা যায় যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন "কেয়ামতের ময়দানে ঐ ব্যক্তিই আমার অতি নিকটবর্তী হইবে, যে আমার উপর অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।" (তিরমিযী)

অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠের ছওয়াব সম্পর্কে অনেক হাদীস রহিয়াছে। এই হাদীসগুলি দ্বারা কোন লোকই ইহা মনে করা উচিত নহে যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাদের দরূদ পাঠের মুখাপেক্ষী। (নাউজুবিল্লাহ) বরং আমরা সকলেই নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুখাপেক্ষী। আল্লামা জালালুদ্দীন আরেফ রুমী (রাঃ) বলেন-

زیں سبب فرمود حق صلوا علیه

که محمد بود محتاج الیه.

"আল্লাহ্‌তায়ালা সমগ্র বিশ্ববাসীকে হুজুরের দরবারে দরূদ ও সালামের নাজ্‌রানা পেশ করিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, সমগ্র

বিশ্ব শাহেনশাহে রিসালাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের মুখাপেক্ষী। আর তিনি বিশ্বের কোন বস্তু বা ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি শুধুমাত্র খোদারই মুখাপেক্ষী। আর সমগ্র খোদার সৃষ্টি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্তায়ালা কুরআন মজিদে বলিয়াছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর এবং অধিকতর ভালভাবে সালাম পাঠ কর।"

উপরোক্ত আয়াতে যে, صَلُّوْا (ছাল্লু) শব্দটি আছে, উহা صَلٰوةً (ছালাত) শব্দ হইতে রূপান্তরিত। এই শব্দের অর্থ কি, উহা ভালভাবে জানিয়া লওয়া একান্ত অপরিহার্য।

অভিধানিক অর্থে صلوة (ছালাত) বলিতে দোয়া বুঝায়।

আর এই শব্দটি صَلْىٌ (ছাল্ইউন্) শব্দ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, ইহার অর্থ পাছার দুই দিককে নাড়া। অথবা এই 'ছালাত' শব্দটি صَلْوٌ (ছাল্বুন্) শব্দ হইতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, ইহার অর্থ বক্র জিনিসকে সোজা করা। আর 'ছালাত' শব্দটি 'ইস্‌মে মাছদার।' 'মাজাজে-মুরছাল' হিসাবে ইহাকে কতগুলি "বিশিষ্ট আরাকান" অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। যাহাকে সাধারণতঃ 'নামাজ' বলা হইয়া থাকে।

আভিধানিকগণ ইহাকে 'দোয়া' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর আরবের পরিভাষায় (منسـوب اليـه) যাহার দিকে সম্বন্ধ করা হয়, উহার হিসাবে 'ছালাত' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে।

যখন 'ছালাত' শব্দটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধ হইবে, তখন ইহা (مـجـازا) সম্পূর্ণ রহমত অর্থে ব্যবহৃত হইবে। যখন ইহা ফেরেশ্‌তার দিকে সম্বন্ধ হইবে, তখন উহার অর্থ ইস্তেগ্‌ফার বা গুনাহ্ মাফ চাওয়া হইবে। যখন এই



'ছালাত' শব্দের সম্বন্ধ ইন্‌সানের দিকে হইবে, তখন ইহার অর্থ দোওয়া হইবে। আর যখন উহার সম্বন্ধ পশু-পাখী ও চতুষ্পদ জন্তু প্রভৃতির দিকে হইবে, তখন 'ছালাত' অর্থ 'তাস্‌বীহ পাঠ' করাই হইবে। আর যখন শরীয়তের দিকে সম্বন্ধ হইবে, তখন (منقول شرعی کی حیثیت سے) 'ছালাত' অর্থ নামাজ হইবে। উল্লেখিত অর্থগুলি (منسـوب اليـه) যাহার দিকে সম্বন্ধ হয়, তাহার (انفرادی) একাকীত্বের হিসাবে হইয়া থাকে। যদি এই 'ছালাত' শব্দটি কতগুলি বস্তু বা ব্যক্তির দিকে একসাথে সম্বন্ধ হয়, তখন এই 'ছালাত' শব্দের অর্থ কি হইবে, উহা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। উহা যাহার দিকে সম্বন্ধ করা হইয়াছে, তাহার হিসাবে অর্থ গ্রহণ করা হইবে? না, অন্য শব্দের হিসাবে অর্থ নির্দিষ্ট হইবে?

আমাদের মতে কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে যে صلوا (ছাল্লু) শব্দটি রহিয়াছে, উহা যাহার দিকে সম্বন্ধ, তাহার হিসাবে 'ছালাত' শব্দের একসাথে দুই অর্থ নির্দিষ্ট করা যাইবেনা। বরং এক অর্থই নির্দিষ্ট থাকিবে। কেননা, আল্লাহপাক তাঁহার যোগ্যমত তাঁহার হা'বিবের উপর 'ছালাত' পাঠাইতেছেন। অর্থাৎ তাঁহার নবীর প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন গাহিতেছেন। আর ফেরেশ্‌তাগণ ঐ বিপুল সমাবেশে হাঁ, হাঁ, বলিতেছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাগণ একই সাথে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর তা'রিফ ও প্রশংসা করিতেছেন। (তফসীরে হক্কানী)

ফেকাহ্ শাস্ত্রের সূত্র ও নিয়ম-কানুন নির্ধারণকারী হানাফী আলেমগণ বর্ণনা করিয়াছেনঃ বহু অর্থবোধক শব্দের একই সাথে দুই বা ততোধিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না। হাঁ, শাফেয়ী মাযহাব মতে গ্রহণ করা যায়। অতএব আমাদের মতে কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে যে 'ছালাত' শব্দটি আছে, উহার এমন একটি ব্যাপক অর্থ নির্দিষ্ট করিতে হইবে, যাহার মধ্যে সকল অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে, সুতরাং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত আয়াতের অর্থ এই যে-আল্লাহ্ তায়ালা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর নতুন নতুন তা'রিফ ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছেন আর ফেরেশ্‌তাগণ উহার সত্যতা স্বীকারে হাঁ, হাঁ, বলিতেছে। যদি কেহ আয়াতের এই অর্থ বলে যে, "আল্লাহ্তায়ালা নবীর

উপর রহমত বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার ফেরেশ্তাগণ নবীর মাগ্ফেরাত কামনা করিতেছে।" তাহা হইলে এই অর্থ মারাত্মক ভুল হইবে।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা মনে রাখুন-ঐ ব্যক্তির জন্যই মাগ্ফেরাত কামনা করা যায়, যে গুনাহ্গার ও পাপী। অথচ আল্লাহ্পাক নিজেই ঘোষণা করিয়াছেনঃ "হে নবী! আমি আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছি।" যাহার গুনাহ নাই বলিয়াই কুরআনে পাক সাক্ষ্য দিতেছে; তাঁহার জন্য আবার গুনাহ্ মাফ চাওয়া বোকামী ছাড়া আর কি হইতে পারে?

অপর পক্ষে, সমস্ত নবীগণ গুনাহ্ হইতে মাছুম বা পবিত্র। আর যিনি মাছুম বা গুনাহ্ হইতে পবিত্র, তাঁহার জন্য গুনাহ্ মাফ চাওয়ার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি মাছুম বা গুনাহ হইতে পবিত্র নহেন। অথচ ইহা নবুয়াতের শানের পরিপন্থী। যাহারা মাছুম নহে, তাহাদের জন্য মাগ্ফেরাত কামনা করা হইয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালা নিজেই বলিতেছেন, "হে নবী! আমি আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছি।" নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে কবীরা গুনাহ তো দূরের কথা, ছগীরা গুনাহ্ও প্রকাশ পাইতে পারেনা। সুতরাং নবীর জন্য আবার গুনাহ্ মাফ চাওয়ার কি অর্থ হইতে পারে? ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নবী মাছুম নহেন? (নাউজুবিল্লাহ) অথচ, নবী হইবার জন্য প্রথম শর্ত এই যে, তাঁহাকে মাছুম হইতে হইবে।

অতঃপর উল্লেখিত বর্ণনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের ঐ অর্থই শুদ্ধ হইবে, যাহা তফসীরে হক্কানী প্রভৃতি কিতাবে করা হইয়াছে।

মাওলানা সাহেব ওয়াজ করিবার সময় যখন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লিমু তাছলীমা" কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করিবেন, তখন শ্রোতাগণ উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। আর যদি নামাজ পড়াকালীন এই আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তবে দরূদ শরীফ পড়া অনুচিত এবং জুম্মার খোতবার মধ্যে যদি



উক্ত আয়াত পাঠ করা হয়, তবে শ্রোতাগন যদি ইচ্ছা করে তবে চুপে চুপে দরূদ শরীফ পড়িতে পারিবে।

যেমন-'ফতোয়ায়ে ছিরাজিয়া' নামক কিতাবের (بَابُ الْجُمُعَةِ) 'বাবুল-জুম্আতে' পরিচ্ছেদে ইমাম হুসামুদ্দিন সাহেব হইতে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু খুতবা পাঠকালীন উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করা অনুচিত। ওয়ায়েজীন কেরাম যখন ওয়াজের মাঝে মাঝে শ্রোতাগণকে দরূদ শরীফ পড়িতে হুকুম দেন, তখন তাঁহার জন্য সওয়াব পাওয়া যায়।

'ফতোয়ায়ে কাজীখান' ৪র্থ খণ্ড ৩৭৬ পৃষ্ঠা এবং 'উসূলে বাজদাবী' নামক কিতাব সমূহে আছে-

اِذَا قَالَ فِى الْمَجْلِسِ صَلُّوْا عَلَى النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَاِنَّهٗ يُثَابُ عَلٰى ذٰلِكَ.

"যখন মজলিশে ওয়াজকারী মাওলানা সাহেব শ্রোতাগণকে নির্দেশ দেন, "তোমরা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উপর দরূদ পাঠ কর"- তখন ইহার জন্য সওয়াব প্রদান করা হইবে।"

ফকীহ্গণের উল্লেখিত বাণী হইতে প্রমাণিত যে, ওয়াজের মাঝে মাঝে দরূদ শরীফ পাঠ করার হুকুম দেওয়া এবং নিজে পড়া বেদায়াত ও গুনাহ্ হইতে পারেনা। যাহারা ইহা মানে, তাহাদের জন্য উল্লেখিত ফতোয়াটিই যথেষ্ট। আর যাহারা হঠকারীতা করিয়া ইহা না মানে, তাহাদের জন্য কোন দলীল নাই।

## কেয়াম মিলাদের বর্ণনা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ. (متفق عليه)

অনুবাদঃ হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- "যখন বনু কুরায়জা হযরত ছা'দ ইব্‌নে মা'আজ (রাঃ) এর ফয়সালাকে মানিয়া লইল, তখন হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কোন এক ব্যক্তিকে হযরত ছা'য়াদ ইবনে মা'আজ (রাঃ) এর নিকট পাঠাইলেন এবং হযরত ছা'আদ (রাঃ) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকটবর্তী একটি জায়গায় ছিলেন, অতঃপর হযরত ছা'আদ (রাঃ) গাধার উপর চড়িয়া আসিতেছিলেন, তিনি যখন মসজিদের নিকটবর্তী হইলেন, তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আনসারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াইয়া যাও।"(বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ- ইমাম ইব্‌নে হাজর আস্কালানী উপরোক্ত হাদীস হইতে প্রমাণ করিয়া কিয়ামে-মিলাদ কে মুস্তাহাব বলিয়াছেন। আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, যখন হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হইতেন, তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) দাঁড়াইয়া যাইতেন। আর হযরত ফাতেমার হাত ধরিতেন এবং চোখ দুইটির মাঝখানে চুম্বন দিতেন এবং তাঁহার নিজের জায়গায় বসাইতেন। আর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) যখন হযরত ফাতেমার (রাঃ) নিকট পদার্পন করিতেন, তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) দাঁড়াইয়া যাইতেন, তাঁহার হাত ধরিতেন, তাঁহাকে চুম্বন দিতেন এবং তাঁহার নিজের জায়গায় বসাইতেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী হানাফী (রাঃ) তাঁহার লিখিত 'রেছালায়ে হাফ্‌ত মাছয়ালা' এবং 'শেমায়েমে ইমদাদীয়া' নামক কিতাবগুলিতে কিয়ামে মিলাদকে মুস্তহাব বলিয়াছেন এবং কিয়ামে মিলাদের বিরুধীগণ হইতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর উস্তাদ হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ ছায়ীদ হানাফী তাঁহার রচিত 'মাল্‌ফুজাত' এ বলিয়াছেন–

می فرمودند که خواندن مولود شریف وقیام نزدیک ولادت باسعادت
مستحب است (مقامات سعیدیه ومناقب احمدیه)



"মিলাদ শরীফ পাঠ করা এবং হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পবিত্র জন্ম সম্পর্কে আলোচনা করার সময় কেয়াম বা দাঁড়াইয়া যাওয়া মুস্তাহাব।"

ইমাম আলী ইবনে বোরহান উদ্দীন হলবী, আল্লামা আবদুর রহমান ছফুরী এবং ছৈয়দ আহমদ জয়নী মুফতিয়ে মক্কা মুয়াজ্জমা প্রমুখ প্রখ্যাত আলেমগণ কেয়ামে মিলাদকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন।

ইমাম ছৈয়দ জাফর বরজঞ্জি শহীদ তাঁহার রচিত 'শরফুল্ আনাম' নামক কিতাবে বলিয়াছেন, কুরআন-হাদীস হইতে প্রমাণ গ্রহণকারী ও যুক্তিবাদী ইমামগণ কেয়ামে মিলাদকে 'মুস্তাহ্‌সান' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকীউদ্দিন সব্‌কিও কেয়ামে মিলাদ করিয়াছেন! 'তফসীরে রূহুল-বয়ান' এর লেখক আল্লামা মুহাম্মদ বিন্ ইসমাইল হক্কী হানাফী (রাঃ) বলিয়াছেন– কেয়ামে মিলাদ জায়েজ হওয়ার জন্য শায়খুল ইসলাম (রাঃ) এর আমল বা কাজই বড় দলীল।

মাওলানা আবদুল হাই লৌক্ষভী হানাফী তাঁহার রচিত 'মুজমুয়া ফতোয়া' ৩য় খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠায় বলেন-

ولادت کے وقت اگر کوئی شخص نے بحالت وجد صادق اور بے ریا
قیام کیا تو معذور ھے اور یہ امر آداب صحبت سے ھے کہ حاضرین
بھی اس کا اتباع کریں اور حالت وجد کے بغیر اپنے اختیار سے قیام
کرنا نہ فرض ھے اور نہ واجب ھے اور نہ سنت مؤکدہ اور نہ مستحب
لیکن علماء حرمین شریفین (مکہ مکرمہ ومدینہ طیبہ) کے زادھما
اللہ شرفا قیام فرماتے رھتے ھیں

"হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্ম কাহিনী বর্ণনা করার সময় যদি কোন ব্যক্তি সত্যকার 'ওজ্‌দ' এবং কোন প্রকার লোক দেখানো ব্যতীত কেয়াম করে, তবে তাহাকে মা'জুর বা অপারগ বলা হইবে। আর ইহা একসাথে অবস্থান করার নিয়মাবলী হইতে একটি নিয়ম বিশেষ! অর্থাৎ উপস্থিত লোকগণও তাঁহার অনুসরণ করা এবং তাঁহার সহিত কেয়াম করা

উচিত। আর 'ওজ্‌দ' এর অবস্থা ব্যতীত স্বইচ্ছায় কেয়াম করা ফরজও নহে, ওয়াজেবও নহে, ছুন্নাতও নহে আর মুস্তাহাবও নহে। কিন্তু মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ কেয়াম করিয়া থাকেন।"

ইমাম বরজন্‌জি (রাঃ) 'মাওলেদ' নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন- "মিলাদ শরীফের সময়ে কেয়াম করাকে বড় বড় ইমামগণ মুস্তাহ্‌সান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অতঃপর কেয়ামের মাধ্যমে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে সালাম প্রদর্শন করাই যাহার উদ্দেশ্য হইবে, তাহার জন্য ইহা বরকত ও ছওয়াবের কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

'আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ' নামক কিতাবের ৪১ পৃষ্ঠায় আছে- "মিশর আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলেম হযরত শাইখুল ওলামা সেলিম সাহেব বলেন যে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্ম কাহিনী বর্ণনার সময়ে কেয়াম অস্বীকার করা এবং হুজুরের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করাকে পৌত্তলিক এবং রাফেজীগণের সহিত তুলনা করা আর ইহার সমালোচনা করা উচিত বলিয়া মনে হয়না। কেননা, পূর্ববর্তী ইমামগণ ঐ কেয়ামে-মিলাদকে হুজুরের শান-মান ও মর্যাদার উদ্দেশ্যে মুস্তাহ্‌সান মনে করিয়াছেন এবং ইহা এমন একটি কাজ, যাহার মধ্যে কোন খারাবী নাই।"

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হাজী ছৈয়দ আবেদ হোছাইন হানাফীর সেইখানে প্রত্যেক শুক্রবার মগরিবের নামাজের পর মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠিত হইত। ঐ মিলাদ মাহফিলে অনেক টাকা-পয়সা খরচ হইত। তাঁহার জীবিত কাল পর্যন্ত ইহার প্রচলন ছিল। তাঁহার কার্যপ্রণালী হইতে ইহাও একটি কাজ ছিল যে, তিনি ও তাঁহার খাদেমগণ মাখদুম পাক (রাঃ) এর ওরশের সময় 'কলিয়ার' শরীফে গমন করিতেন এবং আট দশদিন পর্যন্ত ভাণ্ডারখানা চালু রাখিতেন।

উল্লেখিত বর্ণনা সমূহ হইতে জানা গেল যে, হানাফী মযহাবের বড় বড় আলেমগণ ও বুজুর্গানে দ্বীন কেয়ামের অনুসারী ছিলেন। কেয়ামের মাছায়ালা সম্পর্কে হিন্দুস্থানে বড় বড় আলেমগণ বহু কিতাব লিখিয়াছেন।

কেয়াম মিলাদের মধ্যে দরূদ ও ছালাম পাঠ করা হইয়া থাকে যাহা আল্লাহ্‌র জিকির হইতে খালি নহে। দাঁড়ানো ও বসা প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর জিকির



করা যায়। দাঁড়াইয়া ও বসিয়া ছালাত ও ছালাম পাঠ করা কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া ছালাত ও সালাম পাঠ করা আল্লাহর ছুন্নাত। মিলাদ শরীফ পাঠ করার পর দাঁড়াইয়া ছালাত ও ছালাম পাঠ করা হুজুরের শান-শওকত বর্ণনা হইতে খালি নহে। আর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শান শওকত ও মান মর্যাদা বর্ণনা করাই উম্মতের মূল ঈমান। সর্বদা নবীর শান ও মর্যাদাকে বজায় রাখা এবং কুরআন ও হাদীস হইতে স্বীয় নবীর প্রশংসা বাহির করা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উম্মতগণের একান্ত কর্তব্য। কুরআন ও হাদীস হইতে নবীর দোষ-ত্রুটি এবং সম্মান হানিকর কথা বাহির করা নবীর উম্মতগণের জন্য মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বত কার্যের মাধ্যমেও হইতে পারে এবং আন্তরিকও হইতে পারে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজের মাধ্যমে হুজুরের মুহাব্বত প্রকাশ পাইয়া থাকে আর অন্তর বা কলব দ্বারাও প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিজের নবীর ইজ্জত সম্মান ও শান-শওকত তালাশের প্রতি সর্বদা ব্যস্ত থাকাই উম্মতের খাঁটি ঈমানের চিহ্ন। যেই তা'রিফ প্রশংসা এবং তা'জিমের মধ্যে আল্লাহর সহিত শিরক করা বুঝায়, উহা ব্যতীত হুজুরের অন্যান্য প্রত্যেক রকমের তা'রিফ প্রশংসা এবং তা'জিম করা জায়েজ আছে কাজের মাধ্যমে হুজুরের মুহাব্বত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ পায়। আর আন্তরিক মুহাব্বত অবস্থার দ্বারা বুঝা যায়। আন্তরিক মুহাব্বত সম্পর্কে অনেক হাদীস রহিয়াছে।

অতঃপর কেয়ামে মিলাদ আন্তরিক মুহাব্বতে গণ্য। যে ব্যক্তি ইহাতে মজা বা স্বাদ পাইবেনা, তাহার উচিত যেন মৌখিক ও কলমের খোচা দেওয়া হইতে বিরত থাকে। যেই কাজে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ক্ষুদ্র ও নগন্য মর্যাদার সুগন্ধি পাওয়া যায়, উহা উম্মতের জন্য বড় মূল্যবান নেয়ামত বলিয়া মনে করা উচিত। সেই ব্যাপারে মৌখিক ও কলম দ্বারা সমালোচনা করা অনুচিত।

ঐ আলেমগণ এবং তাহাদের অনুসারীবৃন্দের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর বিস্ময় এই যে, তাহারা নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করা সত্বেও হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্মদিনে আনন্দ প্রকাশ করা, মিলাদ মাহফিলে নবীর প্রশংসা করা এবং কেয়ামে-মিলাদ করাকে গুনাহ ও বেদায়াত মনে করিয়া

থাকে। অধিকন্তু তাহারা দাবী করে যে, যাহা পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রচলিত ছিলনা, তাহা করিলে কোন সওয়াব পাওয়া যায়না। আমরা তাহাদের কাছে প্রশ্ন করি যে, তাহাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী, চাল-চলন, দুই-তিন তলা পাকা দালানে বসবাস করা, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজে সফর করা এবং ডাক্তার হইতে টিকা গ্রহণ করা ইত্যাদি কাজ পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা? যদি তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, তবে উল্লেখিত কাজগুলি সওয়াবের গণ্ডীর বাহিরে বলিয়া পরিগণিত হইবে? সুতরাং তাহাদের এই ফতোয়া অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই সওয়াবের কাজ করিতেছেনা। বরং সকলেই গুনাহ্ ও বেদায়াত করিতেছে। ফতোয়া প্রদানকারীগণও এই দলের অন্তর্ভূক্ত। ওহাবী সম্প্রদায়ের আলেমগণ বিনা দ্বিধায় কেয়ামে-মিলাদের ব্যাপারে বেদায়াত ও শিরক এর ফতোয়া জারী করিয়া থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্মরণীয় দিবস যেমন শেরে বাংলা দিবস, সরওয়ার্দী দিবস ইত্যাদি পালন করিলে, বাজার সাজ াইলে, আলোকসজ্জা করিলে, তখন বেদায়াত ও অযতা খরচের ফতোয়া প্রদানকারী এই ওহাবীগণ কোথায় থাকে? তখন কেন তাহারা বিভিন্ন ফতোয়া দেওয়ার সাহস করেনা? শুধুমাত্র জনাবে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জন্ম-দিবস পালনে, ওরশ এবং কেয়ামে-মিলাদ ইত্যাদি ব্যাপারে বেদায়াত ও শিরক এর ফতোয়া প্রদান করে।

অতএব ইহাই বুঝা গেল যে, এই ওহাবী লোকদের অন্তর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বত হইতে খালি ও শূন্য। তাই তাহারা হুজুরের শান-শওকত ও তা'জিমের বিরোধী।

মাছয়ালাঃ- যাহারা বসিয়া ছালাত ও সালাম পাঠ করে, নামাজের মধ্যে আত্তাহিয়্যাত পড়াকালীন যেইরূপ দুই জানু হইয়া বসে, তদ্রূপ দুই জানু হইয়া বসিয়া ছালাত ও সালাম পাঠ করা তাহাদের উচিত। আর যাহারা দাঁড়াইয়া ছালাত ও সালাম পাঠ করে, নামাজের মধ্যে যেইরূপ নাভির নীচে হাত বাঁধিয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ হাত বাঁধিয়া ছালাত ও সালাম পাঠ করা তাঁহাদের উচিত।

'ফতোয়ায়ে আলমগীরী' নামক কিতাবে আছে–



يَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِى الصَّلٰوةِ

"নামাজের মধ্যে যেইরূপ দাঁড়াইতে হয়, তদ্রূপ দাঁড়াইয়া ছালাত ও সালাম পাঠ করিতে হইবে।"

মিলাদ শরীফে কেয়াম করা, ওরশ-উন্-নবী, মিলাদুন্নবী এবং আহ্বান সহকারে দরূদ ও সালাম পাঠ ইত্যাদি (بطور فرضى) যদিও বেদায়াত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবুও উহা নেক আমলের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, ঐ সমস্ত কাজ নবীর মুহাব্বত এবং নবীর তা'জিম ও প্রশংসার খাতিরে করা হয়। আর যেই কাজ মুহাব্বত ও তাজিমের ভুমিকা পালন করে, সেই কাজ স্বয়ং মুহাব্বত ও তাজিমের হইয়া থাকে। যেমন দেখুন, ইবাদত ও সৎকাজ সমূহে যেই উপকরণ গুলি ইবাদত ও সৎকাজ পালনের মাধ্যম হয়, উহা নিজেই ইবাদতে শামিল। অজুর মধ্যে হাত-পা ধোয়া, মাথা মোসেহ্ করা, কুলি করা ইত্যাদি কাজ কোন স্বয়ং ইবাদত নহে, কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে এবং নামাজের ফরজ হিসাবে অজুর উক্ত কাজগুলি স্বয়ং ইবাদতে পরিগণিত। তদ্রূপ কেয়াম, মিলাদ, ফাতেহা ইত্যাদি কাজ ইবাদতে শামিল। এই কাজগুলিকে আমরা ফরজ বা ওয়াজিব বলি না। বরং জনাবে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মুহাব্বত ও তা'জিমের ভূমিকা স্বরূপ অতি উত্তম মুস্তাহাবে গণ্য করিয়া থাকি। আর উক্ত কাজগুলিকে যাহারা বেদায়াত ও শিরক বলিয়া থাকে, আমরা তাহাদিগকে 'খারেজী, ওহাবী' নামে চিহ্নিত করিয়া থাকি। নতুবা তাহাদের নিকট কোন বিশিষ্ট লেজ নাই। খারেজী, ওহাবীগণ সর্বদা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মুহাব্বত ও তা'জিম সম্বলিত শব্দগুলি এবং হুজুরের মুহাব্বত ও তা'জিমপূর্ণ কাজগুলি হইতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে এবং শিরক ও বেদায়াত বলিয়া থাকে। আর অধিক ভাবে 'শিরক ও বেদায়াত' শব্দ সহকারে ফতোয়া দেওয়া খারেজী, ওহাবীগণের বিশিষ্ট কাজ ও অভ্যাস ছিল। যেমন তাহাদের কিতাব-পত্র ও বই-পুস্তক দ্বারা প্রকাশ পায়।

কবি সুন্দরই বলিয়াছেন–

اۓ جاهل خلوص! بتا كيا جواب دوں؟

دنیا یه پوچهتی هے که میں کیوں اُداس هوں؟

“হে মুর্খ! হে বোকা! বল, তোমাকে কি উত্তর দিব? আমার নীরবতার দরুণ দুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমি এত উদাসীন কেন?”

কেয়াম, মিলাদ, ফাতেহা, ওরশ-উন্-নবী ইত্যাদি কাজে যদি কোন হারাম বস্তু সংযুক্ত হইয়া থাকে, তবে সকলে মিলিয়া ঐ হারাম জিনিসগুলিকে দূরিভূত করা উচিত। ইহা না করিয়া আসলে যাহা হালাল, (অর্থাৎ কেয়াম, মিলাদ, ফাতেহা ইত্যাদি) উহাকে মূলোৎপাটন করা কতটুকু দুরস্ত হইতে পারে? ইহা তো কোন লোকের নাকের উপর মাছি বসার দরুন তাহার নাক হইতে মাছিটি না তাড়াইয়া নাকের গোড়া সহ কাটিয়া ফেলার মত হইবে।

বন্ধুগণ! নাকের উপর মাছি বসিয়াছে বিধায় নাক কাটিয়া ফেলা হয় না, বরং মাছিটি তাড়ানো হয়। যদি কোন লোক হজ্ব করিতে গিয়া সেইখানে চুরি করে, অথবা নাজায়েয কোন কাজ করিয়া বসে অথবা কেহ ব্যবসার নিয়তে হজ্ব করিতে যায়, তবে কি উহার কারণে মূলতঃ হজ্ব বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে? না, ঐ সমস্ত নাজায়েয কাজগুলি দূর করা যাইবে?

কাহারও ঘরে দরজা দিয়া চোর ঢুকিয়াছে, তাই কি দরজা এবং দরজার নাম খতম করিয়া দেওয়া হইবে? না, অন্য কোন ব্যবস্থা করা হইবে?

আমরা মিলাদ শরীফে এইজন্য কেয়াম করি না যে, খামোখা হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের মিলাদ মাহ্ফিলে তশরীফ আনেন। যদিও এইরূপ তশরীফ আনা শানে-নবুওয়াতের বাহিরে নহে। কারণ, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মিলাদ-মাহ্ফিলে তশরীফ আনা অসম্ভব কিছু নহে, বরং ইহা সম্ভবের ভিতর। উহা সম্পর্কে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী তাঁহার রচিত ‘শামায়েমে ইমদাদীয়া’ নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা মিলাদ-শরীফে এইজন্য কেয়াম করিয়া থাকি যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) স্বশরীরে এই ধরা বুকে পদার্পন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে



তাওহীদি নূরে আলোকিত করিয়াছেন এবং কুফরী ও শির্ক এর অন্ধকার ও গোমরাহী হইতে পৃথিবীকে নাজাত দান করিয়াছেন। ইহার জন্য আমাদের মত নগন্য উম্মত শুধু খুশী উদ্‌যাপন করিয়া কেয়ামে মিলাদ করিয়া থাকি। বাস্তবিক পক্ষে ইহা করাও উচিত। কেননা, ইহার মধ্যে তো কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ হয় না। কারণ, দাঁড়াইয়া দরূদ ও সালাম পাঠ করা কোন প্রকারেই নাজায়েয ও বেদআত হইতে পারে না।

যাঁহার বদৌলতে আমরা কুরআন-হাদীস পাইয়াছি, সেই ছরদারে দো-জাঁহান ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মিলাদে পাক বা জন্ম-দিবসের জন্য প্রতি বৎসর এবং প্রতিদিন খুশী উদ্‌যাপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছালাত ও সালাম পাঠ করিলে এবং শিরনী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিতরণ করিলে, তবে ইহার মধ্যে খারাপ ও অসুবিধা কি থাকিতে পারে? ইহার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই, বরং কেয়াম করিলে ছালাত ও ছালাম আদায় হইয়া যায় এবং শুকরিয়াও আদায় হইয়া যায়।

وه جو نه تهے تو كچه نه تها وه جو نه هوں تو كچه نه هو

جان هیں وه جهان کی جان هے تو جهان هے .

“যখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ছিলেন না, তখন কিছুই ছিল না, আর তিনি যদি না হইত তবে কিছুই হইত না। তিনি সারা জাহানের প্রাণ, প্রাণ আছে তো, সারা জাহানও আছে।”

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মিলাদ মাহ্ফিলে তশরীফ আনেন তাহা আমরা দেখিয়া থাকি, তাই কেয়াম করা হয় না, বরং আমরা প্রথমে মিলাদের খোতবা পাঠ করিয়া পরে কেয়াম করিয়া থাকি। সুতরাং আমরা ইহাকে কেয়ামে মিলাদ বলিয়া থাকি। আমাদের মজলিশে হুজুরের আগমনের খাতিরে কেয়াম করা হয় না। তথাকথিত আলেমগণ উক্ত পার্থক্যটি অনুধাবন করিতে না পারিয়া কেয়ামে মিলাদকে কেয়ামে লিল্-ক্বাদেম (আগমনকারীর জন্য কেয়াম) বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের কিতাব পত্র এবং রচনাবলীতে রাছূলের শানে বিভিন্ন প্রকারের বে-আদবী করা হইয়াছে, যদ্বারা তাঁহাদের ঈমান সম্পর্কেও আশংকা করা হইয়াছে। এই কেয়ামে মিলাদ তো মুস্তাহাব, কিন্তু উহা বন্ধ করার জন্য বে-আদবীর সীমা

যতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, কোন কুফরী ও হারাম কাজকে বন্ধ করার জন্য ততদূর করা হয় নাই।

আরে! এই কেয়ামে মিলাদ তো হুজুর নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সহিত আন্তরিক মুহাব্বতেই করা হয়। যাহাকে তোমরা বেদায়াত ও হারাম বলার মধ্যে সীমা অতিক্রম করিতেছ, উহা কোন ন্যায়বান লোকের কাজ নহে! হুজুর জনাবে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সহিত তোমাদের কি শত্রুতা আছে? যদি তাঁহার সহিত শত্রুত থাকে, তবে তোমাদের সহিত কোন আলাপ হইতে পারে না। আর যদি শত্রুতা না থাকে তবে বুঝিয়া লও যে, আন্তরিক মুহাব্বতের কাজ তাহা নগণ্য হউক না কেন, যেই রকম হউক, যখন এবং যেইখানে হউক না কেন, রাসূল প্রেমিকগণের জন্য উহা নাজায়েয ও বেদায়াত হইতে পারে না।

تجھسا سیاہ کار کون انسا شفیع ہے کہاں

پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل میں یہ تیرا گمان ہے

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোথাও এই কেয়াম ও মিলাদকে হিন্দুদের কানাইয়্যার জন্ম-উৎসবের সহিত তুলনা করিতেছে এবং কোথাও বেদায়াত ও গোমরাহী বলিয়া অভিহিত করিতেছে। (লা হাওলা ওয়ালা .......)

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে নিজের নবীও বলিতেছে। জানি না, এই লোকগণ জনাবে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে কি রকম নবী মানিতেছে। অথচ এই কেয়ামে মিলাদকে 'বেদয়াত, বেদায়াত' বলিয়া যাহারা চিৎকার করিতেছে, তাহাদের মুরুব্বীগণের শরীয়ত মতে কাকের মাংস খাওয়া শুধু জায়েয নহে, বরং ইহাতে ছওয়াবও আছে।

نہ جانا حضرت زاھد کی تسبیح ومصلی پر

برے چلتے ہوئے حضرت ہیں انکو ہم سمجھتے ہیں

পাঠকবর্গ! আপনারা বোধ হয় হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী ছাহেবের নামও শুনিয়াছেন। তিনি শরীয়ত ও তরীকতের বড়ই বুজুর্গ ছিলেন এবং মুজাদ্দেদীয়া তরীকার এক কেরামত ওয়ালা ওলী



ছিলেন। 'তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ' নামক কিতাবে আছে যে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ আলেমে রব্বানী ছিলেন। তিনি হযরত শাহ্ আবদুল আজীজ (রাঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হইতে হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাক্ওয়া পরহেজগারী এবং হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে উপমা স্বরূপ ছিলেন। দেওবন্দের বড় বড় আলেমগণ তাঁহার বুজুর্গী এবং জ্ঞান গরীমা স্বীকার করিতেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেন। এমনকি মাওলানা আশরফ আলী থানভীও দুই তিনবার তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়াছিলেন। তাঁহার এলম ও আমলের খ্যাতি ভারত উপমহাদেশ ব্যাপী ছিল। এই সম্মানিত বুজুর্গ হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব মাহ্ফিলে মিলাদ শরীফ এবং সালাম ও কেয়ামে অত্যন্ত মুহাব্বত রাখিতেন।

হানাফী মযহাব মতাবলম্বী আল্লামা ইব্রাহীম হলবীও কেয়ামে মিলাদকে মুস্তাহাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কেয়ামে মিলাদের ব্যাপারে মোট কথা এই- হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র বেলাদাতের সম্মানার্থে এবং হুজুরের সহিত আন্তরিক মুহব্বতের কারণে কেয়ামে-মিলাদ করা হয়। উহার ব্যাপারে ততটুকু দলীল-প্রমাণের কি প্রয়োজন আছে? যেহেতু সেইখানে আল্লাহর সাথে শিরক করা হইতেছেনা। মুহাব্বতের মাছয়ালার মধ্যে দলীল-প্রমাণ তলব করা জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য শোভনীয় নহে। যেহেতু হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সহিত আন্তরিক মুহাব্বত সম্পর্কে দলীল রহিয়াছে, সুতরাং আন্তরিক মুহাব্বতের মাছয়ালার জন্য কোন দলীল-প্রমানের আবশ্যক হয়না। অধিকন্তু, ইহা হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ইত্যাদি মাযহাব সম্পর্কিত কোন (جـزئی وفـروعی) মাছয়ালাও নহে, যাহার জন্য হানাফী কিতাব সমূহ হইতে দলীল প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। বরং ইহা এমন একটি মাছায়ালা, যাহা হুজুরের বেলাদাতের তা'জিম এবং আন্তরিক মুহাব্বতের সহিত সম্পর্কিত। অতঃপর ইহার জন্য চার মাযহাবের যে কোন আলেমের কিতাব অথবা নির্ভরযোগ্য উক্তি পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। ইহা অবশ্য জ্ঞানী আলেমগণের জানা কথা।

জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বত ও তা'জিম-সম্মানের

ব্যাপারে বাহানা বা ছুতা গ্রহণ করা এবং দলীল-প্রমাণ তলব করা মুস্তফার আশেকগণের জন্য অশোভণীয়। যদি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, তবে হযরত রাছুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উপর বসিয়া হউক বা দাঁড়াইয়া হউক, উভয় প্রকারে দরুদ পাঠ করা জায়েয আছে এবং উচ্চস্বরে হউক বা নিম্নস্বরে হউক, উভয় প্রকারে দরুদ পড়া জায়েজ আছে।

জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর উপর সম্বোধন পদ অথবা নাম পুরুষ পদ সম্বলিত উভয় প্রকারের দরুদ ও সালাম পাঠ করা জায়েজ আছে। বরং কুরআনের আয়াত হইতে সম্বোধন পদ দ্বারা হুজুরের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করাই প্রতীয়মান হইতেছে, যদিও নাম পুরুষ দ্বারাও জায়েজ আছে। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থায় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য্য।

بے ادب محروم گشت از فضل رب

"বে-আদব খোদার দান হইতে বঞ্চিত।"

মাওলানা আবদুল হাই লক্‌নৌভী সাহেবের পিতা হযরত মাওলানা আবদুল হালিম লক্‌নৌভী (রঃ) (محشی نور الانوار وشرح الوقایه وغیره) সাহেব রচিত 'নূরুল ঈমান বেজিয়ারত-ই-আছারে হাবিবির রহমান' নামক কিতাবের ৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন–

اِنَّ الْحَقِيْقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ كَانَّهَا سَارِيَة فِى كُلّ مَوْجُوْد وَحَاضِرَة فِى بَاطِن كُلّ عبد وانكشاف هذه الحالة على الوجه الاتم فى حال الصلوة فحصل محل الخطاب فخوطب صلى الله عليه وسلم (اسی میں ہے) ان العبد لما تشرف بثناء الله تعالى فكانه اذن فى الدخول فى حريم الحرم الالهى ونور بصيرته ووجد الحبيب حاضرا فى حرم الحبيب فاقبل عليه وقال السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته.

"মুহাম্মদী হাকীকত এই যে, উহা সমগ্র বিশ্বের মাঝে স্তম্ভ স্বরূপ এবং প্রত্যেক নর-নারীর অন্তরের অন্তঃস্থলে বিদ্যমান আছে। নামাজ পড়াকালীন



এই অবস্থার পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই নামাজেই হাকীকতে মুহাম্মদীয়াকে সম্বোধন করার সময় সাপেক্ষ হয়। তাই সকলে নামাজের মধ্যে 'আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান-নবীউ' সম্বোধন পদ দ্বারা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে সালাম পেশ করিয়া থাকে।"

পাঠকবৃন্দ! আপনারা লক্ষ্য করুন, নামাজের মত মহান ইবাদতের সমাপ্তিতে নবীর দরবারে সম্বোধন পদ দ্বারা সালাম পেশ করা হইয়া থাকে। আর ইহাই হইল নবীর শিক্ষা। ঠিক তদ্রূপ প্রত্যেক সৎকাজের সমাপ্তির সম্বোধন পদ দ্বারা হুজুরের দরবারে সালাম পেশ করা অসুবিধা কি? বস্তুতঃ প্রত্যেক সৎকাজ বিশেষতঃ ওয়াজ-মাহফিলের মত সৎকাজের শেষপ্রান্তে সম্বোধন সহ্‌কারে দরবারে মুস্তফার মাঝে সালাম পেশ করা বড়ই ছওয়াব। ইহা ঐ ব্যক্তিই ইনকার বা অস্বীকার করিতে পারে, যে জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বতের স্বাদ পায় নাই।

আরে! যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফ এবং কেয়ামে মিলাদকে খায়ের ও বরকতের একটি সম্বল মনে করিয়া থাকে, আর জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে গোলামীর একটি উত্তম তরীকা মনে করিয়া নিজের জন্মগত জজবা এবং উৎসাহের ভিত্তিতে মিলাদ ও কেয়ামে মিলাদের খায়ের ও বরকতকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়া থাকে, সমালোচনার দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ করার কি দরকার আছে? সে তো শুধু এতটুকু জানে–

تصور سے تمہارے دل کو تسکین دے ھی لیتے ھیں

تم آؤ یا نہ آؤ کام اپنا ھوھی جاتاھے

"হে প্রিয় নবী! আপনার ধ্যানে মগ্ন হইয়া আমার প্রাণে শান্তি দান করিয়া থাকি, আপনি আসুন বা না আসুন, আমার কাজ তো সাধিত হইয়া যাইতেছে।"

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, কিছু সংখ্যক আলেম বেশধারী লোক কেয়াম, মিলাদ, ফাতেহা, ওরশ ইত্যাদি সৎকাজগুলিকে বেদায়াতে ছাইয়্যা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তাহারা উল্লেখিত সৎকাজগুলি ছাড়াও অন্যান্য

প্রত্যেক সৎকাজকে না জায়েজ ও শির্‌ক বলিয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালাই ভাল জানেন যে, তাহারা শির্‌ক ও বেদায়াতের অর্থ কি বুঝিয়াছে?

আসলে কথা হইল, যেই আলেমগণ হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর তা'রিফ-প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং কেয়ামে মিলাদ, ফাতেহায়ে এয়াজ-দাহম, ফাতেহায়ে দোয়াজ-দাহম ইত্যাদি পালন করিয়া থাকেন এবং সর্বদা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণের সম্বন্ধে আলোচনা করেন, ঐ নামধারী আলেমগণ তাঁহাদিগকে বেদায়াতী বলিয়া থাকে। আসল ব্যাপার এই যে, ঐ নামধারী আলেমগণের মুখে সর্বদা শির্‌ক ও বেদায়াত লাগিয়া রহিয়াছে। আর এই আলেমগণের মুখে সর্বদা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর প্রশংসা এবং আউলিয়ায়ে কেরামের তা'রিফ জারী রহিয়াছে। ইহা এই হাদীসের আলোকে হইয়া থাকে যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন كُلُّ اَنَاءٍ تَتَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ "যেই পাত্রে যে বস্তু রহিয়াছে, সেই বস্তুই ঐ পাত্র হইতে নির্গত হয়।" উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, যেই পাত্রে ঘি রাখা হইয়াছে, ঐ পাত্র হইতে ঘি বাহির হয়, আর যাহার মধ্যে পানি আছে, উহা হইতে পানি, এবং যেই পাত্রে তৈল আছে, উহা হইতে তৈল, আর যাহার মধ্যে প্রশ্রাব থাকিবে, উহা হইতে প্রশ্রাবই বাহির হইবে। মোটকথা এই যে, যেই পাত্রে যেই জিনিস থাকিবে, উহা হইতে ঐ জিনিসই বাহির হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যাহাদের মুখে শির্‌ক ও বেদায়াত লাগিয়াই রহিয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণেও শির্‌ক ও বেদায়াত বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যাঁহাদের মুখ হইতে জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর প্রশংসা এবং ছালাত ও সালাম জারী হইয়া থাকে, প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের অন্তঃকরণেও রাসুলের মুহাব্বত এবং আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণের প্রেম ও ভালবাসা বিরাজমান রহিয়াছে। কেননা, যেই পাত্রে যে জিনিস রহিয়াছে, উহাই ঐ পাত্র হইতে নির্গত হইয়া থাকে। দেখুন, ঐ নামধারী আলেমগণ শির্‌ক ও বেদায়াতের বাজার গরম করিয়া তাকে আর ইহারা নবীর প্রশংসা ও আউলিয়ায়ে কেরামের তা'রিফ-প্রশংসার বাজার গরম করিয়া থাকেন। জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, সাধারণতঃ আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকেরাই মিলাদ শরীফের



মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত করিয়া থাকেন, আর ইহা বিশেষভাবে আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিয়ম। কেননা, নানা প্রকার গনজমায়েত এবং সীরাতের অনুষ্ঠান প্রত্যেক দলের ও প্রত্যেক মাযহাবের লোক গঠন করিয়া থাকে। কাদিয়ানী, ওহাবী, রাফেজী, খারেজী, সম্প্রদায়ের লোকগণও সীরাতের উপর বক্তৃতা দান করে। এমনকি অমুসলমানগণও বিশ্বনবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সীরাতের উপর বক্তৃতা করিয়া এবং বই-পত্র লিখিয়া থাকে। কিন্তু মিলাদ শরীফ এমন একটি কাজ, যাহা শুধুমাত্র সুন্নী মযহাবের লোকেরাই করিয়া থাকেন। এই মিলাদ শরীফের মাহ্‌ফিল এমন একটি গণ-জমায়েত যে, উহাতে অংশ গ্রহণকারী লোকেরা অল্প সময়ের মধ্যে শত-সহস্র সওয়াব হাসিল করিতে পারে। ইহা এমন একটি মাহ্‌ফিল, যাহার মধ্যে আল্লাহ্‌র জিকিরও করা হয়, রাসূলের আলোচনা ও সাহাবাদের আলোচনা, আউলিয়ায়ে কেরামের আলোচনা, নামাজ রোজার আলোচনাও করা হইয়া থাকে। এই মাহ্‌ফিলে রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা হয়। এইখানে শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত দুই-ই সম্পন্ন হয়। ইহা ঐ মহাপুরুষের জন্মকাহিনী ও তদসম্পর্কিত ঘটনাবলী আলোচনার মাহ্‌ফিল, যাঁহার জন্ম ও মিলাদের ছদকায় সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি তিনি জন্ম না হইতেন, যদি তাঁহার মিলাদ না হইত, তাহা হইলে কিছুই সৃষ্টি হইত না। চন্দ্র-সূর্য, আসমান-জমিন, মানব-দানব, ফেরেশ্‌তা, নামাজ-রোজা, হজ্ব-জাকাত কিছুই অস্তিত্ব লাভ করিতে পারিত না। উল্লেখিত জিনিসগুলি তথা সমগ্র বিশ্ব জনাবে মুস্তফা (সাঃ) এর মিলাদে পাকের ছদকায় সৃষ্টি হইয়াছে। জনৈক কবি সুন্দর বলিয়াছে–

یه قرآن هے میلاد احمد کا حصه
نمازیں هیں معراج احمد کا صدقه
منور هے نور محمد سے کعبه
مزین هے نام محمد سے کلمه
محمد نه هوتے تو کچه بهی نه هوتا

"এই কুরআন মজীদ হযরত আহ্‌মদে মুজ্‌তাবা মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মিলাদে পাকের একটি অংশ বিশেষ। এই নামাজ সমূহ তাঁহার মি'রাজের বদৌলতে শরীয়তের স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে। খানায়ে

কা'বা নূরে মুহাম্মদী দ্বারা আলোকিত আর ইসলামের কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাঁহার নামের দ্বারা সুসজ্জিত। অতঃপর যদি মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে কিছুই সৃষ্টি হইত না।

মিলাদুন্নবীর বাস্তবতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক প্রমাণ রহিয়াছে।

خدا کا حکم قیامت میں ائے دل ہوگا
میرے مصطفے کی ثنا خوانی کی نجات ہے آج

"হে হৃদয়! কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার হুকুম হইবে যে, আমার প্রিয়তম মুস্তফার তা'রিফ প্রশংসার দ্বারাই আজ পরিত্রাণ মিলিবে।"

### সীরাতুন্নবীর তাৎপর্য বর্ণনা

(میلاد) 'মিলাদ' অর্থ জন্মের সময়, জন্মকাল এবং (سیرة) 'সিরাত' বলিতে বুঝায়–

هى الطريقة سواء كانت خيرا او شرا ثم غلب فى الشرع على طريقة المسلمين فى المعاملة مع الكافرين والبغاة وغيرهما من المستامنين والمرتدين قال ابن همام غلب فى عرف الفقهاء على الطريق المامور فى عزو الكفار وفى الكفاية انه يختص بسير النبى صلى الله عليه وسلم فى المغازى وسميت المغازى سيرا لان اول اموره السير الى الغزو قال النسفى السيرة امور الغزو كالمناسك امور الحج قال الامام السيد الشريف فى التعريفات الفقهية السيرة وهى الطريقة سواء كانت خيرا او شرا يقال فلان محمود السيرة وفلان مذموم السيرة.

"উহা একটি নিয়ম বা পদ্ধতি, তাহা সৎ হউক বা অসৎ হউক। তারপর এই 'সীরাত' শব্দটি শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমানদের ঐ নিয়ম বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে, যাহা কাফের, বিদ্রোহী, আশ্রিত ব্যক্তি ও ধর্মত্যাগীদের সহিত কাজ-কারবারে সংঘটিত হয়। ইমাম ইবনে হুমাম (রাঃ) বলেন– ফকীহ্গণের ভাষায় 'সীরাত' বলিতে ঐ নিয়ম পদ্ধতিকে বুঝায়, যাহা



কাফেরগণের সহিত জেহাদের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 'কেফায়া' নামক কিতাবে আছে– 'সীরাত' শব্দটি হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জেহাদ সম্পর্কীয় চাল চলন ও রীতি-নীতি এবং কাজ-কর্মের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। আর যুদ্ধের ঘটনাবলীকে 'সীয়ারুন' বলা হইয়া থাকে। কারণ, যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে প্রথমতঃ যুদ্ধের দিকে সায়ের বা ভ্রমণ করিতে হয়। আল্লামা নাসাফী (রাঃ) বলিয়াছেন, "জেহাদের কাজ-কর্ম ও ঘটনাবলীকে 'সীরাত' বলা হয়, যেমন হজ্বের অনুশাসনগুলিকে 'মানাসিক' বলা হয়।" ইমাম ছৈয়দ শরীফ জুরজানী (রাঃ) তাঁহার 'আত্তারিফাত' নামক কিতাবে বলিয়াছেন যে, 'সীরাত' নিয়ম বা অভ্যাসকে বলা হয়, তাহা সৎ হউক বা অসৎ হউক। যেমন বলা হইয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি সৎ অভ্যাসী এবং অমুক ব্যক্তি অসৎ অভ্যাসী।"

মুহাদ্দেছীন ও ফকীহ্গণের মতে 'সীরাত' বলিতে বিশেষভাবে জেহাদের ঘটনাবলী ও কাজ-কর্মকে বুঝায়, যদিও 'সীরাত' শব্দটি আংশিকভাবে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর অন্যান্য অবস্থাকেও শামিল করিয়া থাকে। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় 'সীরাত' অর্থ জেহাদের ঘটনাবলী ও অবস্থাসমূহ।

উল্লেখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইল যে, 'সীরাতুন্নবী' খাস্ বা ইহার অর্থ সীমিত এবং 'মিলাদুন্নবী' যদিও খাস্ কিন্তু (مفهوما) ভাবার্থ হিসাবে ইহা আম বা ইহার অর্থ অতি ব্যাপক। কেননা, 'মিলদুন্নবীর' উদ্দেশ্য হইল আল্লাহতাআলার সমস্ত নির্দেশাবলী এবং শরীয়তের হুকুমগুলি মানুষের প্রতি পৌছাইয়া দেওয়া। আর যাহাদের নিকট শরীয়তের এই নির্দেশাবলী তথা আল্লাহ্র এই দানগুলি পৌছিয়াছে, (তাহা কোন অছিলার মাধ্যমে হউক বা অছিলা ছাড়া হউক) তাহাদের উচিত যেন তাহারা এই মহান উপকারী দাতা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর স্মরণের জন্য একটি বিশিষ্ট সময় নির্ধারণ করে, যদ্দারা বিধর্মীগণের উপর এই সম্মানিত মহাপুরুষের প্রভাব বিস্তারিত হয়। ঐ বিশিষ্ট সময়টিই হইল রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ বা নয় তারিখ।

অপর পক্ষে সীরাতুন্নবী সম্পর্কে মুসলমান ও অমুসলমানগণের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও আলোচনা করিয়া থাকেন। যেমন মহাত্মাগান্ধী এবং খৃষ্টানীয় বড়

বড় নেতাগণ সীরাতুন্নবী সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে আলোকপাত এবং রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতা দান করিয়াছেন। তদ্রূপ এই যুগেও যাহারা 'মিলাদুন্নবী'কে ত্যাগ করিয়া উহার পরিবর্তে 'সীরাতুন্নবী' উদ্‌যাপন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অমুসলমানগণের এজেন্ট ও দালাল বলিয়া মনে করা যাইতেছে। হ্যাঁ, 'সীরাতুন্নবী' সম্পর্কেও জ্ঞান রাখা মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু যাঁহারা 'মিলাদুন্নবী' উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন বা ইহাকে মানিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত 'সীরাতুন্নবীর' মাহ্‌ফিল গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য। সুতরাং যাহারা 'মিলাদুন্নবী'কে অস্বীকার করে, তাহাদের 'সীরাতুন্নবী' মাহ্‌ফিল আমরা মুসলমানদের জন্য কোন গুরুত্ব রাখে না।

মোটামুটি কথা হইল এই সমস্ত মুহাদ্দেসীন ও ফকীহগণ 'সীরাত' শব্দ বলিতে শুধু জেহাদ এবং জেহাদ সম্পর্কিত ঘটনাবলীকে বুঝাইয়াছেন! কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এই 'সীরাত' শব্দটি এতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহারা বিশ্বনবী জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্মকাল হইতে ওফাত পর্যন্ত সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত হুজুরের জ্বাত (সত্ত্বা) ও ছিফাত (গুণাবলী) এবং সকল বিষয় যাহা হুজুরের মানবীয় জীবনের সহিত সম্পর্কিত, আর যাহা নবুওয়াতের মু'জেজা ইত্যাদি বিষয়ের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে, ঐ সকল বিষয়গুলি 'সীরাত' গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন, সীরাত-ই-ইবনে হিশাম' ও 'সীরাত-ই-হলবীয়া' প্রভৃতি সীরাত গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।

উক্ত বর্ণনা হইতে এই সত্যই প্রমাণিত হইল যে, মুহাদ্দেসীন ও ফকীহ্‌গণের দৃষ্টিতে 'সীরাত' বলিতে শুধু জেহাদ এবং তৎ সম্পর্কিত ঘটনাবলীকে বুঝানো হইয়াছে। এবং ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে 'সীরাত' বলিতে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্মকাল হইতে ওফাত পর্যন্ত সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত, উহা জেহাদ সম্পর্কিত হউক অথবা অন্য বিষয়ে হউক, হুজুরের পুত-পবিত্র জীবনের প্রত্যেক কিছুকে বুঝানো হইয়াছে।

## দেওবন্দ মাদ্‌রাসার সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

হযরত হাজী ছৈয়দ আবেদ হোছাইন সাহেব প্রথমে চারশত এক টাকা আট আনা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া 'দেওবন্দ মসজিদ, ছাত্তার' নামক জায়গায় দারুল



উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার উদ্বোধন করেন। প্রথমে তিনি মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষক ও অবৈতনিক মুহ্‌তামিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে তিনি মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেবকে মাদ্‌রাসার মুহ্‌তামিম পদে নিযুক্ত করিয়া হজ্ব করিবার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। হজ্ব সমাপনের পর তিনি আবার যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন মাদ্‌রাসার 'পরামর্শ কমিটির' অনুরোধে আবার মাদ্‌রাসার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহার পর মাদ্‌রাসার মধ্যে কিছু পারস্পরিক কোন্দল সৃষ্টি হওয়ার দরুন তিনি মুহ্‌তামিম পদে ইস্তফা দান করিলেন এবং হযরত মাখদুম (রাঃ) এর দরবার 'কলিয়ার' অভিমুখে গমন করিলেন। মাদ্‌রাসার পরামর্শ কমিটির লোকজন তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন এবং মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনার দায়িত্ব হইতে পৃথক না হওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন- "হুজুর! আপনি অন্য কাহাকেও পরিচালনার ভার সোপর্দ করে যান।" অবশেষে তিনি মুন্সী ফজল হক সাহেবকে মুহ্‌তামিম নিযুক্ত করিলেন, তিনি পরামর্শ কমিটির সদস্য হওয়াই মঞ্জুর করিলেন। ইহার পর তিনি আবার হজ্ব করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তারপর দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল এবং ইহা এতদূর প্রসার লাভ করিল যে, হযরত হাজী ছৈয়দ আবেদ হোছাইন সাহেবের হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্তও ইহা শেষ হইলনা। হাজী সাহেব দেওবন্দ পৌছিয়া সমস্ত অবস্থা পরিদর্শন করার পর মাদ্‌রাসার সকল প্রকার কাজ-কর্ম হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "এইখানে স্বার্থহীনতা এবং লিল্লাহিয়াত খতম হইয়া গিয়াছে, এখন স্বার্থপরতা ও নফছানীয়াত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কাজ-কর্মের সহিত ফকিরগণের কি সম্পর্ক!" ইহার ফলাফল বর্তমান জনসাধারণ হইতে গোপন নহে যে, ওহাবীগণ শির্ক ও বেদায়াত ইত্যাদির ফতোয়ার গোলা-বারুদের বৃষ্টি যেই ভাবে বর্ষণ করিতেছে, স্বয়ং দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা যিনি মিলাদ, কেয়াম, ওরশ ইত্যাদির অনুসারী ছিলেন, তিনিও ঐ ফতোয়া হইতে রেহাই পান নাই।

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হাজী ছৈয়দ আবেদ হোছাইন (রাঃ) এর জীবনী, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ও ভিত্তি এবং ঐ মাদরাসায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদি সকল বিষয়ে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আমি অন্য স্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করিব। এইখানে অধিক বর্ণনার অবকাশ নাই।

## ওরশের গোশ্‌ত ও ফাতেহাখানীর জিনিষ খাওয়া হারাম অথচ কাকের মাংস খাওয়া সম্পর্কে গাঙ্গুহী সাহেবের ফতোয়া

কোন কোন লোক ওরশে নবী এবং আউলিয়ায়ে কেরামের ওরশ শরীফে জবেহকৃত জন্তুর মাংস খাওয়া হারাম ও বেদায়াত বলিয়া থাকে। অধিকন্তু ফাতেহা পাঠকৃত দ্রব্যগুলি এবং শবে বরাত ইত্যাদিতে হালুয়া, রুটি প্রভৃতিকেও বেদায়াত ও নাজায়েয বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত খারাপ ধারণা। কেননা, যে জিনিসকে আল্লাহ্‌তাআলা হালাল করিয়াছেন, উহাকে হারাম মনে না করাই উচিত। আপনারা দেখুন, হালুয়া, রুটি ও গরু ছাগলের মাংস খাওয়া হালাল, এইগুলিকে হারাম বুঝিয়া লওয়া কতদূর সঠিক হইতে পারে? আল্লাহ ও রাসূলের হালালকৃত জিনিসগুলিকে নিজের পক্ষ হইতে জোরপূর্বক হারাম করিয়া লওয়া অন্যায়। অতঃপর লক্ষ্য করুন যে, ওহাবী মৌলভীগণের নিকট কাকের মাংস হালাল। কিন্তু ইহা সুন্নীগণের নিকট হারাম। আমাদের এই বিরোধী দলের লোকেরা মনে করিল যে, সুন্নীগণের দেখাদেখি কোথাও যেন আমাদের দলীয় লোকেরাও কাকের গোশ্‌তকে হারাম বুঝিয়া না বসে। তাই তাহারা তাহাদের মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের নিকট হইতে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ "যে স্থানে কাকের মাংসকে অধিক সংখ্যক লোক হারাম মনে করে এবং যাহারা উহার মাংস খায় তাহাদিগকে মন্দ বলিয়া থাকে, তবে সেই স্থানে কাকের মাংস খাওয়া সওয়াব হইবে, না গুনাহ্‌ হইবে?" ইহার উত্তরে মাওলানা সাহেব লিখিলেন– ثواب ہوگا جسکا جی چاہے (ছওয়াব হোগা জিছ্‌কা জি চাহে) "যাহার ইচ্ছা হয়, সে যদি উক্ত স্থানে কাকের মাংস খায়, তাহা হইলে সওয়াব হইবে।" (ফতোয়ায়ে রশীদীয়া)

উক্ত ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে জায়গায় ওহাবী লোকেরা ওরশের মাংস, ফাতেহা দেওয়া জিনিস এবং শবেবরাত ইত্যাদির হালুয়া রুটি প্রভৃতি খাওয়াকে হারাম ও বেদায়াত জানিয়া থাকে, সুতরাং ঐ জায়গায় কখনও সুন্নীগণও তাহাদের সহিত একাত্ম হইয়া হালাল জিনিসকে হারাম মনে করিয়া না বসে, এই ধারণা করিয়া সেইখানে ওরশ, ফাতেহা ইত্যাদির মাংস এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি খাওয়া একান্ত ছওয়াব।



দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, ওরশ, ফাতেহা ইত্যাদির মাংসও অন্যান্য দ্রব্যাদি কি কাকের মাংস খাওয়া হইতে নিকৃষ্ট? কাকের মাংস খাওয়া সওয়াব, আর ওরশ ও ফাতেহার মাংস খাওয়া হারাম বা গুনাহ, ইহা কিরূপ কথা? আর এই ওরশ ও ফাতেহার মাংস ইত্যাদি খাওয়ার মধ্যে কেন সওয়াব হইবে না? হইবে, নিশ্চয়ই সওয়াব হইবে।

যদি এই ভয়ে ওরশ ইত্যাদির মাংস খাওয়া হারাম ও বেদায়াত হইয়া থাকে যে, ওরশ ইত্যাদির দিনে মানুষ আবার উহাকে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া না বসে। তাই শুধু একদিনই উক্ত দ্রব্যাদি হারাম ও বেদায়াতে পরিণত হইয়া থাকে। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে এই ভয়ে যে, কোন দিন লোকে উহাকে সর্বদা হারাম বুঝিয়া না বসে, তাই মাঝে মাঝে ওরশের গোশ্‌ত খাওয়া এবং ওরশ পালন করা দরকার এবং ইহা সওয়াবে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন ওহাবীদের মতে কাকের মাংস খাওয়া সওয়াব।

হালাল জিনিসকে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া বসা তত খারাপ নহে। কেননা, উহাতে হালালই আছে। কিন্তু হালাল জিনিসকে কোন দিন হারাম মনে করা তো মহাপাপ। যে জিনিসকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলে করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হারাম করেন নাই, ঐগুলিকে কখনও হারাম মনে না করাই উচিত। যেমন, ফরজ নামাজের পর হাত উঠাইয়া মুনাজাত, তারাবীহ্‌ নামাজের পর মুনাজাত এবং ওরশ, কেয়াম, মীলাদ, ফাতেহার জিনিসগুলি খাওয়া প্রভৃতিকে বেদায়াত ও নাজায়েয মনে করিবে না।বরং সওয়াবের কাজ বলিয়া মনে করা উচিত। কারণ, যাহাতে সাধারণ মানুষ ঐগুলিকে হারাম বুঝিয়া না থাকে। যখন জায়েয ও মুস্তাহাব জিনিসগুলিকে হারামের মত ছাড়িয়া দেয়, তখন ঐগুলিকে আদায় করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যাহাতে সাধারণ লোকেরা ঐগুলিকে নাজায়েয বলিয়া মনে না করে। জায়েয ও মুস্তাহাব জিনিসগুলিকে ফরজ ও ওয়াজিবে পরিণত হইবার আশংকায় ছাড়িয়া দেওয়া, এই আশংকা হইতে উহা ত্যাগ করা আরও মারাত্মক গুনাহ। যেহেতু জায়েয ও মুস্তাহাব সব কিছু হালাল, আর হালাল বস্তুকে হারামের মত ছাড়িয়া দেওয়া বড় গুনাহ।

## আসল তাওহীদ পন্থী কে? আর কাফের ও ফাসেক কে?

কাহাকেও কাফের এবং ফাছেক বলিয়া অভিহিত করা আর তাহার সমালোচনা করা আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল্ জামায়াতের আলেমগণের অভ্যাসও নহে এবং এইরূপ কাজকে তাঁহারা জায়েয বলিয়াও মনে করেন না। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং আহ্‌লে কেবলা কোন লোককে কাফের বলা দুরস্থ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কারণ অনেক লোকে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পিছনে নামাজও পড়িয়াছে, আহ্‌লে কেবলা হইয়াছে, কলেমায়ে তাওহীদও পড়িয়াছে এবং তাওহীদে বিশ্বাসীও হইয়াছে, তবুও তাহাদিগকে মু'মিন বলা হয় নাই। কাফের ও মুনাফেক বলা হইয়াছে– তদ্রুপ হযরত ওছমান গনি (রাঃ) এর জামানা হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তাওহীদে বিশ্বাসী এবং আহ্‌লে কেবলা হওয়া সত্ত্বেও অনেক লোককে কাফের ও মুনাফেক বলা হইয়াছে। অথবা তাহাদের কুৎসা রটনা করা হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ইতিহাসগ্রন্থে এবং বড় বড় কিতাবে মওজুদ আছে। এই উম্মতে মুহাম্মদীর জাবরীয়া ও কদরীয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়কেও সমস্ত ওলামায়ে ইসলাম কাফের ও ফাছেক বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন, অথচ তাহারা তাওহীদে বিশ্বাসী এবং আহ্‌লে কেবলা ছিল। অতএব প্রমাণিত হইল যে, তাওহীদে বিশ্বাসী তো সকলেই, কিন্তু শুধুমাত্র ইহার দ্বারা কাজ হইবে না। বরং তাওহীদে বিশ্বাসী এবং আহ্‌লে কেবলা হওয়ার সাথে সাথে ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলিও লক্ষ্যণীয়। উহা তাওহীদ সম্পর্কিত হউক বা নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কিত হউক।

আসল কথা হইল এই, খোদার তাওহীদে অন্য কাহাকেও শরীক না করা, তাঁহার চিরন্তন সত্ত্বা ও গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাহাকেও সমতুল্য মনে না করা, তাঁহাকেই সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রকৃত খালেক, মালেক ও উপাস্য মনে করা, তাঁহার নির্দেশাবলী ও নিষেধাবলী সব কিছুকে মনে প্রাণে মানিয়া লওয়া এবং কার্যক্ষেত্রে উহা বাস্তবায়িত করা, আল্লাহ্ তাআলাকে সকল দোষ-ত্রুটি যেমন– "আল্লাহ্ মিথ্যা কথা বলিতে পারে, চুরি ব্যাভিচার ইত্যাদি করিতে পারে" এইরূপ নিন্দনীয় কাজ হইতে পাক-পবিত্র মনে করা এবং মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে খোদার রাসূল, খোদার বিশিষ্ট বান্দা



ও বিশিষ্ট বন্ধু মনে করা, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে মা'বুদ মনে না করা এবং আমাদের মত একজন মানুষও মনে না করা এবং তাঁহাকে আল্লাহ্ পাকের খাস্ মাখলুক বলিয়া স্বীকার করা এবং হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর আদেশ-নিষেধাবলী (جو متواتر ثابت هيں) মনে-প্রাণে এবং কার্যক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শানে এইরূপ কোন কথা না বলা যদ্দারা তাঁহার শানে বিন্দুমাত্র বেআদবী প্রমাণিত হয় এবং তাঁহার মানহানিকর কোন কথা না বলা, তাঁহার উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে যে কুরআন নাজিল হইয়াছে, উহা সত্য বলিয়া মনে করা ইত্যাদি উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখা এবং কার্যক্ষেত্রে উহার প্রতিফলনকে স্বীকার করিয়া লওয়াই আসল তাওহীদ পন্থী, তাওহীদে বিশ্বাসী ও আহ্‌লে কেবলার পরিচয়।

এইরূপ তাওহীদে বিশ্বাসী ও আহ্‌লে কেবলাকে যে ব্যক্তি কাফের বলিবে, সে নিজেই কাফের হইয়া যাইবে। তাওহীদে বিশ্বাস বলিতে খোদার খোদায়িত্ব ও নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর রিসালত সম্পর্কীয় যত কিছু আছে, সব কিছুকে অন্তরে বিশ্বাস করা বুঝায়। আর আহ্‌লে কেবলা বলিতে শরীয়তের আদেশ ও নিষেধাবলীকে অন্তরে বিশ্বাস ও কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা বুঝায়।

যদি ই'তিকাদ সম্পর্কীয় কোন একটি বিষয়ে ইন্‌কার বা অস্বীকৃতি পাওয়া যায়, অথবা শরীয়তের আদেশ-নিষেধাবলী হইতে কোন একটি বিষয়ে ইন্‌কার করে, যেমন– কোন এক ব্যক্তি অন্তরে কলেমায়ে তাওহীদকে মানিয়া থাকে, মুখে পড়িয়াও থাকে, নামাজ, জাকাত ও হজ্ব ইত্যাদিও পালন করিয়া থাকে, কিন্তু রোজাকে খোদার হুকুম ও ফরজ বলিয়া স্বীকার করেন না। অতঃপর রোজাও রাখে না। তবে কি তাহাকে কোন লোক মুসলমান বলিয়া ফতোয়া দিবে? তদ্রুপ কোন এক ব্যক্তি দিন-রাত সর্বদা খোদার বন্দেগীতে মশ্‌গুল থাকে, কিন্তু স্বইচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে নিজের মুখে এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে যদ্দারা খোদায়িত্বের শানে এবং রিসালতের শানে বে-আদবী ও অবমাননা প্রমাণিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি তাওহীদের বিশ্বাস হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। যদি কোন ব্যক্তি নবুওয়াতের শানে অবমাননাকর কোন কথা বলিয়া থাকে, তবে

সেই ব্যক্তি অবশ্যই কাফের হইয়া যাইবে। যেমন কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তাঁহার রচিত 'মা-লা-বুদ্দাহ্ মিন্হু' কিতাবে বলিয়াছেন।

এমনি যদি কেহ দ্বীনে ইসলামের জন্য প্রাণও দিয়া থাবে এবং ইসলামের খাতির ইল্মি খেদমতও করিয়া থাকে, কিন্তু সে তাওহীদ বা নবুওয়াতের শানে বে-আদবী ও অবমাননাকর দুই একটি উক্তি করিয়া থাকে, তবে সেই কাফের প্রমাণিত হইবে। মুখ ও কলম হইতে যেই শব্দ বাহির হইয়া থাকে, উহার উপরই ভিত্তি করিয়া শরীয়তের ফয়সালা জারী হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে হিন্দুস্থানের এলাহ্বাদ গরীবে নওয়াজ মাদ্রাসার মুহ্তামিম খতীবে মাশ্রিক্ব হযরত আল্লামা মুস্তাক আহমদ নেজামী ছাহেবের এক বিবৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে যে, "এক মুত্তাকী পরহেজগার, কোমল হৃদয়বান এবং খোশ-মেজাজী লোক যদি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া কাজী বা মুফ্তী সাহেবের সামনে গিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত নিজের সদ্ভাবের বক্তব্য রাখে, তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব লোকেরাও তাহার পক্ষে কাজীর দরবারে উপস্থিত হইয়া কাজী সাহেবের সুদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই কথাই প্রমাণিত করিতে চাহে যে, "হুজুর! আমরা আজ পর্যন্ত এই লোকটিকে রাগান্বিত হইতে দেখি নাই, সে অত্যন্ত ভদ্রলোক এবং তাহার দাম্পত্য জীবনে সে একজন সুখী, তাহার 'তালাক' কথাটির দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাহার অতীত দাম্পত্য জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্য তথা তাহার মধুময় জীবনের দিকে লক্ষ্য করা হউক, কেননা সে নিজে উপবাস থাকিয়া তাহার স্ত্রীকে খাওয়াইত এবং নিজে ছেঁড়া ও পুরাতন কাপড় পরিয়া তাহার স্ত্রীকে নূতন ও সুন্দর-সুন্দর কাপড় পরাইত। অধিকন্তু সে নিজে বিভিন্ন কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার স্ত্রীকে সুখে রাখিত। যদিও আজ ঘটনাক্রমে তাহার মুখ হইতে এই 'তালাক' কথাটি বাহির হইয়া গিয়াছে, তবে উহাতে কি আসে বা যায়? তাহার বিগত উজ্জ্বল ও প্রচ্ছন্ন সদ্ভাবের আয়নার মধ্যে তাহার ছবিটি দেখা যাইতে পারে। শুধুমাত্র 'তালাক' একটি শব্দের জন্য তাহার এই সুন্দর ছবিটির উপর ময়লা ছিটাইয়া দিবেন না।"



পাঠকবৃন্দ! আপনারা এখন সত্য করিয়া বলুন, তাহাদের এই লম্বা-চওড়া বিবৃতির দ্বারা কাজী সাহেব কি তাহার আইনের দড়ি ঢিলা করিয়া দিবেন? না, কখনও না, বরং কাজী সাহেব 'তালাক' কথাটির উপর ভিত্তি করিয়া যে কোন এক প্রকারের তালাকের হুকুম জারী করিয়া দিবেন।

এখন আসুন, উক্ত নীতি অনুসারে ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কোন লোক একটি নহে বরং হাজার হাজার বই-পুস্তক লিখিয়াছে এবং প্রকাশ্য ইসলামের খেদমতে নিজের সারা জীবন কাটাইয়াছে, কিন্তু যদি সে ইহার অন্তরালে রাসূল করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর অবমাননার মত মহাপাপে লিপ্ত হইয়া আইনের সড়ক অতিক্রম করিতে চাহে তবে আইন কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে না।

কিছু সংখ্যক মধ্যমপন্থী লোক বলিয়া থাকে তোমরা সুন্নী লোকগণ কম্বলের কেশ বাছিতে চাহিতেছ, শুধুমাত্র তোমরা দুই একটি শব্দ লইয়া টানাটানি করিতেছ। অথচ তাঁহারা (বাতেল ফেরকার মুরব্বীগণ) তো ইসলামের আরও অনেক খেদমত করিতেছে। তাঁহাদের এই খেদমতের দিকেও কিছুটা খেয়াল করা উচিত। যদিও তাঁহাদের মুখ বা কলম হইতে কানুনের খেলাফ কোন কথা বাহির হইয়া যায়, তবে উহা লইয়া পাকড়াও করা উচিত নহে। কারণ তাঁহাদের অন্তর ঠিক ও পরিষ্কার ছিল এবং তাঁহারা ইসলামের অনেক খেদমত করিতেছে, অনেক বই-পুস্তক লিখিতেছে।"

পাঠকবর্গ! যাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহারা একমুখে দুইরূপ কথা বলিয়া থাকে। যদি বর্তমানে খেলাফতের যুগ হইত, তবে আপনারা কাজীর বিচারালয়ে আগুন লাগাইয়া দিতেন এবং খলীফার দরবারের ইট খুলিয়া ফেলিতেন। যেহেতু কাজীসাহেব তাঁহার কাজী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার দায়িত্ব পালনে কাহারও কলিজা চিড়িয়া দেখেন না। আর কাহারও নিয়ত বা ইচ্ছা ও খেয়ালের দৃষ্টিতে তাঁহার ফয়সালা জারী করেন না। তিনি মুখের বা কলমের শব্দ লইয়া কম্বলের কেশ বাছিতে থাকেন এবং শব্দ বা বাক্যের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি শরীয়তের রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ কাহারও অন্তরে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বত আছে কি না, উহা তাহার অবস্থা ও কথা-বার্তার দ্বারা প্রমানিত হইয়া থাকে।

কথা অনেক দূর পর্যন্ত আগাইয়া গেল, আসল কথা হইল এই যে, ধর্মের শাখা-প্রশাখা ও আংশিক বিষয়ে যদি পরস্পর মতবিরোধ হইয়া থাকে, তবে উহার দ্বারা কাহাকেও কাফের ও ফাছেক বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ধর্মের মৌলিক বিষয়ে ও ই'তিকাদ সম্পর্কিত মাছআলা সম্পর্কে যদি কেহই একটি মাছআলাও ধর্মের বিপরীত কিছু বলিয়া থাকে বা লিখিয়া থাকে, তবে তাহাকে শরীয়তের হুকুম মোতাবেক কাফের বা ফাছেক বলা প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। কারণ, তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা পবিত্র শরীয়তে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ইহাই হইল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের আদর্শ তথা পবিত্র দায়িত্ব যে, তাঁহারা কোন ব্যক্তি হইতে যদি কোন কুফরী শব্দ পাওয়া যায়, তখন তাহাকে শরীয়তের কানুন অনুযায়ী কাফের ও ফাছেক বলিয়া থাকেন এবং তাহার সমালোচনা করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক কথায় কথায় শিরক ও বেদায়াতের ফতোয়া দেওয়া এবং সর্বদা মুখের উপর শিরক ও বেদায়াত জারী থাকা খারেজী সম্প্রদায়ের আলামত নহে তো, আর কি? কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে মূর্তি ও প্রতিমা সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা হইয়াছে এবং যেই আয়াতগুলি কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই সমস্ত আয়াত মুসলমানদের উপর বর্তাইয়া দেওয়া কি খারেজীদের কাজ নহে?

আপনারা কি দেখন নাই যে, সর্ব প্রথম খারেজীগণই হযরত ওসমান গণি (রাঃ) কে বেদায়াতের ফতোয়া দিয়াছিল এবং হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রাঃ) কে খারেজীরাই প্রথমে শিরক এর ফতোয়া দিয়াছিল। এখন আপনারা চোখ খুলিয়া দেখুন যে, বেদায়াত ও শিরক এর ফতোয়ার বাজার কোন সমাজের মধ্যে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে? আর কাহাদের কিতাব-পত্র বেদায়াত ও শিরক এর ফতোয়া দ্বারা পরিপূর্ণ? প্রত্যেক সৎকাজে বেদায়াত ও শিরক এর ফতোয়া কাহাদের পক্ষ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে? "বেদায়াত' ও শিরক' শব্দ দুইটি কাহাদের মুখে লাগিয়া আছে? মুসলমানদের প্রত্যেক সৎকাজকে বেদায়াত ও শিরক বলা শরীয়তের কানুন অনুযায়ী? না, শরীয়তের কানুন বিরোধী? তাহাদের কিতাব-পত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা হাতে লওয়ার সাথে সাথে প্রথমেই মুসলমানদের প্রত্যেক সৎকাজ সম্পর্কে বেদায়াত ও শিরক এর ফতোয়া নজরে পড়ে? লজ্জা-শরম কি কিছুই নাই?



কোন কবি সুন্দর বলিয়াছেন-

اپنے بھی خفا مجھسے ھیں بیگانے بھی ناخوش

میں زھر ھلاھل کو کبھی نہ کہ سکا قند

"আমার আপনজনও আমার উপর রাগান্বিত, বিরোধীগণও অসন্তুষ্ট। শুধুমাত্র আমার অপরাধ যে, আমি বিষকে মধু বলিতে পারিনাই।"

ভাইসব! খোদার খোদায়িত্বে, নিরালা তাওহীদে এবং আল্লাহর চিরন্তন সত্বায় অন্য কাহাকেও অংশীদার করা শিরক। আর আল্লাহর ইবাদতে ও তাঁহার চিরন্তন গুণাবলীতে অন্য কাহাকেও (ذاتی) অংশীদার করা শিরক। যাহা ছুনানে হুদা তথা নবীর ছুন্নাতের পরিপন্থী হইবে, উহাই বেদায়াতে ছাইয়্যা বা খারাপ বেদায়াত।

আপনারা যেইরূপ শিরক ও বেদায়াতের ফতোয়াবাজী করিতেছেন, সেইরূপ শিরক ও বেদায়াত হইতে আপনাদের আঁচলও রেহাই পাইতে পারেনা। আর বেদায়াতের জামা আপনাদের মাথা দিয়া প্রবেশ করিয়া আপনাদের পা পর্যন্ত ঢাকিয়া রহিয়াছে। মোটকথা যে, আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিগণের খেয়াল, চিন্তাধারা ও আকীদার বিরোধিতা যাহারাই করিবে, তাহারাই যেন শিরক ও বেদায়াতে ডুবিয়া আছে। এইরূপ অবস্থা শুধুমাত্র বেদনাদায়ক নহে, বরং ইসলামী বিশ্বের একতা ও সংহতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইহাকেই বলা হয়, "চোরে দারোগাকে বকাবকি করা।"

## আল্লাহ মিথ্যা কথা বলিতে পারেন কি না?

তাওহীদের আকীদাই হইল আমাদের মূল আকীদা। কিন্তু আমরা ঐ প্রকার তাওহীদের আকীদা বিরোধী ও মূলোৎপাটনকারী, যেই প্রকার তাওহীদের আকীদায় "আল্লাহ মিথ্যা কথা বলিতে পারেন" (নাউজুবিল্লাহ) বলিয়া বিশ্বাস রাখা যায়। যেমন কারী রশীদ আহমদ চাটগামী ছাহেব তাঁহার রচিত 'হাতেফ' নামক পুস্তিকায় (মুফতি ফয়েজ উল্লাহ, মুফ্তী আজিজুল হক, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা ইছমাইল ও মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ছাহেব যাহাদের নাম মুকে আনা আমার পক্ষে শোভা পায়না। তবুও কিছু করিবার

উপায় তো নই, তাঁহারা উক্ত 'হাতেফ' পুস্তিকায় দস্তখত সহকারে লেখকের ফতোয়া সত্য বলিয়া প্রমাণিত করেন। লিখিয়াছেন-

کذب کا امکان خدا کے واسطے تم مان لو

قادر مطلق ہے وہ ہر چیز پر تم جان لو

"হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ মিথ্যা কথা বলিতে পারে বলিয়া মানিয়া লও এবং তিনি সর্বশক্তিমান বলিয়া জানিয়া লও।" (হাতেফ, ১১ পৃষ্ঠা)

অথচ দরসে নেজামীর প্রাথমিক ছাত্রও জানে যে, আল্লাহ পাকের জ্বাত বা সত্বা ও গুণাবলী উভয়ই চিরন্তন। তাঁহার কোন ছিফত বা গুণ মুম্‌কিন বা সম্ভাব্য হইতেও পারেনা। কারণ মুম্‌কিন তো অচিরন্তনীয় বস্তুর গুণ বিশেষ। আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর সহিত ইম্‌কান বা সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে করাও ভুল। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ ঐ জ্বাতে ওয়াজেবুল্‌ ওয়াজুদ বা চিরন্তন সত্বাকে বলা হয়, যিনি সম্পূর্ণ উন্নততর গুণাবলীর অধিকারী। শরহে-তাহ্‌জীব নামক কিতাবের ছাত্রও এতটুকু জানে যে, আল্লাহ্‌ তায়ালার যতগুলি গুণাবলী আছে, উহা সম্পূর্ণ উন্নততর। আর মিথ্যা বলা একটি দোষণীয় তথা হীনতর গুণ। তাই আল্লাহ্‌ তায়ালার দিকে মিথ্যা সম্বন্ধ করা কখনও দুরস্থ হইতে পারেনা। দেওবন্দী গবেষণাগারের তাওহীদী আকীদা হইল "আল্লাহ মিথ্যা কথা বলিতে পারেন।" এইরূপ আকীদার উপর তাহারা মিথ্যা কথা বলিতে পারেন।" এইরূপ আকীদার উপর তাহারা খাঁটি তাওহীদ পন্থী বলিয়া গর্ববোধ করে। কোন কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন-

تمنا یوں سب کرتے ہیں کہ ہم حق گوہوں عادل ہوں

مگر دل کی طرفداری نہ کرنا سخت مشکل ہے

"সকলেই হক কথা বলিবার এবং ন্যায়বান হইবার জন্য কামনা করে, কিন্তু অন্তরের পক্ষপাতিত্ব না করাই হইল বড় মুশকিল।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান, ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি "আল্লাহ মিথ্যা কথা বলিতেপারে।" এইরূপ আকীদা মানিয়া লই, যেমন 'হাতেফ' পুস্তিকায় উহা মানিয়া লওয়ার জন্য আমাদিগকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে যে, যদি আমরা



আল্লাহর নিকট হইতে মিথ্যার সম্ভাব্যতাকে রহিত করিয়া থাকি, তবে আল্লাহপাক সর্বশক্তিমান থাকিবে না।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, যদি আল্লাহপাক সর্বশক্তিমানের অর্থ উহাই হয়, তবে ইহাও মানিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িবে যে, আল্লাহপাক জেনা ব্যবিচারের উপরও শক্তিমান, কিন্তু জেনা করেন না। জুলুম অত্যাচার ইত্যাদি কু-কর্মের উপরও শক্তিমান, কিন্তু করেন না। অন্য মা'বুদ ও খোদা সৃষ্টি করিতেও শক্তি রাখেন, কিন্তু করেন না। নাউজুবিল্লা, আল্লাহ পাককে এইরূপ সর্বশক্তিমান বলিয়া মানিতে আল্লাহর নিকট পানাহ্‌ চাহিতেছি। আর ঐরূপ তাওহীদি আকীদা পোষণকারী লোকগুলি হইতেও আমরা শতবার পানাহ্‌ মাগিতেছি। "আল্লাহ মিথ্যা কথা বলিতে পারে" এই মাছআলাটি দেওবন্দী গবেষণাগারের আলেমগণের অনেক কিতাবে মওজুদ আছে। উহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে। প্রয়োজন বশতঃ উহা জনসাধারণের সামনে পেশ করা হইবে।

## আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও ফেরকাবন্দী

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا.

"তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া খোদার রজ্জুকে শক্তভাবে ধরিয়া লও এবং তোমরা পৃথক পৃথক হইও না।" কুরআনের এই আয়াত হইতে কোন কোন লোক সুন্নীগণকে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, "তোমরা ফেরকাবন্দী হইও না এবং দলাদলি করিও না, বরং সকলে মিলিয়া-মিশিয়া খোদার রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধারিয়া থাক।" এই উপদেশবাণী তো চোরের মুখে ধর্মের কাহিনীর মত। কারণ যাহারা প্রকাশ্যে ফেরকাবন্দী বা দলাদলি হইতে বারণ করিতে দেখা যায়, তাহারা নিজেই কিছু সংখ্যক মানুষ লইয়া নতুন ফের্কা বা দল গঠন করিয়া বসিয়াছ। আবার মুখে বলিতেছে "তোমরা দলাদলি করিও না, আল্লাহতাআলা দলাদলি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" ইহা চোর গৃহস্থ সাজিবার কাহিনীর মত! যখন চোর বেটা চুরি করিতে থাকে, তখন গৃহস্থ ও অন্যান্য প্রতিবেশী লোকেরা 'চোর চোর' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। অন্ধকারের এই সুযোগে চোর বেটাও গৃহস্থের সহিত 'চোর-চোর' বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করে। আর ঐ চোর বেটার ভিতরে সেই গৃহস্থকে

চোর সাব্যস্ত করিবার চেষ্টাও চলিতে থাকে, যাহাতে তাহার চোরা মালের সমস্যাটি দূরীভূত হয় এবং গৃহস্থকে সুযোগ দেওয়া না হয়। ঠিক তদ্রুপ আমাদের এই ব্যাপারেও একই অবস্থা ঘটিতেছে। তাহারা কিছুদিন পূর্বে এক একটি নতুন ফের্কা বা দল সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ওহাবী, খারেজী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও ইহার পূর্বে গোপনে এই দলটির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু বর্তমান রূপ লইয়া এই দলটি দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তারপর কাদিয়ানী দল পরে মৌং ইলিয়াছ মেওয়াতী প্রতিষ্ঠিত 'তাবলীগ জামায়াত' এবং উহার কিছুদিন পর মৌং মাওদুদী প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলামী' বিভিন্ন নতুন নতুন ফেরকা ও দলের আবির্ভাব ঘটে। এই বাতেল ফেরকা ও দলগুলির লোকেরা প্রয়োজনবশতঃ কোন কোন সময়ে একত্রিতও হইয়া থাকে। তাহারা সকলে ঐক্যজোট গঠন করা সম্ভব। কেননা, বাতেল ফেরকার লোকেরা সকলেই মূলতঃ এক। কিন্তু আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকেরা না ঐ বাতেল ফেরকার লোকদের সহিত ঐক্যজোট গঠন করিতে পারে, না ঐ দলগুলিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে। যেহেতু বাস্তবিকপক্ষে এই একটি দলই জান্নাতী এবং অবশিষ্ট সব দলই দোযখী, যাহার বর্ণনা হাদীস শরীফে রহিয়াছে। আর এই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকেরা হইল পাক, পবিত্র এবং অন্যান্য সমস্ত ফেরকার লোকেরা হইল খবিছ বা নাপাক, অপবিত্র। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সমস্ত বাতেল ফেরকার লোকেরা একত্রিতও হইতে পারে, পৃথক পৃথকও হইতে পারে। কিন্তু আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা কখনও তাহাদের সহিত একত্রিত হইতে পারে না। আল্লাহ্‌পাক কুরআন মজীদে বলিয়াছেন–

حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"খবিছ বা নাপাক লোকেরা পাক-পবিত্র লোক হইতে পৃথক হইয়া থাকে।

আমাদের আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ইহা কোন নতুন দল নহে, বরং অন্যান্য ফের্কা ও দলের লোকেরা আমাদের দল হইতে পৃথক হইয়া নতুন জামায়াত ও দলভুক্ত হইয়াছে। দেখুন, অনেক লোক প্রথমে সুন্নী ছিল, পরে তাবলীগ জামায়াত অথবা মাওদুদী জামায়াত অনুসারী হইয়া গিয়াছে। অথবা অনেক লোকের বাপ-দাদা সুন্নী ছিলেন এবং খাঁটি তাওহীদপন্থী ও ঈমানদার



ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের বংশধর অর্থাৎ তাঁহাদের ছেলে-নাতি ইত্যাদি লোক পাক্কা ওহাবী বা গোলাপী ওহাবী হইয়া গিয়াছে। কোন কোন লোক ইমাম ও মাযহাব অমান্যকারী ওহাবী হইয়াছে আর কোন কোন লোক ইমাম ও মাযহাব অমান্যকারী ওহাবী হইয়াছে আর কোন কোন লোক আমল হিসাবে হানাফী মযহাবে মতাবলম্বী কিন্তু ই'তিকাদ ও বিশ্বাস হিসাবে খারেজী ওহাবী হইয়া গিয়াছে, আবার কেহই আমল হিসাবে হানাফী, কিন্তু আকীদা হিসাবে মু'তাজিলা মতাবলম্বী হইয়া গিয়াছে।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা এখন বিচার করুন, ফেরকাবন্দী ও দলাদলি কখন হইতে এবং কাহাদের পক্ষ হইতে শুরু হইয়াছে। প্রত্যেক ন্যায়বান লোক নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিবে। যাহারা বর্তমানে জোরগলায় 'ফেরকাবন্দী ও দলাদলি করিও না' বলিয়া চিৎকার করিতেছে, তাহাদের পক্ষ হইতেই ফেরকাবন্দী ও দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছে। আর এখন নাকি তাহারাই বলিতেছে 'দলাদলি করিও না'। ইহা এই কারণেই বলিতেছে, যেন জনসাধারণ তাহাদের দলে শামিল হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা তো এইরূপ করিতেছে না যে, 'চল আমরা দলাদলি ত্যাগ করিয়া সুন্নী লোকদের অনুসারী হইয়া যাই।'

আমরা সুন্নীগণ তাহাদের বাপ-দাদা যাহারা খাঁটি ঈমানদার ও পাক্কা মুসলমান ছিলেন, তাহাদেরই অনুসারী এবং তাহাদের বুজুর্গানে দ্বীন যেমন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রঃ) যিনি সমস্ত দেওবন্দীগণের পীর ছিলেন, তাঁহারই মতাবলম্বী। (হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রঃ) এর মতাদর্শ জানিতে চাহিলে 'শমায়েমে-ইমদাদীয়া' নামাক কিতাবটি গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করুন।) কিন্তু এই নতুন নতুন ফের্কা ও দলের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, "আমাদের বাপ-দাদাগণ গোমরাহ্‌ ও পথভ্রষ্ট ছিলেন, আমরা তাহাদের পরে এই পৃথিবীতে আসিয়া আসল হিদায়াতের রাস্তা পাইয়া বসিয়াছি। উক্ত দলের লোকেরা তাহাদের বাপ-দাদাকে 'গোমরাহ' বলিয়া দোযখী হওয়ার ফতোয়া তো প্রদান করিল এবং সাথে সাথে নিজেকে তাহাদের বাপ-দাদার মতাদর্শ হইতে আলাদা করিয়া নতুন দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এখন নাকি তাহারাই "তোমরা ফেরকাবন্দী হইও না এবং দলাদিল করিও না, পুরানা কথাগুলি ভুলিয়া যাও।' বলিয়া বিভিন্ন জায়গায় ঘুরা-ফিরা করিতেছে।

প্রিয় বন্দুগণ! আপনারা এখন ভাবিয়া দেখুন, ফের্‌কাবন্দী ও দলাদলি কাহারা করিয়াছে। আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও বুজুর্গানে দ্বীনের যে মতাদর্শ ছিল, উহা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

সকল পাক্কা ওহাবী বা গোলাপী ওহাবী লোকদের বাপ অথবা দাদা অথবা বাপ সুন্নী ছিলেন এবং সুন্নীদের একই মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু এই লোকেরা পরে তাহাদের বাপ-দাদার মতাদর্শের বিপরীত নতুন পথ অবলম্বন করিয়া লইয়াছে। এখন সকলে জানিয়া লইয়াছে যে, ফের্‌কাবন্দী ও দলাদলি কাহাদের পক্ষ হইতে শুরু হইয়াছে। শেষ কথা উহাই হইল যে, চোর গৃহস্থ সাজিতে চাহিতেছে।

বর্তমান জামানার অবস্থাও এইরূপ যে, পূর্ববর্তী জামানার সম্মানিত উচ্চ এবং বুনিয়াদী বংশের বংশের যে লোকেরা শাসক, নেতা ও ক্ষমতাশীল ছিলেন, তাঁহাদের অনেক প্রজা-রায়ত এবং অধিনস্থ লোকদের ক্ষমতা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বুনিয়াদী সম্মানিত ও আশ্‌রাফ ব্যক্তিগণ এককালে সকলের মুনিব এবং শাসক ছিলেন, এখন তাঁহারা তাঁহাদের প্রজা এবং গোলামদের অধীন ও চাকরে পরিণত হইতেছেন। শেষ কথা হইল-মুনিব গোলাম হইবে, আর গোলাম মুনিব হইবে। ইহাই হইল প্রাকৃতিক বিধানের চিরাচরিত নিয়ম।

হযরত রাসূলে (সঃ) ফরমাইয়াছেন-“শেষ জামানায় হক-পুরস্ত বা সৎ পথাবলম্বী মানুষের সংখ্যা খুবই কমিয়া যাইবে। তাহারা আর্থিক ও শারীরিক তথা সার্বিক দিক দিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে।”

ইহাও হাদীসে আসিয়াছে-হুজুরের উম্মত তিয়ত্তর দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে, সবই জাহান্নামী, শুধু একটি দলই জান্নাতী।

## আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণকে রেজাখানী বলা একটি অহেতুক অপবাদ

কোন কোন আলেম আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের উপর ‘রেজাখানী’ হওয়ার অপবাদ রটাইয়াছেন। ইহা নিছক কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেব না আমাদের



মুজ্‌তাহিদ, না আমরা তাঁহার মুকাল্লেদ। হাঁ, আমরা তাঁহাকে একজন মুহাক্কেক আলেম, পাক্কা ছহীহ্ আকীদা সম্পন্ন বুজুর্গ এবং সত্যকার একজন আশেকে রাছুল হিসাবে ধারণা করিয়া থাকি।

আমাদের বিরুদ্ধাচরণ কারীগণ তাহাদের মুরুব্বীগণের উদ্ধৃতি দিয়া সর্বদা যেইরূপ কথা-বার্তা বলিয়া থাকে এবং তাঁহাদের আঁচলকে নির্মল বলিয়া প্রকাশ করিতে যত্নবান হইয়া থাকে, তদ্বারা তাঁহাদের মুরব্বীগণ তাহাদের নবী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরাতো সেইরূপ কিছু করিনা। বরং মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের আকীদা মুতাকাদ্দেমীন আলেমগণ ও বুজুর্গানে দ্বীনের আকীদার সহিত একই রূপ হইয়া তাকে, যেমন হযরত শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহ্‌লভী, শাহ্ আবদুল আজিজ দেহ্‌লভী, মাওলানা আবদুল হালিম লকনৌভী, আল্লামা জালালুদ্দিন ছাইয়্যুতি, হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী, আল্লামা ফজলে হক, মাওলানা ফজলে রাছুল বাদায়ুনী ও মাওলানা আবদুল বারী ফেরেঙ্গী মহল্লী প্রমুখ বুজুর্গানে-দ্বীনের আকীদা যেইরূপ ছিল, মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের আকীদাও তদ্রুপ ছিল। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাঁহাকে মানিয়া থাকি। নতুবা তাঁহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি তাঁহার আকীদা মুতাকাদ্দেমীন আলেমগণ ও বুজুর্গানে-দ্বীনের আকীদার পরিপন্থী হইত, তবে আমরাও তাঁহাকে মানিতামনা। আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণকে ‘রেজাখানী বলিয়া আখ্যায়িত করা নিছক কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

## আ’লা হযরত শাহ্ আহমদ রেজা খান ছাহেব বর্তমান যুগের কলমের বাদশাহ্

আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে আমরা হানাফী মযহাবে মতাবলম্বী। ফিকাহের মাছয়ালা সমুহে ছাইয়্যেদুনা ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) ছাহেবই আমাদের ইমাম ও মুজতাহিদ। যেহেতু মাওলানা আহমদ রেজা ছাহেবের কিতাব সমুহে এইরূপ কোন বাক্য নাই, যদ্বারা তাঁহাকে পাকড়াও করা যাইতে পারে এবং যদ্বারা তাঁহার পদস্খলন হয়। তাই আমরা তাঁহাকে মানিয়া থাকি। অপর দিকে আমাদের বিরুদ্ধাচরণকারী আলেমগণের মুরব্বীদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের কিতাবগুলি হইতে হিন্দুস্থানের অনেক

মুহাক্কেক আলেমগণ তাঁহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছেন। তোমরা যতকিছু বল না কেন, অবশেষে দেওবন্দী আলেমগণকে ইহা স্বীকার করিয়াই লইতে হইয়াছে যে, এই ব্যক্তিই (মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেব) বর্তমান যুগের "কলমের বাদশাহ্।"

মহাশয়! বেরলীর আলেমগণ যেভাবে দেওবন্দী আলেমগণের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে পাকড়াও করিয়াছেন, সেইভাবে মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের কিতাব পত্র ও রচনাবলীর সমালোচনা করা এবং তাঁহার ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে পাকড়াও করা দেওবন্দী আলেমগণের উচিত। আর ইহার অধিকার তাহাদের সম্পূর্ণভাবে আছে। এই সমালোচনার অধিকার তাহাদের নিকট হইতে কেহই কাড়িয়া লইতে পারে না। কিন্তু সমালোচা করা উহা নিজের নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে হওয়া শর্ত সাপেক্ষ। যেই সমালোচনাকে মুহাক্কেক ও অভিজ্ঞ আলেমগণের পরিভাষায় সমালোচনা বলা যাইতে পারে। অন্যথায় উহা গোঁড়ামী বশতঃ মানহানিকর কথায় পরিগণিত হইবে। সমালোচনার ব্যাপারে ন্যায়-সংগত রীতিনীতিকে আমরা সরল অন্তরে স্বীকার করিয়া থাকি। ইহাতে দলীয় প্রতিবন্ধকতা অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারেনা।

মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেব সম্পর্কে অন্যান্য লোককে কি বলিব? আমাদের নিজের কাজের দুর্বলতাই আজ আমরা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইতেছি। কারণ আমাদের জামায়াতের প্রতিনিধি মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের ঐ সমস্ত কিতাব-পত্র, রচনাবলী ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এখনও আমরা পৃথিবীকে পরিচিত করাইতে পারি নাই, যেই সমস্ত রচনাবলী তাঁহাকে তাঁহার সময়কালীন আলেমগণ হইতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করিতেন এবং পরস্পরের মাঝে বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট রেখা টানিতেন। মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের অন্যান্য কিতাব-পত্র ও রচনাবলীর কি বর্ণনা দিব? শুধুমাত্র বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে যেসব ফতোয়া তাঁহার নিকট দৈনন্দিন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ঐ সব ফতোয়াকে একস্থানে জমা করা হইয়াছে, যাহা 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়া' নামে খ্যাত। এই কিতাবটি বড় সাইজের বার খণ্ডে রচিত। কিন্তু



পরিতাপের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত ঐ ফতোয়ার কিতাবটিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়নাই। বস্তুতঃ এত বড় একটি কিতাব ছাপানোও কোন সহজ কথা নহে। হিন্দুস্থানের মুবারকপুর হইতে উক্ত কিতাবের কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইন্শাআল্লাহ অদুর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ কিতাব প্রকাশিত হইতে পারে।

আবুল আলা মাওদুদী সাহেবও নিজেই হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের জ্ঞান-গভীরতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মাওদুদী সাহেব 'তারজুমানুল কুরআন' নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন-"মাওলানা আহমদ রেজা খান ফিকাহের মাছয়ালা সমুহে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, উহা প্রশংসনীয় এবং সেই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। আর ফতোয়া এবং ফিকার কিতাবে যেই সব মাছয়ালা বর্ণনা করা হয় নাই, তিনি ঐ সমস্ত মাছয়ালার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। বর্তমান যুগের যে সমস্ত মাছয়ালার সমাধান মহা সমস্যা হইয়া, দাঁড়ায়, উহার সমাধানের জন্য মাওলানা আহমদ রেজা খানের ফতোয়া যথেষ্ট। তাঁহার মত সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনা কেহই দেন নাই। যেই সব মাছয়ালায় মতানৈক্য রহিয়াছে, সেই মাছয়ালাগুলির মধ্যে তিনি সুন্দর ভাবে সমাঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্তমান যুগের মানুষের জন্য তাঁহার ফতোয়া অত্যন্ত মূল্যবান, অতঃপর জটিল মাছয়ালা সমুহের সমাধান তাঁহার ফতোয়া হইতে গ্রহণ করা উচিত।"

লক্ষ্য করুন, দেওবন্দী বড় বড় আলেমগণের বক্তব্য এই যে, মৌলভী আহমদ রেজা খান 'কলমের সম্রাট।'

বন্ধুগণ! সত্যকে সত্য বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মাওলানা আহমদ রেজা খানের কিতাব ও রচনাবলীর সংখ্যা সাড়ে এগার শত হইতে পারও বেশী। তাঁহার রচনাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা হিন্দুস্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠকবর্গ! মাওলানা আহমদ রেজা খানের কিতাবগুলি দেখিলে পাঠক সমাজের সম্মুখে এই চিত্রটি ভাসিয়া উঠে যে, তিনি কোন ধরণের অভিজ্ঞ ও মুহাক্কেক আলেম ছিলেন! ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ তাঁহাকে একজন অভিজ্ঞ ও মুহাক্কেক আলেম হিসাবে মানিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার মুকাল্লেদ নই। আমরা তো ইমাম

আজম আবু হানিফা (রাঃ) এর মুকাল্লেদ এবং তিনিই আমাদের ফিকাহের মাছয়ালা সমুহে মুজতাহিদ। অবশ্য আমরা মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবকে ধর্মীয় ব্যাপারে একজন অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি এবং মুজাদ্দেদে-দ্বীন বলিয়া মনে করি।

দেওবন্দী বড় বড় আলেমগণ মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের বিরোধিতা করা সত্বেও তাঁহারা এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "যতকিছু হউক না কেন, মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেব **'কলমের সম্রাট'** ছিলেন। তিনি যেই মাছয়ালার ব্যাপারে কলম ধারণ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তিনি কোন প্রকার তৃষ্ণার অবকাশ রাখেন নাই।"

কথা হইল এই যে, মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর 'হেফজুল-ঈমান' কিতাবের ঐ বাক্যটি যেকানে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালা চাল্লামের গায়েবী ইলম সমুহকে জানোয়ার, পাগল ও মজনুনের ইলমের সহিত তুলনা করা ইহয়াছে। এবঙ মাওলানা রসিদ আহমদ গাঙ্গুহীর 'ফতোয়ায়ে রসিদীয়া' কিতাবের ঐ কথাটি যেকানে "আল্লাহ্ মিথ্যা কতা বলিতে পারেন" উল্লেক রহিয়াছে এবং মাওলানা মুহাম্মদ কাছেম ছাহেবের 'তাহ্জিরুন্নাছ' নামক কিতাবের ঐ উক্তিটি যেখানে "খাতেমুন্নবীইন অর্থ আখেরুন্নবীইন নহে" বলা হইয়াছে, এইসব ব্যাপারে যখন মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেব তাঁহাদিগকে পাকড়াও করিলেন এবং তাঁহাদের উক্ত ভ্রান্ত আকীদার বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখিয়া মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ হইতে দস্তখত লইলেন, তখন উক্ত দেওবন্দী আলেমগণের মাথা খারাপ হইয়া গেল। আর তাঁহারা এবং তাঁহাদের অনুসারীগণ কথায় কথায় শির্ক ও বেদায়াতের গোলাবারুদ ছুড়িতে শুরু করিলেন। তাহারা মিলাদ শরীফ, কেয়াম, হুজুরের ইল্মে গায়েব, খত্মে নবুওয়াত, হুজুর (সঃ) কে সম্বোধন পদ দ্বারা ডাকা, বলা-মুছিবতে আউলিয়ায়ে কেরামের অছিলা লইয়া আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ফাতেহা ইত্যাদি কাজকে শুধু শির্ক ও বেদায়াত বলিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বরং সত্যকার খাঁটি মুসলমানগণকেও বেদায়াতী এবং মুশ্রিক বলিতে আরম্ভ করে। তাহাদের হঠকারীতা এতদুর পৌঁছিয়া গেল যে, মিলাদ, কেয়াম, ফাতেহা এবং ওরশ ইত্যাদি কাজে তাহাদের রূহানী পিতা বা দাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাঃ) এরও বিরোধিতা করিয়া বসিল।



অতঃপর তাহারা মুসলমানদের পুরানো ইসরামী আকীদা বিশ্বাসকে পরিবর্তন করিয়া নুতন ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

এই আগুন তো দেওবন্দী আলেমগণের দ্বারাই প্রজ্জলিত করা হইয়াছে। উহা নিভাইবার জন্য মাওলানা আহমদ রেজা খান যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। নতুবা মাওলানা আহমদ রেজা খান চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত আরব ও আযম দেশ হইতে আগত প্রশ্নাবলীর ফতোয়া স্বরূপ উত্তর দিতে ছিলেন, যাহা 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়া' নামে বার খণ্ডে রক্ষিত আছে। এই কিতাবের এক একটি খন্ডের সাইজ সাত/আটশত হইতেও অধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত। যাঁহারা এই কিতাব দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য এই ব্যাপারে অবগত আছেন। তদ্রূপ মাওলানা ছাহেব অন্যান্য কিতাবের হামিয়া এবং শরাহ্ ইত্যাদি লেখার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দেওবন্দী আলেমগণের দলভূক্ত করার প্রাথমিক কাজ এই যে, নবুওয়াতের শান এবং বেলায়াতের মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ-বিসর্জনকারী এবং নবী ও ওলীগণের ইশ্ক ও মুহাব্বতে পাগল লোকজন হইতে তাহাদের এই জন্মগত জজ্বা এবং আগ্রহ কাড়িয়া লওয়া হয়। আর তাহাদের উপর অযাচিত ভাবে কতগুলি দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া হয়। মিলাদ, কেয়াম, ওরশ, ফাতেহা, নজর-নেওয়াজ, ফাতেহায়ে এয়াজদাহম ও ফাতেহায়ে দোয়াজদাহম প্রভৃতি আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের রীতি-নীতি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে হইলে প্রথমে উহার জন্য বিবেক ও মানসিক আন্দোলন গড়িযা তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অতঃপর তাহারা উক্ত নির্ধারিত নীতি কাজে লাগাইবার জন্য শির্ক ও বেদায়াতের খারাবী এবং ভয়াবহ চিত্রের উপর গাদা-গাদা অনেক কিতাব-পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। আর ক্রমান্নয়ে মানুষের ধ্যান-ধারণায় এইভাবে প্রলেপ দিতে লাগিল, যেন শির্ক ও বেদায়াতের নাম কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তাহারা ঘৃণা বোধ করিতে থাকে।

ইহাতে উভয় পক্ষের সর্বসম্মত কথা যে, ইসলামী শরীয়াতে শির্ক মহাপাপ, এমন কি মুশ্রিকের গুণাহ ক্ষমা উপযোগীও নহে। আর বেদায়াতে ছাইয়্যা বা খারাপ বেদায়াত তো সরাসরি গোমরাহী তথা জাহান্নামে প্রবেশকারী একটি রাস্তা বিশেষ।

ইহা এমন একটি মাছয়ালা, যেখানে কোনই দ্বিমত নাই সুতরাং দেওবন্দী আলেমগণ শির্ক ও বেদায়াতের অর্থ বুঝাবুঝির মধ্যে তাহাদের মুখ ও কলমের সম্পূর্ণ শক্তি খরচ করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদের সাহিত্যের মূল লক্ষ্য উহাই স্থির করিলেন, যাহাতে তাহাদের করণীয় বিষয় বস্তু এবং আপন ঘর শির্ক ও বেদায়াতের তারিফ বা সংজ্ঞা হইতে অনেক দূরে থাকে। যখন তাহারা এই ব্যাপারে নিজেকে লক্ষ্যস্থিত বলিয়া মনে করিল এবং ঐ নির্ধারিত নীতি জন-সম্মুখে পেশ করিতে সমর্থ হইল, তখনই তাহারা ফতোয়া দিতে আরম্ভ করিল-"মাজারে যাওয়া শির্ক, মিলাদ বেদায়াত, কেয়ামে-মিলাদ শির্ক" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা জ্ঞানী বলিয়া দাবী সত্বেও শরীয়াত ও জ্ঞান-সাপেক্ষ এমন একটি খেয়ানত, যাহাকে পৃথিবীর কোন ন্যায়বান লোকে ক্ষমা করিতে পারিবেনা যে, কথায় কথায় শির্ক ও বেদায়াতের ফতোয়া দিয়া তাহারা নিজেই ঐ শির্ক ও বেদায়াতের ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল।

পরিশেষে তাহারা  ঐ নীতির মধ্যে সামর্থ লাভ করার পর আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের রীতি-নীতিকে শির্ক ও বেদায়াত হিসাবে চিহ্নিত করিতে লাগিল, যাহাতে শির্ক ও বেদায়াতের নাম শুনা মাত্রই জনসাধারণের অন্তর কাঁপিয়া উঠে। এখন আর এই কথা বলার অবকাশ রহিলনা যে, শির্ক ও বেদায়াত গুণাহ্ কি না? কারণ, ইহা তো প্রথমেই মানুষের অন্তরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শির্ক ও বেদায়াত পাপই পাপ, গুনাহ্ই গুনাহ্। বরং এখন বিতর্ক চলিতেছে- যে সমস্ত কাজকে শির্ক ও বেদায়াত বলা হইতেছে বাস্তবিক পক্ষে উহা শির্ক ও বেদায়াত কিনা? এবং যাহাকে বেদায়াতে ছাইয়্যা বলা হইতেছে প্রকৃতপক্ষে উহা বেদায়াতে ছাইয়্যা বলা যাইবে, না বেদায়াতে হাসানা (ভাল বেদায়াত)? এখন কথার স্রোত কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, উহা চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এইরূপ জঘন্য আক্রমণের প্রতিরোধে মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেব যেই অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পদ্ধতিতে কিতাব-পত্র রচনা করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলেই প্রমাণিত হয়। 'বেহেশ্তী জেওর' এবং 'ফতোয়ায়ে রশিদীয়া' কিতাবগুলির যেইরূপ প্রচার করা যাইতেছে, তদ্রূপ প্রচার করার কোন



আবশ্যক নাই। 'বেহেশ্তী জেওর' কিতাবটি প্রচাররের জন্য অনেক চেষ্টা চলিতেছে, এমনকি মক্কা শরীফেও প্রচার করা হইয়া থাকে।

মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের সাগ্রেদ মাওলানা আমজাদ আলী ছাহেবের কিতাব 'বাহারে শরীয়ত' যাহা সতর খন্ডে লিখিত, এই কিতাবরের সহিত 'বেহেশ্তী জেওর কিতাবের কি কোন প্রকার তুলনা হইতে পারে? আমি আপনাদের মৌখিক আদালতের ফয়সালা চাহিতেছি। শুধু ইহা নহে যে, মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের সাগরেদ আমাওলানা আমজদ আলী ছাহেবের কিতাব 'বাহারে শরীয়ত' এর সহিত তুলনা করা হউক। বরং মুলানা আমজদ আলী ছাহেরব সাগরেদ ইমামুল-মান্তিক ওয়াল-ফাল্সাফা বর্তমন যুগের ফকীহ্ হিন্দুস্থান টান্ডা গ্রামের মান্জারে হক মাদ্রাসার ছদরুল মুদার্‌রেছীন হযরত মাওলানা কাজী শামছুদ্দীন ছাহেরব 'কানুনে শরীয়ত' নামক কিতাবের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারেনা।

মহাশয়! 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়া' 'বাহারে শরীয়ত' 'আহকামে শরীয়ত' ও 'কানুনে শরীয়ত' কিতাবগুলির একটি লাইনে আপনি দৃষ্টি বুলাইয়া নিন, সমস্ত ফতোয়া বরাত ও উদ্ধৃতির জিঞ্জিরে আবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। অপরদিকে 'বেহেশ্তী জেওর' এবং 'ফতোয়ায়ে রসিদীয়া' কিতাবগুলির আসল কপিতে কোথাও অন্য কোন কিতাবের বরাত বা উদ্ধৃতির নাম-গন্ধও পাওয়া যাইবেনা।

পরিতাপের বিষয় যে, আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল্ জামায়াতের ঐ সমস্ত কিতাবগুলি প্রচার ও প্রকাশ করিবার সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করা হইতেছেনা। যদ্বারা ঐ কিতাবগুলি জসসাধারণের সহজলভ্য হয়। তদ্রূপ ওলামায়ে আহ্‌লে ছুন্নাতের আরও অন্রান্য রচনাবলী যেমন তফ্সীর-হাদীসের শরাহ, ফিকাহ ইত্যাদি কিতাবেরও একই অবস্থা। ছদরুল্ ওলামা ও আন্দরকোট ইছলামিয়া মাদ্রাসার ছদরুল্ মোদার্‌রেছীন হযরত মাওলানা ছৈয়দ গোলাম জিলানী ছাহেব তাঁহার রচিত 'বশিরুল্ ক্বারী ফি-শর্‌হিল্ বুখারী' এবং 'বশিরুল্ কামেল ফি-শর্‌হে শর্‌হে মিয়াতু আমেল্' নামক কিতাবগুলির ভূমিকায় দেওবন্দী আলেমগণের হাদীস ও আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যেইরূপ পাকড়াও করিয়াছেন, উক্ত কিতাবগুলি প্রকাশিত হইলে তাহাও প্রকাশ পাইয়া

যাইত এবং পৃথিবী এই সত্য জানিয়া লইত যে, কাহাদের জ্ঞান গভীরতা কতটুকু ছিল! কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, উক্ত কিতাবগুলি প্রকাশিত না হওয়ার দরুণ এখনও এই সত্য প্রকাশ পায় নাই। হযরত মাওলানা জ ফরউদ্দিন বিহারী ছাহেবের 'ছহীহুল্ বিহারী ফি শরহিল্ বুখারী' এবং হযরত মুফ্তি আহমদ এয়ার খান ছাহেবের 'নয়ীমুল্ বারী ফি- শরহিল্ বুখারী কিতাবগুলিও উল্লেখযোগ্য।

মোট কথা যে, দরসে নেজামী এবং উহার সম্পর্কিত অগণিত কিতাবে মাওলানা আহমদ রেজা খান অথবা তাঁহার ছাত্রগণের লিখিত হাশিয়া এবং শরাহ্গুলি এখনও ঝকমক করিতেছে। দুঃখের বিষয় যে, এই কিতাবগুলি ছাপানোর কোন সুব্যবস্থা না হওয়ার দরুণ আরব ও আজম দেশের লাইব্রেরী গুলিতে উহা পাওয়া যাইতেছে না। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে 'আস্তানায়ে রেজভীয়া'তে গিয়া দেখিতে পারেন।

আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণকে 'রেজাখানী বলিয়া সম্বোধন করা কোন দুর্নামের কথা নহে। কারণ, হিন্দুস্তানের অনেক বড় বড় মাওলানা যাঁহাদের গুণ-জ্ঞান সম্পর্কে পৃথিবী ভালরূপে অবগত আছে, তাঁহারা সকলেই উক্ত রেজাখানী বাগানের ফুল চয়নকারী ছিলেন। যেমন মাওলানা আমজাদ আলী ছাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ নীয়মুদ্দিন মুরাদাবাদী ছাহেব, বুখারী শলীফের শরাহ্ রচয়িতা হিন্দুস্তানের মুহাদ্দেছে আজম হযরত মাওলানা জফরুদ্দিন বিহারী ছাহেব, মাওলানা আবদুল আলিম ছিদ্দিকী মুহাজেরে মদনী ছাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ হাশত আলী লক্নৌভী ছাহেব প্রমুখ হিন্দুস্তানের বড় বড় আলেমগণ 'রেজাখানী' ঝরণার পানি দ্বারা জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন।

কোন কোন আলেম মুনাজেরা বা বিতর্ক এবং পাকড়াও করিবার ভূমিকায় জুয়াখেলার পদ্ধতিতে 'নাগমাতুর-রূহ্' প্রভৃতি কিতাবের কতগুলি কবিতা মুকাবিলা স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। আর 'নাগমাতুর-রূহ' নামক কিতাবটি হযরত আল্লামা হাশমত আলী লক্নৌভী ছাহেবের লিখিত বলিয়া প্রচার কনের, কিন্তু উক্ত কিতাবটি কাহার লিখিত? আমি ইহা তাহাদিগকে অবগত করাইয়া দেওয়ার জন্য বলিতেছি, শুনুন-



'গুণ্ডল' কাটিয়ারের একটি শহর। তথাকার অধিবাসী ছিলেন মায়মন হাজী আবদুচ্ছত্তার ঈসমাইল কাদেরী রেজভী ছাহেব। এই লোকটি না কোন আলেম ছিলেন, না মুফ্তী, না মুহাদ্দেছ, না মুফাচ্ছের আর না মুনাজের বা তর্ক-বিতর্ককারী। বরং তিনি মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের একজন মুরীদ ছিলেন। উক্ত 'নাগমাতুর-রূহ্' কিতাবটি এই মায়মন হাজী আবদুচ্ছত্তার ঈসমাইল সাহেবের লিখিত। তিনি মাওলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের একজন পাক্কা ভক্ত মুরীদ ছিলেন। উক্ত কিতাবে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, উহার জন্য আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল্ জামায়াতের আলেমগণ দায়ী নহে। কারণ, এইরূপ লোক না ছুন্নীয়তের স্তম্ভ, আর না তাঁহার কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্ম আমাদের ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ হইতে পারে। সুতরাং উক্ত কিতাবের কবিতাগুলিকে সত্য ও বাস্তব মনে করা এই ব্যাপারে কোন প্রকার তর্ক বিতর্ক আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

## গাঙ্গুহীর মৃত্যু শোকের তাৎপর্য বর্ণনা

পাঠকবৃন্দ! এখন আসুন, আমরা মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর মৃত্যুশোকের কবিতা এবং মাওলানা মোঃ কাছেম ছাহেবের কছীদাগুলি একটু পাঠ করিয়া দেখি। আর যদি আপনাদের বুকে সাহস থাকে, তবে ইহা ঘোষনা করিয়া দিন যে- "মাওলানা মাহ্মুদুল হাসান সাহেব যিনি গাঙ্গুহীর মৃত্যুশোকের কবিতা রচনা করিয়াছেন এই মাওলানা সাহেব-না আলেম, না মুহাদ্দেছ, আর না মুফাচ্ছের, বরং তিনি একজন সাধরণ মুর্খ লোক ছিলেন।" আপনারা কখনও ইহা প্রচার করিয়া দিতে পারিবেন না। বিশ্বাস করুণ, আপনাদের ইহা প্রচার করিয়া দেওয়ার পরও যাহা কিছু গাঙ্গুহীর মৃত্যুশোকের কবিতায় রহিয়াছে, আমরা উহা হইতে আমাদের ঐ মৌলিক দাবীগুলি প্রত্যাহার করিব, যাহা কোন জামায়াতের দায়িত্বের খাতির করা হইয়া থাকে।

আর ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, গাঙ্গুহীর মৃত্যুশোকের কবিতাটির লেখক হইল দেওবন্দ মাদ্‌রাসার ছদর বা সভাপতি। আর 'নাগ্‌মাতুর-রূহ' কিতাবটির লেখক হইল একজন সওদাগর। যিনি না কোন আলেম ছিলেন, না কোন মুফতী। আপনারা ইহার ফয়সালা করিয়া নিন যে, একদিকে একজন সওদাগর ও ব্যবসায়ীর লিখিত কবিতা, আর উহার বিপরীত দিকে দেওবন্দ

মাদ্‌রাসার ছদর সাহেবের লিখিত কবিতা! এই পরস্পর মুকাবিলার মধ্যে তো আপনারা নিজেও আপনাদের মুরুব্বীগণের কবরের মাটি না পাক করিয়া ফেলিলেন এবং পেরেশানী ও চিন্তায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাইয়া নিজের ইজ্জত-সম্মান হারাইয়া ফেলিলেন। যখন কথা আসিয়াই গেল, তবে শাইখুল্ হিন্দ মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান (সাবেক ছদরে দেওবন্দ) সাহেবের লিখিত গাঙ্গুহীর মৃত্যুশোকের কবিতা হইতে কয়েকটি লাইন আপনাদের মনকে উল্লাসিত করিবার জন্য মেহ্‌মানদারী হিসাবে পেশ করা যাক্। শুনুন-

حوائج دین ودنیا کے کہاں لے جائیں یارب

گیا وہ قبلہ حاجات روحانی وجسمانی

এই লাইন দুইটিতে ছদরে দেওবন্দ মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান ছাহেব বলিতেছেন যে, তাঁহার পীর মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাহেব দ্বীন-দুনিয়ার হাজত রওয়া ছিলেন, তাঁহার হাজত পুরা করিবার জন্য 'খান্‌কাহে-গাঙ্গুহ্' বেশ যথেষ্ট।

پھریں تھے کعبہ میں زبھی پوچھتے گنگوہ کا راستہ

جو رکھتے اپنے سینہ میں ذوق وشوق عرفانی

অর্থাৎ- 'কা'বা শরীফে গিয়াও ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞসা করে, "গাঙ্গুহের রাস্তা কোন দিকে?"

দেখুন, মাওলানা সাহেবের না কা'বার তাওয়াফের মধ্যে প্রাণ বসিয়াছে, আর না মদীনা শরীফে যাইতে প্রাণে চাহিয়াছে। খোদার ঘরে পৌছিয়া শুধু মাত্র 'হায় গাঙ্গুহ্! হায় গাঙ্গুহ্! শব্দের চিৎকার ছিল। আহা! খোদার মারফতের স্বাদ বুঝিবার কিরূপ ঢং!

مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نه دیا

اس وسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم

এই লাইন দুইটিতে বলা হইয়াছে- "হযরত ঈসা (আঃ) শুধু মৃত ব্যক্তিকে জ



ীবিত করিতেন, কিন্তু আমাদের পীর গাঙ্গুহী ছাহেবের মধ্যে দুইটি গুণই ছিল যে, তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতেন এবং জীবিত ব্যক্তিকে মরিতে দিতেন না।"

আর তিনি যে নিজেই মরিয়া গিয়াছেন এবং মরিয়া মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, ইহা অন্য কথা।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা খেয়াল করুন, মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান সাহেবের পীর গাঙ্গুহী সাহেব যখন জীবিত মানুষকে মরিতে দেন নাই, তবে মৃতকে জীবিত করার প্রশ্নই কবে উঠে? কারণ, মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখনই জীবিত করা যাইতে পারে। আর যখন তিনি মরিতেও দেন নাই, তখন কাহাকে জীবিত করা যাইতেছে? উক্ত কবিতার শেষোক্ত লাইনে হযরত ঈসা (আঃ) এর নবুওয়াতের সরাসরি ভাবে অবমাননা করা হইয়াছে। ইহাতো অবশ্যই পাকড়াও করিবার বিষয়।

تمھاری تربت انور کو دے کوہ طور سے تشبیه

کھوں ھوں بار بار ارنی مری دیکھی بھی نادانی

এই দুইটি লাইনে মাওলানা সাহেব তাঁহার পীর গাঙ্গুহী সাহেবের কবরকে 'তূর পাহাড়' এবং নিজেকে 'মুছা' বলিয়াছেন এবং গাঙ্গুহী ছাহেবকে 'রব' (খোদা) বলিয়াছেন আর সেই 'তুর পাহাড়ে' দাঁড়াইয়া 'আরেনি' (হে খোদা! তুমি আমাকে দেখা দাও) বলিয়া ফুকারিতেছিল।

## মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী তাহার পীর গাঙ্গুহী সাহেবকে খোদা বলিয়াছেন

'নাগমাতুর-রূহ' কিতাবের কথার উপর ভিত্তি করিয়া যাহারা কোমরে গামছা বাঁধিয়া "কে মোকাবিলা করিবে?" বলিয়া শব্দ তুলিয়াছিল, তাহারা গাঙ্গুহের এই খোদাকে দেখিয়াছে কিনা? যাহা কবরে লুকাইয়া রহিয়াছে।

زباں پر اهل اهوا کی هے کیوں اعل هبل شاید

اُٹھا عالم سے کوئی بانئی اسلام کا ثانی

সকলেই জানে যে, ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহপাক অথবা মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। কিন্তু এই কিতাবে বলা হইয়াছে যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার দ্বিতীয় ব্যক্তি গাঙ্গুহী ছাহেব খোদার দ্বিতীয় ছিলেন। অর্থাৎ প্রথম খোদা হইল স্বয়ং আল্লাপাক, আর দ্বিতীয় খোদা হইল গাঙ্গুহী ছাহেব।

قبر سے اٹھا کے پکاروں جو شید وقاسم

بوسه دیی لب کو مرے مالك ورضواں دونوں

অর্থাৎ- "আমি যখন কবর হইতে উঠিয়া 'ইয়া রশিদ! ইয়া কাছেম!' বলিয়া ডাকিতে থাকিব, তখন দোজখের দারোয়ান 'মালেক' এবং বেহেশ্‌তের দারোয়ান 'রিদওয়ান' উভয়ে আমার ঠোঁটে চুম্বন দিবে।"

পাঠকবৃন্দ! আপনারা লক্ষ করুন, ছদরে দেওবন্দ মাওলানা সাহেব কবর হইতে উঠিয়া 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাছুল ' বলিয়া ডাকিবেনা। বরং 'ইয়া রশিদ, ইয়া কাছেম' শব্দের শ্লোগান তুলিবে। ইহাকেই বলা হয় দেওবন্দের খাঁটি তাওহীদ! হাতীর দাঁত দেখানোর জন্যও এবং চিবাইবার জন্যও, কেমন, তাইনা? আর "ইয়া রাছুলাল্লাহ, ইয়া গাউছ, ইয়া খাজা" যাহারা বলিয়া থাকে, তাহাদের উপর শিরক ও বেদায়াতের ফতোয়া এবং 'ইয়া রশিদ, ইয়া কাছেম' যাহারা বলিয়া থাকে তাহাদের উপর পাক্কা তাওহীদ পন্থীর ফতোয়া।

بن گئے ان کے تصدق سے مقام محمود

کیوں نہ نانوتہ وگنگوہ ہوں نازاں دونوں

অর্থাৎ- "মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং মাওলানা মুহাম্মদ কাছেম নানুতবীর বুজুর্গী দ্বারা 'গাঙ্গুহ' এবং নানুতা' উভয় জায়গা 'মকামে মাহমুদ' এ পরিণত হইয়াছে।"

কুরআন শরীফে তো 'মকামে মাহ্‌মুদ' অর্থাৎ প্রশংসিত জায়গাটি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জন্য খাছ বলা হইয়াছে। কিন্তু ছদরে দেওবন্দ মাওলানা ছাহেব 'গাঙ্গুহ' এবং নানুতা জায়গা দুইটকে 'মকামে মাহ্‌মুদ' বলিয়াছেন। ইহাকেই বলা হয় 'সম্রাটের মুকুট চামারের মাথায় রাখা।'



এইরূপ যদি আমরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের মুরুব্বীগণের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট অবস্তাগুলি বর্ণনা করিতে থাকি, তবে ইহা বড় বড় সাইজের গ্রন্থেও সংকুলান হইবে না। কিন্তু আমরা কাহারও বিশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করিতে চাহিনা। আর ইহা আমাদের অভ্যাসও নহে বরং এইরূপ কাজতো জুয়া খেলার চাল সৃষ্টি করা, যেমন আমাদের বিরুদ্ধাচারণকারীগণ করিয়াছে। আমরা মাওলানা গাঙ্গুহীর মৃত্যু শোকের কবিতা হইতে কয়েকটি লাইন এইখানে এই জন্যই লিপিবদ্ধ করিয়াছি- 'নাগমাতুর রূহ' নামক কিতাবের উপর আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানাগণের দৃষ্টি তো পড়িয়াছে, 'মরছিয়াযে গাঙ্গুহী ও 'কছায়েদ ই-কাছেমী' প্রভৃতি কিতাবের কবিতার দিকেও তাঁহারা সামান্য দৃষ্টিপাত করুক, যেন এই কিতাব দুইটি ভালভাবে দেখিয়া নেন এবং নিজের ঘরের খবর সম্পর্কেও অবগত হইয়া যান। নতুবা আমরা কাহারও ব্যক্তিগত কাজ এবং কাহারও জজবা ও ভাব-গতি লইয়া পাকড়াও করিনা। কারণ, এই ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রীতিনীতি কোন দলের জন্য দলিল প্রমাণ হইতে পারেনা। যদি আমরা এইরূপ কাজ করি, তবে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের মুরুব্বীগণের অনেক গোবর ফাঁস হইয়া পড়িবে।

আমাদের আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ তো ঐ কথা লইয়া পাকড়াও করিয়া থাকেন, যাহা জামায়াত বা দলীয় নীতির সহিত সম্পর্কিত এবং জনসাধারণের উপর যেই কথার প্রভাব পড়িয়া থাকে, আর যাহা ঐক্যমতের পরিপন্থী হইয়া থাকে।

আর আমাদের আলেমগণ আকীদা বিশ্বাসকে হেফাজত করিতে অত্যন্ত দৃঢ় তার সহিত কাজ করিয়া থকেন। যেহেতু ফরজ ইবাদত পালন হইতেও আকীদা বিশ্বাসকে হেফাজত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নামাজ-রোজা ইত্যাদি পূন্যকাজ দুরস্ত হওয়া এবং ইহার ছওয়াব হাসেল করা ছহীহ আকীদার উপরই নির্ভরশীল। যেমন একজন অমুসলমান হাত-মুখ ধুইল, কুলি করিল, নাকে পানি দিল, মাথা মোসহ করিল এবং চুল গিরা পর্যন্ত পা ধৌত করিল, তবে কি ইহাকে আপনারা 'অজু' বলিবেন? না শুধু হাত-মুখ ধোয়া বলিবেন? ইহাতে বুঝা যায় যে, অজুর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা প্রকাশ্যে অজুর সকল আরকান ও আহকাম পালন করিলেও উহাকে অজু বলা হইবেনা। ঈমান ও আকায়েদের এই দর্শনই মাওলানা আহমদ রেজা খান

ছাহেব বর্ণনা করিয়াছিলেন। যেমন কবরের মধ্যে মুনকির-নকির দুই ফেরেস্তার প্রশ্নাবলী নামাজ-রোজা সম্পর্কিত হইবে না, বরং শেষ প্রশ্নতো ইহাই হইবে- জনাবে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়া ছাল্লামকে চিন কিনা? যে ব্যক্তি তাঁহাকে এই পৃথিবীতে চিনিয়াছে, সে কবরে 'হাজা নবীইউনা' (ইনি আমার নবী) বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিবে। আর যে ব্যক্তি নবীকে নিজের মত মানুষ বলিয়া মনে করিয়াছে, সে 'লা-আদ্‌রী' (আমি কিছু জানিনা) বলিয়া অন্য জনের নাম লইয়া ডাকিতে থাকিবে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তাবলীগ জামায়াতের মাওলানা আবদুর রহিম রচিত 'উসূলে দাওয়াত ওয়াত্-তাবলীগ' নামক কিতাবেও আছে-ছহীহ্ আকীদার উপর নাজাত বা খোদার শাস্তি হইতে পরিত্রাণ নির্ভরশীল, আমল অর্থাৎ নামাজ, রোজা ইত্যাদি পূণ্য কাজের উপর নাজাত পাওয়া নির্ভর করেনা।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোক তাঁহাদিগকে বলা হয়, যাঁহাদের আকীদা দুরস্ত হইবে। নতুবা যদি শুধুমাত্রও আমলের নাম ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত হইত, তবে জবরীয়া, কদরীয়া, রাফেজী, খারেজী, শিয়া এবং মুরজীয়া প্রভৃতি দলের লোককে আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত হইতে খারেজ বলিয়া কখনও মনে করা হইত না। কারণ, এইসব দলের লোকদের মধ্যে আমলের কোন ত্রুটি নাই। বরং তাহাদের আকীদা বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদিগকে আহ্‌লে ছুন্নাত হইতে খারিজ করা হইয়াছে। উল্লেখিত দলগুলির কোন কোন লোক তো আমল হিসাবে অনেক কিছু বলিয়া ধারণা হয়, এতদসত্বেও তাহাদিগকে আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত হইতে খারিজ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জমায়াতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হইতে গেলে তাহার আকীদা দুরস্ত হওয়া আবশ্যক। এই কারণে ফিকাহের কিতাবগুলি যেমন 'জামেউর্ রমুজ' প্রভৃতি কিতাবে বলা হইয়াছে- "আহ্‌লে কেবলার মধ্যে যাহারা আমাদের আকীদার বিপরীতমুখী আকীদা রাখে, মোটামুটি ভাবে তাহারা ছয়টি দলে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক দল বারটি উপদলে বিভক্ত হইয়াছে, অতঃপর মোট বায়াত্তর (৭২) দলে হইল। এই বায়াত্তর দলের সকলেই দোজখে যাইবে। তাহারা ব্যতীত শুধু একটি দল (যাহা আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামে খ্যাত) বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।"



আকীদা বলিতে কলব বা অন্তরের কাজকে বুঝায়, জাহেরী আমলকে আকীদা বলা হয় না। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃত্তি পুজারী লোকদের সাক্ষ্যও জাহেরী শরীয়তে গ্রহণ যোগ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। কারণ, তাহারা আমর ও আহ্‌লে কেবলা হওয়ার মধ্যে আমাদের বিরোধী নহে। আর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাধারণতঃ আহ্‌লে কেবলা হওয়া অর্থাৎ জাহেরী আমল ঠিক হওয়া যথেষ্ট। ইহাতে আকীদা বা অন্তরের কাজের আবশ্যক হয় না। অথচ উক্ত প্রকৃতির লোকগুলি আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত হইতে খারিজ বলিয়া ফকীহ্ ও ইমামগণ নিজেই বর্ণনা করিয়াচেন। উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে,আহ্‌লে চুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত হইতে চাহিলে আকীদা দুরস্ত হওয়া অপরিহার্য। শুধু জাহেরী আমল এবং আহ্‌লে কেবলা হইলে কোন লাভ হইবে না।

উল্লেখ্য যে, এই ব্যাপারে কোন লোক ধোকায় পড়িলে চলিবেনা যে, আমরা আমলের পাল্লা একেবারে হালকা করিয়া দিয়াছি (নাউজুবিল্লাহ্)। বরং আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল-জাহেরী আমলের পূর্বে আকীদা দুরস্ত হওয়া দরকার। সঠিক আকীদা ছাড়া জাহেরী আমলের কোন মূল্য নাই। যে ব্যক্তির আকীদা দুরস্ত হইবে এবং জাহেরী আমলও পুরাপুরিভাবে পালন করিবে, তবে সেই ব্যক্তি আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হইবে।

বন্ধুগণ! শুধু জাহেরী আমলের জোর দেখাইলে কাজ হইবেনা, বরং প্রথমে আকীদা দুরস্ত হওয়ার জোর দেখাইতে হইবে, পরে জাহেরী আমলেরও জোর দেখাইতে সচেষ্ট হউন। ইহাই হইল আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের এমনিতো প্রত্যেক ফেরকা বা দলের লোকে জাহেরী আমলের জোর দেখাইয়া থাকে। যেমন নামাজ পড়িবার জন্য এবং রোজা রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই বলিয়া থাকে, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। অবশ্য কোন কোন (جزئى مسائل) মাছয়ালায় ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু আকীদার মাছয়ালায় তাঁহারা সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন। তাই চারি মাযহাবের ইমামগণকে আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমাম বলা হইয়া থাকে। আর আমাদের আলোচ্য দলগুলির লোকদের সহিত আমাদের যে মত

বিরোধ রহিয়াছে উহা আকীদার মাছয়ালার ব্যাপারে হইয়া থাকে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল তাহাদের আকীদা অনুযায়ী রাফেজী, ওহাবী প্রভৃতি পৃথক পৃথক নামে পরিচিত।

## মুসলমানগণ জমিনের বুকে খোদার সাক্ষী বিশেষ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ مَاوَجَبَتْ فَقَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ (متفق عليه)

অনুবাদঃ- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কিছুলোক একটি লাশ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাঁহারা ঐ মৃত ব্যক্তিটির সুনাম করিতে লাগল, তখন নবী করীম (সঃ) বলিলেন, "ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।" কিছুক্ষণ পর তাহারা অপর একটি লাশ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, লোকেরা ঐ মৃত ব্যক্তিটির দুর্নাম করিতেছিল, হুজুর (সঃ) বলিলেন, "ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।" হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, "হুজুর ! কি ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে?" নবী করিম (সঃ) উত্তরে বলিলেন, "তোমরা যেই মৃত ব্যক্তিটির সুনাম করিয়াছে, তাহার জন্য বেহেশ্‌ত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' আর তোমরা যেই ব্যক্তিটির দুর্নাম করিয়াছ, তাহার জন্য দোজখ ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে, তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহ্‌র সাক্ষী বিশেষ।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ- উল্লেখিত হাদীস হইতে কয়েকটি মাছয়ালা জানা যায়।

প্রথমতঃ সাধারণ মুসলমানগণ স্বভাবতঃ যাহাকে আল্লাহ্‌র ওলী বলিবে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র ওলী। আল্লাহপাক আউলিয়ায়ে কেরামের আলামত বর্ণনা করিতে গিয়া বলেনঃ -

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ.



"তাঁহাদের জন্য পৃথিবীতে সু-সংবাদ রহিয়াছে যে, সাধারণ মুসলমান তাঁহাদিগকে জান্নাতী বলিবে এবং পরকালেও তাঁহাদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে যে, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাদিগকে জান্নাতী বলিয়া প্রচার করিতে থাকিবে।" সুতরাং হযরত গাউছে পাক (রাঃ), হযরত খাজা আজমিরী (রাঃ), হযরত দাতা গঞ্জে বখ্‌শ (রাঃ) ও খাজা বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র ওলী। কেননা, মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র ওলী মনে করিয়া থাকে। আউলিয়ায়ে কেরামের বেলায়েত প্রমাণিত করার জন্য কুরআনের আয়াতের কোন প্রয়োজন হয়না।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানেরা যেই কাজকে ভাল ও ছওয়াব বলিয়া মনে করিবে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে ভাল ও ছওয়াবের কাজ। সুতরাং মিলাদুন্নবী, ফাতেহায়ে এয়াজ-দাহম, কেয়াম, বুজুর্গানে দ্বীনের ওরশ শরীফ, খতমে খাজেগান ইত্যাদি সওয়াবের কাজ। কেননা, সাধারণ মুসলমানগণ, আউলিয়ায়ে কেরাম ও পরহেজগার বান্দাগণ উক্ত কাজগুলিকে সওয়াবের কাজ বলিয়া জানেন।

স্মরণীয় যে, মুসলমানদের সাক্ষ্য বলিতে পূন্যবান মু'মিন ব্যক্তিদের সাক্ষ্যকে বুঝায়, যাহা তাঁহাদের মুখ হইতে স্বভাবতই বাহির হইয়া থাকে এবং যাহার মধ্যে আত্মিক হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদির অবকাশ থাকেন। আরও লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত হাদীসে যেই সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা শুধু ছাহাবায়ে কেরামকে করা হয় নাই, বরং কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত পূন্যবান মু'মিন ব্যক্তিগণকেও করা হইয়াছে। যেমন একটি হাদীসে আছে-

اَلْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ

"মু'মিন ব্যক্তিগণ জমিনের বুকে আল্লাহ্‌র সাক্ষী বিশেষ।" অপর এক হাদীসে হযরত কুরাইব (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা -'কদীদ' নামক স্থানে তাঁহার এক ছেলের মৃত্যু হয় তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেনঃ "হে কুরাইব! কতজন লোক একত্রিত হইয়াছে,তাহা দেখ।" হযরত কুরাইব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বাহির হইয়া দেখিলাম যে, কিছু লোক একত্রিত হইয়াছে, আমি ইবনে আব্বাসকে উহা বলিলাম। ইহাতে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "চল্লিশ জন হইয়াছে কিনা, তাহা তুমি বলিতে পার?" আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি লাশ আনিতে নির্দেশ

দিলেন এবং বলিলেন, "আমি জনাবে মুস্তফা (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন মুসলমান মরিয়া যাইবার পর তাঁহার জানাজা নামজে যদি এইরূপ চল্লিশ জন মানুষ অংশ গ্রহণ করে, যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করেনা, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ চল্লিশজন লোকের সুপারিশ মৃত ব্যক্তিটির পক্ষে কবুল করিবেন। [মুসলিম শরীফ]

মিশ্‌কাত শরীফের শরাহ্ 'মিরকাত' নামক কিতাবে বলা হইয়াছে, যেখানে চল্লিশজন মসুলমান একত্রিত হইবে, সেখানে নিশ্চয়ই একজন ওলী থাকিবেন। তাঁহার দোয়া অবশ্যই কবুর হয় এবং তাঁহারই ওছিলায় অন্যান্য লোকের দোয়াও কবুল হইয়া থাকে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, এইখানে মুসলমান বলিতে প্রকৃত খাঁটি পরহেজগার ছহীহ্ আকীদা সম্পন্ন মুসলমানকেই বুঝায়। নতুবা সিনেমা, নাটক ও গান-বাজনার আসরে লক্ষ লক্ষ ফাসেক লোক একত্রিত হইয়া থাকে। যে মুনাফিকগণ প্রকাশ্যে খাঁটি মু'মিন বলিয়া বেড়ায়, কিন্তু অপ্রকাশ্যে তাহারা আল্লাহ্ ও রাসুলের সহিত অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, যেমন তাহারা বলে, "আল্লাহ্ মিথ্যা কথা বলিতে পারেন, হযরত নবী করীম (সঃ) আমাদের মত একজন মানুষ এবং তিনি মান-সম্মানের হিসাবে আমাদের বড় ভাইয়ের মত।" এইরূপ আকীদা পোষণকারী লোকেরাও উক্ত হাদীসের অন্তর্ভূক্ত নহে।

অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (সঃ) বলিয়াছেন- এমন কোন মৃত ব্যক্তি নাই, যাহার জানাজা নামাজে একশত জন মুসলমান অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা ঐ মৃত ব্যক্তির জন্য গুনাহ্ মাফের সুপারিশ করিয়াছে, তবে তাহার পক্ষে ঐ মুসলমানগণের সুপারিশ কবুল না হইবে। (মুসলিম)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে একশত জনের শর্ত আরোপ করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণায় চল্লিশ জনের উপস্থিতিতে জানাজা নামাজ পড়া হইলে তবে মৃত ব্যক্তির গুনাহ্ মোচন হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন-"যে



মুসলমান ব্যক্তির পূণ্য কাজ সম্পর্কে চারজন লোক সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।" আমরা আরজ করিলাম "হুজুর! যদি তিনজন লোকে সাক্ষ্য দান করে?" হুজুর বলিলেন, হাঁ, তিনজনও। আমরা বলিলাম, দুইজেনর সাক্ষ্য? তিনি বলিলেন, দুইজনের সাক্ষ্যও। অতঃপর আমরা হুজুরের কাছে একজনের সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি নাই।" (বুখারী)

এই হাদীস হইতে বুঝা গেল যে, দুইজন মুসলমান কোন ব্যক্তিকে ভাল বলা, তাহার জান্নাতী হওয়ার একটি আলামত। এই হাদীসে খারাপ কাজের উল্লেখ নাই, শুধু ভাল কাজের খারাপ বলিলে কেহই জাহান্নামী হইবেনা। হাঁ, তাহারা যদি ভাল বলে, তবে জান্নাতী বলা যাইবে। শরীয়তে সাক্ষীর পরিমাণ দুইজন। এমনি দুইজন লোকের সাক্ষ্য দ্বারা জান্নাতী বলিয়া প্রমাণিত হয়। আর হুজুর (সঃ) এর পবিত্র মুখ হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহা আল্লাহ্ পাকের অনুমোদিত হইবে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন-"তোমরা মৃত ব্যাক্তিগণকে মন্দ বলিওনা, কারণ তাহারা বিগত কাজগুলির ফলাফল পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে। (বুখারী)

অর্থাৎ তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দোজখী বা মন্দ লোক ইত্যাদি বলিওনা। এই হাদীস অনুসারে ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, আবু জাহেল, আবু লাহাব প্রমুখ ঐ কাফেরগণ, যাহাদের কুফরী সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত অন্য কাফেরগণকেও তাহাদের মৃত্যুর পর কাফের বলা যাইতে পারেনা। কারণ, সম্ভবতঃ সে মৃত্যুকালে মুসলমানও হইয়া গিয়াছিল। হাঁ, বলা যাইতে পারে যে, তাহারা কাফের ও বিধর্মী ছিল। বরং প্রয়োজন বোধে ইহা বলা ওয়াজেব হইয়া পড়ে।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, কাহাকেও মন্দ বলা এক কথা, আর কাহারও সম্পর্কে অনিচ্ছা সত্বে মুক হইতে মন্দ কথা বাহির হওয়া অন্য কথা। হাঁ, ইহা বলা যাইতে পারা যায় যে, অমুক ব্যক্তি ফাছেক, অত্যাচারী, মুনাফিক এবং বিধর্মী ছিল। যেমন উল্লেখিত হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়, যদ্বারা হুজুর পরবর্তী লোকটিকে দোজখী বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিলেন।

মাছয়ালা- যে, ব্যক্তি কাফেরকে কাফের বলিবেনা, সে নিজেই কাফের হইয়া যাবে। কাহাকেও কাফের বানানো যায় না, বরং কাফের বলা যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাফের হইয়াছে, তাহাকেই শুধু কাফের বলা যায়। যে ব্যক্তি নিজেই কুফরী করে, ওলামায়ে কেরাম তাহাকে কাফের বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহারা ফতোয়া দেন যে, ঐ ব্যক্তি কাফের হইয়া গিয়াছে।

### নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)খোদার ধন-ভাণ্ডারের মালিক

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ (متفق عليه)

অনুবাদঃ হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন- "আল্লাহ্তায়ালা যে ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করেন, তবে তিনি তাহাকে দ্বীনের (ধর্মের) মেধাশক্তি দান করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন। আর আমি বন্টনকারী, আল্লাহ্ পাক আমাকে দান করেন।" [বুখারী ও মুসলিম]

ব্যাখ্যা- আল্লাহতায়ালা যে ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করেন, তাহাকে তিনি ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বুঝ শক্তি ও বিজ্ঞতা দান করেন। জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, জাহেরী ফেকাহ্ বলিতে শরীয়তের অনুশাসনগুলিকে যথাযথভাবে বুঝিয়া লওয়া এবং বাতেনী ফেকাহ্ বলিতে তরীকত এবং হাকীকতের রহস্যাবলী অনুধাবন করা বুঝায়। উক্ত হাদীস উভয় প্রকার ফেকাহকে অন্তর্ভূক্ত করে। এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ এবং শব্দ মুখস্ত করা ধর্মীয় জ্ঞান নহে। বরং উহার ভাবার্থ বুঝাই ধর্মীয় জ্ঞান। আর ইহা অতি কঠিন ব্যাপার। ইহার জন্য ফকীহ্ ইমামগণের তক্লীদ বা অনুসরণ করা হয়। এই কারণেই সমস্ত মুফাস্সেরীন ও মুহাদ্দেছীনে কেরাম মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারী হইয়াছেন। তাঁহারা তাফ্সীর ও হাদীস জানার উপর গর্ব করেন নাই। এমনি তো আবু জাহেলও কুরআন-হাদীসের অনুবাদ জানিত। কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য জ্ঞানের দ্বারা কামালিয়াত বুঝায়না, বরং উহাদের ভাবার্থ বুঝার মাধ্যমে কামালিয়াত অর্জন হয়। ধর্মীয় আলেম



বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যাঁহার মুখে আল্লাহ ও রাসুলের বাণী উচ্চারিত হইবে এবং অন্তরে উহার ফয়েজ বিরাজ করিতে থাকিবে। অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের বাণীর ফয়েজ ব্যতীত এমনি মুখের উপর উহার উচ্চারণ অনর্থক।

উল্লেখিত বর্ণনা হইতে গায়ের মুকাল্লেদ আহ্লে হাদীসগণ উপদেশ গ্রহণ করা উচিত, যাহারা চার মাযহাবের কোন ইমামের তক্লীদ বা অনুসরণ করাকে হারাম বলিয়া থাকে। এই প্রকার লোক হইতে দূরে থাকা মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। কেননা, তাহারা ইমামে আযম আবু হানিফা (রাঃ), ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) প্রমুখ ইমামগণকে গালাগালি এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া থাকে।

উল্লেখিত হাদীসে "আনা ক্বাছেমুন্ ওয়াল্লাহু ইউতি" (আমি বন্টনকারী, আল্লাহপাক দাতা) যেই বাক্যটি রহিয়াছে, উহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত নেয়ামত, ইল্ম, ঈমান-ইসলাম, ধন-সম্পত্তি, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি দান করেন আল্লাহতা'লাই, কিন্তু উহা বন্টন করেন জনাবে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম। খোদার সৃষ্টির মধ্যে যে যাহা কিছু লাভ করিয়াছে, উহা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মাধ্যমেই লাভ করিয়াছে। কেননা, উল্লেখিত হাদীসে আল্লাহ্র দানের মধ্যে যেমন কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হয় নাই, তদ্রূপ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বন্টনের মধ্যেও কোন প্রকার শর্ত আরোপ করা হয় নাই। সুতরাং ইহা ধারনা করা ভুল হইবে যে, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) শুধুমাত্র ইল্ম বা জ্ঞানই বন্টন করেন, নতুবা আল্লাহ্তা'লা শুধুমাত্র ইল্ম বা জ্ঞানই দান করেন বলিয়া বুঝা যাইবে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সমানভাবে সব কিছু বন্টন করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রহীতাদের গ্রহনের মধ্যে পার্থক্য হয়। যেমন বিদ্যুতের শক্তি সমানভাবে আসে কিন্তু বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন 'বাল্ব' নিজের শক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ আহরণ করিয়া থাকে। আর যেই বাল্বের কাঁচের রং যেইরূপ হয়, উহার আলোও সেইরূপ হইয়া থাকে। হানাফী, শাফেয়ী মাযহাব তথা কাদেরীয়া ও চিশ্তীয়া তরীকা প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন এবং বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত কতগুলি বাল্ব বিশেষ। কিন্তু সকলের মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি

একটি কেন্দ্র হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। একটি সমুদ্র হইতে বিভিন্ন নদী-উপনদীর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু উহাদের গতিপথ অনুসারে উহাদের পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে। তেমনি কাদেরীয়া, চিশ্‌তীয়া ঐ গতিপথ সমূহের নাম, যাহা দিয়া রাহ্‌মতের সমুদ্র জনাবে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ফয়েজ জারী হইয়া থাকে। (মির'আত, সংযোজিত)।

উল্লেখিত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, মুফাচ্ছের, মুহাদ্দেছ, ফকীহ্, মুজতাহিদ ও সুফীগনের সমস্ত ইল্‌মই জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বন্টন করিয়া থাকেন। সকল আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে ইল্‌মের ফয়েজ পাইয়া থাকেন। অতঃপর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইল্‌ম হইল (عطائى) দানকৃত এবং আল্লাহ্ পাকের ইল্‌ম হইল (ذاتى) নিজস্ব। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার হাবীবকে কতটুকু ইল্‌ম দান করিয়াছেন, তাহা কি আমাদের জানা আছে? সুতরাং জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইল্‌ম সম্পর্কে আংশিকতার শর্ত আরোপ করা আমাদের জন্য জায়েজ নহে। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার সম্মানিত হাবীব হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে কি কি ইল্‌ম দান করিয়াছেন এবং তাহা কি আংশিক না সম্পূর্ণ, যেহেতু সেই সম্পর্কে আমাদের জানা নাই, অতএব প্রত্যেক উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তাহার নবীর উপর ভাল ধারনা রাখা একান্ত কর্তব্য। কোন উম্মত তাহার নবীর ইল্‌ম সম্পর্কে যথাযথ ধারনা করা কি সম্ভব? বরং ইহা বড় বে-আদবী। সংক্ষেপে ইহাই জানিয়া রাখুন যে, খোদার ইল্‌ম (قديم) চিরন্তন এবং নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইল্‌ম (حادث) অচিরন্তন। কেননা, হুজুরের ইল্‌ম হইল (عطائى) দানকৃত। খোদার ইল্‌ম অসীম এবং হুজুরের ইল্‌ম সীমাবদ্ধ। যেহেতু (কুল্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ) শব্দটিও চিরন্তন নহে। ইহা দ্বারা সীমাবদ্ধ ইল্‌মকে বুঝায়। অতঃপর জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইল্‌মকে (كلى) সম্পূরণীয় বলার মধ্যে কোন ভুল হইতে পারেনা। অন্যান্য মাখ্‌লুকাতের ইল্‌মের তুলনায় হুজুরের ইল্‌ম সম্পূরণীয় এবং আল্লাহ্‌পাকের ইল্‌মের তুলনায় আংশিক নহে, বরং একবিন্দু মাত্র। কেননা, আল্লাহ্‌র ইল্‌ম অসীম এবং হুজুরের ইল্‌ম সীমাবদ্ধ।



লক্ষণীয় যে, যখন كل (কুল্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ) শব্দটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তখন উহা দ্বারা চিরন্তন এবং অসীম কিছু বুঝায়। আর যখন উহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য নবীগণের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তখন উহা দ্বারা অচিরন্তন এবং সীমাবদ্ধ বস্তুকে বুঝায়।

নিজের নবীর ইলম সম্পর্কে সমালোচনা করা এবং আংশিক ইত্যাদির শর্ত আরোপ করা ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি জাতির অভ্যাস। উম্মতে মুহাম্মদী এইরূপ করিতে পারেনা। হাঁ, এই মাছয়ালাটি আল্লাহ্‌পাকের নিকট সোপর্দ করিতে পারা যায়।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইল্‌মে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের রহিতকরণে যেমন কুরআনের আয়াত রহিয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার ইল্‌মে গায়েব প্রমাণিত করণেও কুরআনের আয়াত মওজুদ রহিয়াছে। সুতরাং এই মাছয়ালা সম্পর্কে ইহাই ধরিয়া লওয়া ভাল হইবে যে, আল্লাহ্‌র ইল্‌মের যেই শান ও মান-মর্যাদা রহিয়াছে, উহা হিসাবে আল্লাহর ইল্‌ম বলিতে চিরন্তন এবং অসীম ইল্‌মকেই বুঝাইবে। আর নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইল্‌মের যেই শান ও মান-মর্যাদা রহিয়াছে, উহা হিসাবে হুজুরের ইল্‌ম বলিতে অচিরন্তন এবং সীমাবদ্ধ ইল্‌মকে বুঝাইবে।

### নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَتِىْ (متفق عليه)

অনুবাদঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, তবে সে আমাকে নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে দেখিয়াছে। কেননা, শয়তান আমার ছুরত গ্রহণ করিতে পারেনা।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ- হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, সে যেন আমাকে তাহার জাগ্রত অবস্থায় দেখিয়াছে। কেননা, শয়তান আমার ছুরত গ্রহণ করিতে পারেনা। অর্থাৎ শয়তানের এই শক্তি নাই যে, সে কাহারও নিকট স্বপ্নে আসিয়া তাহার খেয়ালের মধ্যে ইহা নিক্ষেপ করিবে যে, আমি রাসুলুল্লাহ। আর শয়তানের ইহাও শক্তি নাই যে, সে হুজুর আকরম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উপর মিথ্যা অপবাদ আনিবে। ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, শয়তান আল্লাহ তা'লার ছুরত গ্রহণ করিতে পারে এবং মিথ্যা অপবাদ আনিতে পারে। অর্থাৎ শয়তান স্বপ্নে বিভোর লোকের খেয়ালে ইহা নিক্ষেপ করিতে পারে যে, ইহা আল্লাহ্র ছুরত। কিন্তু শয়তান কখনও নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ছুরত গ্রহণ করিতে পারেনা, এবং হুজুরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারেনা। কারণ, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইলেন হেদায়তের প্রকাশ স্থল এবং শয়তান হইল গোমরাহীর প্রকাশ স্থল। আর হেদায়ত ও গোমরাহী পরস্পর বিপরীত মুখী। আল্লাহ্তায়ালা হেদায়ত, গোমরাহী তথা সমস্ত বিপরীত গুণাবলীর সমন্বয় স্থান। অধিকন্তু, মাখ্লুকাতের খোদায়ী দাবী স্পষ্টভাবে বাতিল এবং ইহার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। অপর পক্ষে নবুওয়াতের দাবী মাখ্লুকাতের পক্ষ হইতে করা হয়। সুতরাং যদি কেহ খোদায়ী দাবী করিয়া বসে, তবে তাহার নিকট হইতে অভ্যাস ও রীতি বিরোধী কাজ প্রকাশ হওয়া শর্ত সাপেক্ষ। কিন্তু যে ব্যক্তি নবুওয়াত দাবী করিয়া বসে, তাহার পক্ষ হইতে মো'জেজা প্রকাশ পাওয়া শর্ত নহে। হাদীসে হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, সে সত্যই দেখিয়াছে।" আর শয়তান নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ছুরত গ্রহণ করিতে পারেনা এবং তাঁহার একইরূপ ধারণ করিতে পারেনা। এই বৈশিষ্ট্যাবলী নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্য খাস্।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিল, সে অনতিবিলম্বে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিবে। আর শয়তান আমার রূপ ধারণ করিতে পারেনা।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখিল, তবে সে আল্লাহ্র তৌফিকে তাঁহাকে আখেরাতে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পাইবে।



হাদীসে আছে- হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, "ভাল স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের একভাগ বিশেষ।" হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে একটি বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন-নবুওয়াতের আলামাতগুলির মধ্যে 'মুবাশ্শেরাত' ব্যতীত কিছুই বাকী রহিলনা, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরজ করিলেনঃ হুজুর! 'মুবাশ্শেরাত' কিঃ হুজুর বলিলেনঃ 'ভাল স্বপ্ন'। অর্থাৎ আমার পরে ওহী বন্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু স্বপ্ন বাকী থাকিবে, যদ্বারা অন্যান্য সমস্ত জিনিস জানিতে পারা যাইবে।

হাদীসে আছে- হযরত আবু ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেনঃ "শেষ রাত্রের স্বপ্ন অতি ভাল, কেননা ঐ সময়ে অন্তর অত্যাধিক শান্ত থাকে এবং ঐ সময়ে ফেরেশ্তা এবং সৌভাগ্য নাজিল হয়, আর আল্লাহ্র দরবারে দোওয়া কবুল হয়।

## মসজিদে গল্পগুজব করা ও বাজে কথা বলা ক্বিয়ামতের আলামত

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ (رواه ابوداؤد وغيره)

অনুবাদঃ- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন-"মসজিদে মুসল্লিগণ পরস্পরের সহিত গর্ব ও বাড়াবাড়ি করা কেয়ামতের আলামত সমূহ হইতে একটি আলামত।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ- না জায়েজ জিনিস দ্বারা মসজিদ সাজানো বা লোক দেখানো এবং অহংকার পদ্ধতিতে মসজিদ সাজানো শরীয়ত নিষিদ্ধ।

অপর একটি হাদীসে আছে- মসজিদে হাসা-হাসি করা, গল্প-গুজব করা এবং বাজারের মত কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি কাজ কেয়ামতের আলামত।

টীকাঃ- শবে-কদর ও শবে-বরাত ইত্যাদি রাত্রিগুলিতে মুসলমানগণ মসজিদে আলোক সজ্জা করিয়া থাকে এবং পতাকা ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ সাজাইয়া থাকে। কোন কোন লোক উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে উহাকে নিষেধ করিয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ নিষেধ করা ভুল। কেননা, যখন বিবাহ-শাদী ইত্যাদিতে আমাদের ঘরগুলি সাজানো হইয়া থাকে, তবে এই রকম বরকত সম্পন্ন তারিখগুলিতে আল্লাহ্‌র ঘরকে কেন সাজানো যাইবেনা। নিশ্চয়ই এইসব বরকত সম্পন্ন তারিখে আল্লাহর ঘরসমূহ সাজানো উচিত।

## আযানের দোয়ার সময় হাত উঠানো ছুন্নাত

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ (رواه البيهقى)

অনুবাদঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদিগকে মাগরিবের নামাজের আযানের সময় দোওয়া করিতে হুকুম দেয়া হইত। (বায়হাক্বী)

ব্যাখ্যাঃ- নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মাগরিবের নামাজের আযানের সময় এই দোওয়া পড়িতে হুকুম দিয়াছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِىْ.

"হে আল্লাহ্! তোমার রাত আসা এবং তোমার দিন অতিবাহিত হওয়ার সময় ইহা তোমার দাওয়াত ঘোষণাকারীদের আওয়াজ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

কোন কোন লোক আযানের দোয়ায় হাত উঠানোকে নিষেধ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীস দ্বারা এই নিষেধ প্রমাণিত হইবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত কাহাকেও ইহা নিষেধ করার অধিকার নাই। প্রত্যেক দোয়ায় হাত উঠানো রাছুলের ছুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত মুযাদ্দেদে আল্ ফে-সানী (রাঃ) হইতে আযানের পর হাত উঠাইয়া দোয়া করার কথা ছাবেত আছে এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তাঁহার



'ইমদাদুল্ ফতোয়া' নামক কিতাবে আযানের পর হাত উঠাইয়া দোওয়া করা ছুন্নাত বলিয়াছেন। নামাজের আভ্যন্তরীন দোওয়াগুলি ছাড়া অন্যান্য দোয়ার সময় হাত উঠানো ছুন্নাত। যেহেতু নামাজের দোয়ার সময় নামাজের নিয়মাবলীর মধ্যে মশ্‌গুল থাকার ফলে সেইখানে হাত উঠানোর সুযোগ থাকে না।

খানা খাওয়ার পর দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো শরীয়ত নিষিদ্ধ নহে, বরং দোয়ার সময় হাত উঠানো দোওয়ার আদাব ও নিয়মাবলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট আদব ও নিয়ম। যদি কিছু সংখ্যক লোক খাইতে বসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও খাওয়া শেষ হইয়াছে এবং কেহ কেহ এখন খাইতেছে, তবে এইরূপ অবস্থায় হাত উঠাইয়া দোয়া করা নিষেধ। কেননা, সেই সময় অন্যান্য যাহারা খানায় ব্যস্ত আছে, তাহারা লজ্জা পাইবে। যখন সকলের খাওয়া শেষ হইবে, তখন সকলে এক সাথে হাত উঠাইয়া দোয়া করিবে। ইহাই দোওয়ার আদব ও নিয়ম।

## কবরের উপর ফুলের তোড়া দেওয়া জায়েয আছে

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخِرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رُطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا (متفق عليه)

অনুবাদঃ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) দুইটি কবরের পাশে দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেনঃ এই কবর দুইটির মধ্যে আযাব দেওয়া যাইতেছে এবং কোন বড় কারণে আযাব দেওয়া যাইতেছেনা, বরং তাহাদের মধ্যে একজন প্রশ্রাব হইতে পরহেজ করিতনা। আর অপর ব্যক্তিটি ছুঘলখোরী করিয়া বেড়াইত। এই কথা বলার পর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) খেজুর গাছের একটি তাজা ডাল হাতে লইয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া দুই

টুকরা করিলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক কবরে এক এক টুকরা পুঁতিয়া দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি কেন ইহা করিলেন? হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উত্তরে বলিলেনঃ " যতক্ষণ পর্যন্ত এই ডাল দুইটি শুকাইবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত দুইটি কবরবাসীর আযাব হাল্কা হইবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্র প্রিয় রাসুলের দৃষ্টির জন্য কোন বস্তু অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারেনা। কোন বস্তু প্রকাশ্যে হউক বা অপ্রকাশ্যে হউক, উহা আঁ হযরত (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর নিকট পরিস্ফুট। কেননা, উক্ত হাদীস হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবরের ভিতরেই আযাব চলিতেছে, আর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কবরের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি সেইখানে কবরের আভ্যন্তরীন আযাব দেখিতেছেন। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মাখ্লুকাতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছু সবকাজ দেখিতেছেন, কে কি কাজ করিতেছে এবং কি করিয়াছিল, সবকিছু জানেন, তিনি মুহূর্তে বলিয়া দিলেন যে, এই দুইটি কবরবাসীর মধ্যে একজন প্রশ্রাব হইতে পরহেজ করিতনা এবং অপরজন চুঘলখোরী করিত।

ছগীরা বা ছোট ছোট গুনাহের জন্য কবর এবং হাশরে আযাব হইতে পারে। দেখুন, ছুঘলখোরী ইত্যাদি হইল ছগীরা গুনাহ্, কিন্তু ইহার জন্য কবরে আযাব দেওয়া যাইতেছে।

জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) প্রত্যেক গুনাহের চিকিৎসা এবং সুব্যবস্থা জানেন। উক্ত হাদীসে দেখুন, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আযাব হাল্কা হওয়ার জন্য কবরে খোরমার ডাল পুঁতিয়া দিয়াছেন।

কবরের উপর সজীব বস্তু ও ফুলের তোড়া ইত্যাদি দেওয়া রাসুল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ছুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, ঐ ফুলগুলির তাস্বীহের দ্বারা মৃত ব্যক্তির কবরে আরাম হয়।

কবরের নিকট কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য হাফেজ ও মৌলভী নিয়োগ করা অত্যন্ত ভাল কাজ। কেননা, উক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, গাছ-পালা এবং উদ্ভিদ প্রভৃতির



তাস্বীহ ও জিকিরের দ্বারা নিশ্চয়ই কবরের আযাব অধিকতর হাল্কা হইবে।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত বুরাইদা (রাঃ) মৃত্যুকালে অছিয়ত করিয়াছিলেন, "আমার কবরে গাছের দুইটি তাজা ডাল পুঁতিয়া দিতে হইবে, যেন এইগুলির দ্বারা আমার কবর আযাব হইতে মুক্তি পায়।"

যদিও প্রত্যেক শুক্না এবং সজীব বস্তু আল্লাহ্র তাস্বীহ পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু সজীব জিনিসের তাস্বীহ্ দ্বারা মৃত ব্যক্তির কবরে আরাম মিলে। বিধর্মী লোকের কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয়না। কেননা উহাতো কুফরীর শুষ্কতা রহিয়াছে। আর মু'মিন ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা লাভ হয়। কারণ, ইহাতে ঈমানের সজীবতা রহিয়াছে। সজীব বস্তু গুনাহ্গার লোকের কবরের আযাব হাল্কা করিয়া থাকে, আর বুজুর্গ ও পূন্যাত্মাদের কবরে সজীব বস্তু সওয়াব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

হালাল জানোয়ারের প্রশ্রাব নাপাক, অপবিত্র। উহাদের প্রশ্রাব হইতে বাঁচিয়া থাকা ওয়াজিব। দেখুন, উটের রাখাল উটের প্রশ্রাবের ছিঁটা হইতে বিরত না থাকার দরুন কবরের আযাবে লিপ্ত হইয়াছে।

উক্ত হাদীসে শুক্না ডাল পুঁতিয়া দেওয়ার কথা বলা হয় নাই, উহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কবর দুইটির আযাবে এই রকম পরিবর্তন শুধুমাত্র হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পবিত্র হাতের বরকতে হয় নাই। আমরাও যদি এইরূপ কাঁচা ডাল কবরে পুঁতিয়া দিই, তবে আমাদের কাজেও ঐরূপ পরিবর্তন হইবে, অর্থাৎ কবর আযাব হাল্কা হইবে।

বুজুর্গ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ কবরস্থানে কদম ফেলার বরকতে তথাকার কবর আযাব দূরিভূত হইয়া যায়, অথবা কবর আযাব বন্ধ হইয়া যায়।

## কেয়ামতের পূর্বে হারাম-হালালের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِىْ الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ (رواه البخارى)

অনুবাদঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন, মানব সমাজের কাছে এমন একটি জামানা আসিবে, সেই জামানায় মানুষ যেই কোন প্রকার টাকা-পয়সা গ্রহণ করিতে পরোয়া করিবেনা। উহা কি হালালের টাকা, না হারামের টাকা! (সে কোন প্রকার চিন্তাই করিবেনা)। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ- কেয়ামতের পূর্ব যুগে মানুষ হালাল ও হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য করিবেনা। যাহা মুখের কাছে পাইবে, উহা খাইয়া ফেলিবে, আর যাহা মুখে আসিবে, উহা বলিয়া ফেলিবে। ইহাতে সে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করিবেনা। বর্তমান যুগে উক্ত হাদীসের সত্যতা অনেকাংশে পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্তমানে মানুষ হারাম ধন-সম্পদকে হালাল বলিয়া মনে করিতেছে। আর ইহা ব্যবসায়ী এবং সরকারী চাকুরীজীবীদের মধ্যে অধিকতর পাওয়া যায়, যেমন, ব্যবসায়ীগণ ওজনে কম দিতেছে এবং উৎকৃষ্ট জিনিসের মধ্যে নিকৃষ্ট জিনিস ভেজাল করিতেছে। চোরা কারবারী করিতেছে। আর সরকারী চাকুরী জীবীগণ ঘুষ ইত্যাদি খাইতেছে। এই অসৎ কাজগুলি উক্ত হাদীসের অন্তর্ভূক্ত।

মুসলমান ভাইগণ! আপনারা একটু নিজের নবী জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নির্দেশাবলীর দিকে নজর করুন এবং উক্ত অসৎ এবং ঘৃণিত কাজগুলি হইতে বিরত থাকুন। আল্লাহ্ পাক সকলকে হালাল উপার্জনের তৌফিক দান করুন। আমিন!

## কেয়ামত কখন সংগঠিত হইবে?

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَااَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرَةِ صَلٰوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَّلَا صَدْقَةٍ وَلٰكِنْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعْ مَنْ اَحْبَبْتَ (رواه البخارى)

অনুবাদঃ- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হইয়া হুজুরের নিকট আরজ



করিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেয়ামত কখন সংঘটিত হইবে? নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উত্তরে বলিলেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি সম্বল তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছ? সেই ব্যক্তি আরজ করিলঃ হুজুর! আমি তো কেয়ামতের জন্য কোন অধিক নামাজের সম্বলও তৈয়ার করি নাই, আর না অধিক রোজা এবং দান-খয়রাতের সম্বলও তৈয়ার করিয়াছি। কিন্তু আমি পরকালের সম্বলের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে মুহাব্বত করি। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, তোমার হাশর ঐ ব্যক্তির সাথেই হইবে, যাহাকে তুমি মুহাব্বত কর। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ- বুখারী শরীফের অপর একটি হাদীস হযরত আনাস (রাঃ) হইতে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে, "এক ব্যক্তি হুজুরের নিকট কেয়ামত সম্পর্কে আরজ করিল, হুজুর! কেয়ামত কখন সংঘটিত হইবে? হুজুর বলিলেনঃ তুমি কেয়ামতের জন্য কি সম্বল তৈয়ার করিয়াছ? সে আরজ করিলঃ হুজুর! আমিতো কিছুই তৈয়ার করি নাই, আমার কাছে কোনই সম্বল নাই। কিন্তু আমি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসুলকে মুহাব্বত করি। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইলেনঃ তুমি যাহাকে মুহাব্বত কর, তাহার সাথেই তোমার হাশর হইবে।" অতঃপর হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন-

فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحْنَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَ مَعْ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَانَا اُحِبُّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ مَعْهُمْ بِحُبِّىْ اِيَّاهُمْ وَاِنْ لَمْ اَعْمَلْ بِمِثْلِ اَعْمَالِهِمْ.

"আমরা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা এত অধিক খুশী হই নাই, যতাধিক হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর انت مع من احببت (তুমি যাহাকে মুহাব্বত কর তাহার সাথেই তোমার হাশর হইবে) এই বাণী শুনিয়া খুশী হইয়াছি।" হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ "আমি তো নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম), আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) কে মুহাব্বত করি এবং আশাকরি যে, আমি তাঁহাদিগকে মুহাব্বত করার ফলে তাঁহাদের সাথেই আমার হাশর হইবে, যদিও তাঁহাদের মত আমি নেক আমল করি নাই।"

বুখারী শরীফের অন্য একটি বর্ণনায় আছে-

فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيْدًا.

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ যেই দিন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন, "তুমি যাহাকে মুহাব্বত কর, তাহার সাথেই তোমার হাশর হইবে" সেইদিন আমরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলাম।

বুখারী শরীফের অপর একটি হাদীসে আছে-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَلْمَرْءُ مَعْ مَنْ اَحَبَّ.

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন– যে ব্যক্তি যাহাকে মুহাব্বত করে, তাহার সাথেই ঐ ব্যক্তির হাশর হইবে।

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ হইতে প্রমাণিত হইল যে, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং আলেম সমাজের সহিত মুহাব্বত রাখিলে তাঁহাদের সহিত হাশর হইবে। যদি কোন ব্যক্তি চোরের সহিত মুহাব্বত রাখে, তবে সেই চোরের সাথেই তাহার হাশর হইবে। আর যদি কোন নবী অথবা ওলীউল্লাহ্‌র সাথে মুহাব্বত রাখে, তবে সেই নবী অথবা ওলীর সাথেই হাশর হইবে। মোটকথা এই যে, যাহার সাথেই মুহাব্বত রাখিবে, তাহার সাথেই হাশর হইবে। যেমন মুরীদ তাহার পীরের সহিত, শাগরেদ তাহার উস্তাদের সহিত, ছেলে তাহার পিতার সহিত এবং স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত হাশর হইবে। যে যাহার সহিত যতটুকু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মুহাব্বত রাখিবে, হাশরে সে ততটুকু তাহার নৈকট্য ও সাহচর্য্য লাভ করিবে, যদিও তাহার নেক আমল সংক্ষিপ্ত হয়। ওলামায়ে কেরামকে তাঁহাদের ইল্‌ম ও আমলের খাতিরে এবং আউলিয়ায়ে কেরামকে তাঁহাদের ইবাদত ও রেয়াজতের খাতিরে মুহাব্বত করা যায়।

প্রত্যেক জিনিসের আসল হইল নিয়ত, আর সমস্ত কাজগুলি নিয়তের উপর নির্ভর করে। যাহার নিয়ত যেইরূপ হইবে, তাহার কাজ বা কাজের ছওয়াবও সেইরূপ হইবে।



## হুজুরের মুহাব্বতের পরিণাম

বুখারী শরীফে অন্য একটি হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমরা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সাথে ছিলাম, তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হযরত ওমর ফারুকের হাত ধরিয়াছিলেন, অতঃপর ওমর ফারুক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর খেদমতে আরজ করিলেনঃ "হুজুর! আপনি আমার প্রাণ ব্যতীত আমার নিকট সব কিছুর চাইতে অধিক প্রিয়।" আঁ হযরত (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, "ওমর! সেই ব্যক্তি মু'মিন নহে যে ব্যক্তির নিকট তাহার প্রাণের চাইতে আমি অধিক প্রিয় হইতে পারি নাই।" ইহা শুনিয়া হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আরজ করিলেন, ঐ খোদার শপথ, যিনি আপনার উপর কিতাব নাজিল করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনি আমার বুকের দুই পার্শ্বের মাঝখানে অবস্থিত প্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয়। তখন নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, اَلْآنَ يَاعُمَرُ "ওমর! এখন তোমার ঈমান পূর্ণ হইয়াছে।"

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, তারিফ ও প্রশংসা করা মুহাব্বতের আলামত।

কিতাবুশ্ শেফা' নামক গ্রন্থে আছে–

وَمِنْ عَلَامَاتِ مُحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثْرَةُ ذِكْرِه لَهٗ فَمَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ.

"নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বতের আলামত সমূহের মধ্যে ইহা একটি আলামত যে, আঁ হযরত (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে অত্যাধিক স্মরণ করিবে, সাধারণতঃ যে ব্যক্তি যেই জিনিসকে মুহাব্বত করে, সে উহাকে অত্যাধিক স্মরণ করিয়া থাকে।

উক্ত কিতাবের অন্যত্র বলা হইয়াছে–

اَلْمَحَبَّةُ دَوَامُ الذِّكْرِ لِلْمَحْبُوْبِ

মুহাব্বতের অর্থ হইল, নিজের প্রেমাস্পদকে সর্বদা স্মরণ করা।" মুহাব্বত এই কারণেই নাম রাখা হইয়াছে যে, তা'রিফ ও প্রশংসার শেষ পর্যায়ে

প্রশংসাকারীর উপর প্রশংসিত ব্যক্তির গুণাগুণ প্রতিফলিত হয়।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রাঃ) বলিয়াছেনঃ "আমি ভালভাবে মোশাহেদা করিয়াছি, যে ব্যক্তি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর তা'রিফ ও প্রশংসা করিয়া থাকে, তবে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সেই ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রতি হুজুরের বিশেষভাবে তাওয়াজ্জুহ বিরাজ করে।"

মির্জা জাঁন্‌জানা দেহ্‌লভী (রাঃ) বলেন–

محمد حامد حمد خدا بس
خدا مداح مدح مصطفے بس

হযরত মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) খোদার তা'রিফ বর্ণনায় প্রশংসাকারী হিসাবে যথেষ্ট, আল্লাহ তায়ালা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর তা'রিফ বর্ণনায় অতি প্রশংসাকারী হিসাবে যথেষ্ট।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى السَّاعَةُ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهٗ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَااَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَااَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيْرَةَ صَلٰوةٍ وَّلَاصَوْمٍ اِلَّا اِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ وَاَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ فَمَا رَاَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَا – هذا حديث صحيح – (ترمذى شريف ج۲، صفحه ٦١)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হইয়া হুজুরের নিকট আরজ করিলঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন সংঘটিত হইবে?" নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়া



গেলেন, অতঃপর নামাজ আদায় করিয়া তিনি বলিলেন, "কেয়ামত সংঘটিত হইবার ব্যাপারে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?" তখন ঐ ব্যক্তিটি আরজ করিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আছি। হুজুর বলিলেন "তুমি কেয়ামতের জন্য কি সম্বল তৈয়ার করিয়াছ?" সে আরজ করিল, "হুজুর! আমি কেয়ামতের জন্য কোন অধিক নামাজের সম্বলও তৈয়ার করি নাই, আর না অধিক রোজা এবং দান-খায়রাতের সম্বলও তৈয়ার করিয়াছি, বরং আমি পরকালের সম্বলের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে মুহাব্বত করি। রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ যে ব্যক্তি যাহাকে মুহাব্বত করে, তাহার সাথে ঐ ব্যক্তির হাশর হইবে। আর তুমি যাহাকে মুহাব্বত কর, তাহার সাথেই তোমার হাশর হইবে"। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মুসলমানগণ হুজুরের ঐ কথা হইতে যতটুকু খুশী হইয়াছে, ইসলাম গ্রহণের খুশীর পর অন্য কোন জিনিসের দ্বারা ততটুকু খুশী হইতে আমি তাহাদিগকে দেখি নাই। (ইহা ছহীহ্ হাদীস, তিরমিযী, ২য় খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)

আল্‌হামদুলিল্লাহ্, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের জন্য ইহা হইতে আর খুশীর ব্যাপার কি হইতে পারে যে, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বতের পরিবর্তে কেয়ামতের দিনে হুজুরের সাহচর্য্য লাভ হইবে। যদি অধিকতর নামাজ-রোজা ইত্যাদি পালন করা হয়, কিন্তু হুজুরের মুহাব্বত হইতে অন্তর শূন্য থাকে, তবে হুজুরের নৈকট্য ও সাহচর্য হইতে সে বঞ্চিত থাকিবে। যেমন উক্ত হাদীস হইতে প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বত, খেয়াল ও স্মরণ হইতে কখনও গাফেল না হওয়া মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। হুজুরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসা স্থাপন করা এবং তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার স্মরণে থাকা প্রকৃত ঈমান এবং খাঁটি ইসলাম।

কোন আশেক কবি সুন্দর বলিয়াছেন–

ریاضت نام هے تیری گلی میں آنے جانے کا
تصور میں تیرے رهنا عبادت اسکو کهتے هیں
تیرے راستے میں مرمتنا شهادت اسکو کهتے هیں
تیرے کوچے میں هونا دفن جنت اسکو کهتے هیں

"হে প্রিয় নবী! আপনারই অলিতে-গলিতে আসা-যাওয়া এবং ঘুরা-ফেরা করাকে 'রেয়াজত' বলা হয়, সর্বদা আপনারই ধ্যানে, আপনারই স্মরণে মগ্ন থাকাকে ইবাদত বলা হয়। আপনারই রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকে শহীদ হওয়া বলা হয় এবং আপনারই গলিতে দাফন হওয়াকে জান্নাতে দাফন হওয়া বলা হয়।"

## হযরত রবিয়াহ (রাঃ) নবীর খেদমতের পরিবর্তে কি পাইলেন

عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اُبِيْتُ مَعْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهُ بِوضُوْءِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ (رواه مسلم)

অনুবাদঃ হযরত রবিয়াহ্ ইবনে কাআ'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আমি রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সহিত রাত্রিযাপন করিতেছিলাম, অতঃপর আমি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নিকট অজু করিবার পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি লইয়া আসিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর।" আমি আরজ করিলাম, "হুজুর! আমি আপনার কাছে বেহেশ্তে আপনার সাহচর্য্যে থাকিবার প্রার্থনা করিতেছি।" তিনি বলিলেনঃ ইহা ছাড়া আরও কিছু চাও!" আমি বলিলাম, "হুজুর! ইহা যথেষ্ট।" তিনি বলিলেন, "তুমি তোমার নিজ আত্মার উপর অধিক সিজ্দার দ্বারা আমার সহযোগিতা কর।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হযরত রবিয়াহ্ (রাঃ) বলেন, "আমি সফরে হুজুরের সহিত ছিলাম এবং রাত্রিকালীন খেদমতের দায়িত্ব বিশেষভাবে আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আমি সারা রাত্রি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরজায় অপেক্ষা করিতে ছিলাম, যেন তাঁহার কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে আমি তাহা পালন করিতে পারি। একরাত্রে তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী তাহাজ্জুদের সময় আমি অজুর পানি, মিস্ওয়াক, জায়নামাজ ইত্যাদি লইয়া তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেনঃ (سَلْ) 'ছাল' অর্থাৎ "আমার কাছে



তোমার কিছু প্রয়োজন থাকিলে বল।" হযরত রবিয়াহ্ আসল নেয়ামত যাহা পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সবকিছু হইতে বড় নেয়ামত, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সাহচর্য্য কামনা করিলেন। অর্থাৎ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৃথিবীর কোন নেয়ামতের ইচ্ছা নাই, ইজ্জত-সম্মান, ধন-দৌলত, পার্থিব অন্য কোন জিনিসের ইচ্ছা নাই, শুধুমাত্র আমি আপনার কাছে বেহেশ্ত কামনা করিতেছি, কিন্তু তাহাও আবার এইরূপ হইতে হইবে, যেন আমি সেইখানে আপনার খাদেম হইতে পারি, যেমন বর্তমানে দুনিয়ার মধ্যে আপনার খাদেম আছি। এই দুনিয়াতে যেইরূপ আমি আপনার সহিত রহিয়াছি তদ্রুপ সেই বেহেশ্তেও যেন আপনার সহিত থাকিতে পারি। কেননা, আপনার দর্শন ব্যতীত বেহেশ্ত আমার জন্য মূল্যহীন। ঐ সময়ে বেহেশ্ত আমার জন্য সঠিক অর্থে বেহেশ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে, যখন সেইখানে আপনার সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হইব না। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহাকে আরও অনেক কিছু চাহিবার জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু হযরত রবিয়াহ্ আরজ করিলেন, "হুজুর! আপনার সাহচর্য্য হইতে ইহকাল ও পরকালে অন্য কোন বড় নেয়ামত নাই, ইহাই তো আসল নেয়ামত। যদি এই নেয়ামত লাভ করিতে পারি, তবে অন্যান্য নেয়ামতগুলিও অনায়াসে লাভ হইয়া যাইবে। উৎকৃষ্ট নেয়ামতের সম্মুখে নিকৃষ্ট নেয়ামতের কোন কদর নাই। সুতরাং, হুজুর! যদি আপনার গোলামী ভাগ্যে না জুটে, তাহা হইলে দুনিয়া-আখেরাতের সকল নেয়ামতের কোন মূল্য নাই।" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, "ঠিক আছে, তুমি অধিক সংখ্যক সিজ্দা অর্থাৎ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আমার সহযোগিতা কর।" হযরত রবিয়াহ্ (রাঃ) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর খেদমতের পরিবর্তে এই নেয়ামত লাভ করিয়াছেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দেছ আল্লামা ইবনে হাজর (রাঃ) বলেন– যখন হযরত রবিয়াহ্ (রাঃ) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর খেদমত পালন করিতেছিলেন, তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ "হে রবিয়াহ্! আমি তোমাকে এই খেদমতের পরিবর্তে কি পুরস্কার দিতে পারি?" কেননা, ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তিগণের নিয়ম যে তাঁহারা খেদমতের পরিবর্তে কিছু না কিছু দান করিয়া থাকেন। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তো

পৃথিবীর সমস্ত ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শুধু অন্যতম ছিলেন না, বরং সকলের সর্দারই ছিলেন। হযরত রবিয়াহ্ (রাঃ) হুজুরের খেদমতের পরিবর্তে খেদমত করাই কামনা করিলেন, অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে হুজুরের যেই খেদমত করিয়াছিলেন, উহার পরিবর্তে বেহেশ্তের মধ্যে হুজুরের খেদমত করাই চাহিয়াছিলেন।

উল্লেখিত হাদীসে হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হযরত রবিয়াহ্‌কে কিছু চাহিবার যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমার নিকট কিছু চাও।" ইহা সম্পর্কে 'মিরকাত' নামক কিতাবে বলা হইয়াছে–

يُؤْخَذُ مِنْ اِطْلَاقِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاَمْرُ بِالسَّوَالِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمْكَنَهٗ مِنْ اِعْطَاءِ كُلِّ مَااَرَادَ مِنْ خَزَائِنِ الْحَقِّ.

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) 'কিছু চাওয়ার' যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, উহার ভাব-ভঙ্গির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহ্‌তায়ালার সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের মালিক। কেননা, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নির্দিষ্ট কিছু চাহিতে বলেন নাই যে, হে রবিয়াহ্! তুমি শুধু ইহাই প্রার্থনা কর। বরং তিনি রবিয়াহ্‌কে সাধারণ অনুমতি দিয়া বলিলেন যে, তুমি আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে যাহা তোমার প্রয়োজন, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি উহা তোমাকে দান করিতে প্রস্তুত আছি।

## হযরত খাযীমা (রাঃ) একাই দুইজন সাক্ষীর সমতুল্য

وَمِنْ ثَمَّ عَدَّ اَئِمَّتُنَا مِنْ خَصَائِصِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ كَجَعْلِهٖ شَهَادَةَ خَزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَتَيْنِ (رواه البخارى)

ইমাম বুখারী (রাঃ) বলিয়াছেন, উল্লেখিত হাদীস অনুসারে আমাদের ইমামগণ হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বৈশিষ্ট্যাবলী হইতে ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করেন যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) দুনিয়া-আখেরাতের যেই কোন নেয়ামত যাহাকে ইচ্ছা করেন, দান করিতে পারেন, অধিকন্তু তিনি শরীয়তের আদেশ-নিষেধগুলির মালিক, তিনি যাহার উপর



যেই হুকুম চাহেন, তাহা জারী করিতে পারেন, যেমন হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) খাযীমা ইবনে ছাবেত আনছারী একজনের সাক্ষ্যকে দুই জনের সাক্ষ্যের সমতুল্য বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

(ঘটনা এই যে, ছাওয়া বিন হারেছ নামক একজন বেদুঈন হইতে রাসূলে করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) একটি ঘোড়া খরিদ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বেদুঈন অস্বীকার করিয়া বলে, "আমি ইহা আপনার নিকট বিক্রয় করি নাই। আপনার কোন সাক্ষী থাকিলে হাজির করুন।" ঘটনাক্রমে এই বেচা-কেনার সময় তথায় অপর কেহ উপস্থিত ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত খাযীমা আনছারী বলিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এই ঘোড়া খরিদ করিয়াছেন, তিনি সত্য বলিতেছেন এবং বেদুঈন মিথ্যা বলিতেছে।" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি তো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলে না, কি করিয়া সাক্ষ্য দিতেছ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আপনার মুখের বাণী শুনিয়া আল্লাহর একত্ববাদ, বেহেশ্ত-দোযখ ইত্যাদি সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছি এবং পড়িতেছি– আশ্হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ......., এই ঘোড়া কি তদপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? আমি আপনার মুখ হইতে শুনিয়া সাক্ষ্য দিতেছি।" তখন রাসূলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "খাযীমার সাক্ষ্য দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমতুল্য।")

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কুরআন করীম ঘোষণা করে واشهدوا ذوى عدل منكم "ন্যায়পরায়ন দুইজন সাক্ষী মনোনীত কর।" কিন্তু এইখানে হযরত খাযীমার সাক্ষ্যকে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমতুল্য গণ্য করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর এই অধিকার রহিয়াছে যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে কুরআনের নির্দেশ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। (বুখারী, ২য় খণ্ড)

## হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইহলোক ও পরলোকের মালিক ও ইখতিয়ার প্রাপ্ত

وكترخيصه فى النياحة لام عطية فى آل فلان خاصة رواه مسلم

وبالتضية بالعتاق لابى بردة بن نيار وغيره ذكر ابن سبع خصائصه وغيره ان الله تعالى اقطعه ارض الجنة يعطى منها ماشاء لمن يشاء.

কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। কিন্তু হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বিশেষভাবে জনৈক ব্যক্তির পরিবারের মধ্যে উম্মে আতিয়াহ্‌কে ক্রন্দন করিবার অনুমতি দান করেন। (মুসলিম শরীফ) হযরত (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আবু বোর্‌দাহ্ (রাঃ)কে ছয় মাস বয়স্ক ছাগল দ্বারা কোরবানী করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ইবনে সাবা' বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে বেহেশ্‌তের জমিনের মালিক বানাইয়াছে, হুজুর যাহাকে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন।

উক্ত বর্ণনাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ ক্রমে ইহলোক ও পরলোকের মালিক ও ইখ্‌তিয়ার প্রাপ্ত। তিনি জমিনের মালিক, আকাশ মন্ডলীর মালিক, স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে জান্নাতের মালিক, জাহান্নামের মালিক, বিশ্বের মালিক, শরীয়তের নির্দেশাবলীর মালিক, আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমুহের মালিক। অনেক মুহাদ্দিছ এবং মুহাক্কেক আলেমগণের বাণীগুলি ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে-

مالك هيں خزانه قدرت كے جو جسكو چاهيں دے ڈاليں

دى خلد جناب ربيعه كو بگڑى لاكهوں كى بنائى هے

"নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আল্লাহ্‌তা'লার কুদরতের ধন-ভান্ডারের সর্বস্ব মালিক। তিনি যাহাকেই ইচ্ছা করেন, দান করিয়া দেন। হযরত রবিয়াহ্ আনসারীকে জান্নাত দান করিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশৃঙ্খলকে সুশৃঙ্খল করিয়াছেন।"

خالق كل نے آپكو مالك كل بنا ديا

دونوں جهاں آپكے قبضه واختيار ميں

"সকলের স্রষ্টা সকলের মালিক করিয়াছেন তোমায়
দু'জাহান রহিয়াছে তোমার অধিকারে ও আওতায়।"



## মাওদুদীর প্রলাপ

উল্লেখিত বর্ণনা সমুহ তো রাসুলের হাদীস ও বিভিন্ন মুহাদ্দেসগণের বাণী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখন আসুন, আমাদের তথাকথিত সৈয়দ আবুল মডারেন মাওদুদী সাহেব বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শানে ও মান-মর্যদায় হাদীসের বিরোধিতা করিয়া কি প্রলাপ শুরু করিয়াছেন!

শুনুন, তিনি 'লণ্ডনের ভাষণ' নামক এক পুস্তিকায় বলেন- "তিনি রাসুল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) যেমন খোদার ধন-ভাণ্ডারের মালিক নন, তেমনি খোদার অদৃশ্য জ্ঞানেও অধিকারী নন বলে সর্বজ্ঞও নন। তিনি অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন তো দুরে, নিজেরও কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে অক্ষম তাঁর কাজ খোদার পয়গাম বান্দার কাছে পৌঁছে দেয়া, কাউকে পথে আনা নয়।"

ইহা বাজে কথার জন্ম-দাতা মাওদুদী সাহেবের বাজে প্রলাপ। তিনি উক্ত পুস্তিকায় আরও লিখিয়াছেন- "যদি তিনিও (মা'আজাল্লাহ) খোদার নাফরমানী করেন কিংবা নিজের মনগড়া কিছু খোদার নামে চালান অথবা খোদার ওহীতে সামান্যতম রদ-বদলের দুঃসাহস দেখান, তা হলে তিনিও খোদার আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না।"

মাওদুদী আরও এক কদম সামনে বাড়িয়া বলেন-"তিনি (রাসুল) কোন কিছু হালাল বা হারাম করতে পারেন না।"

অর্থাৎ শরীয়তের ব্যাপারে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কোন ক্ষমতা নাই। তিনি শরীয়তের হুকুমে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিলে খোদার আযাবের উপযোগী হইবেন, নাউজুবিল্লাহ্। ইহা গোমরাহীর বাপ মাওদুদীর ফয়সালা কৃত প্রলাপ।

আসলে কথা হইল এই যে, জনাব আবুল মডারেন মাওদুদী সাহেব আল্লাহ্‌র কুরআন এবং রাসুলের হাদীসকে নিজের খেয়াল-খুশীর উপর অনুমান করেন এবং তথাকথিত বিজ্ঞানের মাপ কাঠিতে তুলনা করেন। কুরআন-হাদীসের যেই হুকুম তাহার খেয়াল-খুশী অনুযায়ী হইবে, তাহা মানিয়া চলেন, আর যাহা তাঁহার ধ্যান-ধারণার বিরোধী হইবে, তাহার মধ্যে তিনি নিজের মন-গড়া

অপব্যাখ্যা করিয়া সকল মুফাচ্ছের, মুহাদ্দেছ, আইন শাস্ত্রবিদ এবং উম্মতের ঐক্যমতের বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়ান।

অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জামানা হইতে আজ চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত আলেমগণ পথ ভ্রষ্ট ছিলেন, আর এই চৌদ্দ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মাওদুদী সাহেবই কুরআন-হাদীসের সত্যকার ছমঝনেওয়ালা, হেদায়াত প্রাপ্ত! নাউজুবিল্লাহ।

ইহাই সত্য যে, মাওদুদী সাহেবের এই এলম ও বিদ্যা নবুওয়াতের এলম নহে। যেমন, মুহাদ্দেছীনে কেরামের এলম হইল নবুওয়াতের এলম। ইউরোপের নাস্তিকবাদীগণ যেইরূপ বই-পুস্তক পড়িয়া এবং গবেষণা করিয়া কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, মাওদুদী সাহেবের জ্ঞানও তদ্রূপ। কেননা, মাওদুদী সাহেব না কোন উল্লেখযোগ্য উস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, না কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, শুধুমাত্র বই-পত্র পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই তাঁহার জ্ঞান-পিণ্ড। যদিও তাহা ভুল হউক বা শুদ্ধ হউক, ইহাতে তাহার কিছু আসে যায় না।

উস্তাদী সম্পর্ক হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উস্তাদ ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালা, সাহাবায়ে কেরামের উস্তাদ হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম), ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ ছিলেন হযরত হাম্মাদ (রাঃ) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্ত মুফাচ্ছেরীন, মুহাদ্দেছীন ও ফকীহ্‌গণের নিশ্চয়ই কোন না কোন একজন উস্তাদ রহিয়াছেন। অথচ তাঁহারা আরবী ভাষা জানিতেন এবং অনেক ফকীহ্ ও মুহাদ্দেছ আরবের বাসিন্দাও ছিলেন। আরবী ভাষা বুঝিবার পূর্ণ যোগ্যতা তাহাদের মধ্যে ছিল, ইহা সত্ত্বেও উস্তাদের প্রয়োজন ছিল, যাহাতে সেই উস্তাদের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী সুত্রে নবুওয়াতের এলমের ফয়েজ লাভ হয়।

ইউরোপের নাস্তিকবাদীগণ যেইভাবে উস্তাদ ব্যতীত নিজে বই-পুস্তক পড়িয়া বিদ্যার্জণ করিয়া থাকে এবং পথ ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সেইভাবে মাওদুদী সাহেবও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উস্তাদ ব্যতীত নিজে নিজেই বিদ্যার্জন করেন। তাই তিনিও পথ ভ্রষ্ট হন। আর কুরআন-হাদীসের মধ্যে নিজের



ভ্রান্ত কিয়াস বা অনুমানকে অন্তর্ভূক্ত করেন। (নাউজুবিল্লাহ)

মাওদুদী সাহেব তাঁহার লিখিত 'তাজদীদ ওয়া ইয়াহ্‌য়ায়ে দ্বীন' নামক পুস্তকে ফকীহ্ ইমামগণ ও মুহাদ্দেছগণকে জাহেল বা মূর্খ বলিয়া প্রমাণিত করিতে অপপ্রচেষ্টা চালান। আর 'ইসলামের হাকীকত' নামক পুস্তিকায় তিনি বর্ণনা করেনঃ

"ইসলামী শরীয়াতে হানাফী, শাফেয়ী এবং আহ্‌লে হাদীস প্রভৃতি আলাদা আলাদা দল গঠন করার কোনই অবকাশ নাই, এইরূপ দলাদলি একমাত্র মূর্খতার কারণেই হইয়া থাকে।"

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ মাযহাবী ইমামগণ জাহেল ও মূর্খ ছিলেন, বিধায় তাঁহারা ইসলামী শরীয়াতে আলাদা আলাদা মাযহাব ও দল গঠন করিয়াছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

অথচ যাঁহাদের এলমকে সপ্তর্ষি মণ্ডলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এই রকম মুহাক্কেক, অভিজ্ঞ আলেমগণও যেই কোন একটি মাযহাবকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। যেমন ইমাম আবু ইউছুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম জফর, ইমাম মোল্লা আলী কারী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও আল্লামা বোরহান উদ্দীন আল্-মুরগিনিয়ানী প্রমুখ ফকীহ্ ও মুহাদ্দেছগণ হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারী ছিলেন। কিন্তু মাওদুদী সাহেবের বর্ণনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উল্লেখিত মহাপুরুষগণ জাহেল বা মুর্খ হওয়ার কারণেই মাযাহাবকে মানিয়া লইয়াছেন। এই শেষ যুগে বিজ্ঞানের আলোতে দুই-চারটি উর্দু পুস্তক রচনা করার পর মাওদুদী সাহেব সমগ্র পৃথিবীর আলেম, ফকীহ্ ও মুহাদ্দেছগণকে কোথাও পথভ্রষ্ট আবার কোথায়ও জাহেল বা মুর্খ বলিয়া অভিহিত করেন। উই পোকার মত ডানা মেলাতে অন্য কাহাকেও নিজের চোখে দেখিতেছেনা এবং আসমান পর্যন্ত পৌঁছিতে চাহিতেছে।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّىْ وَيَصُوْمُ وَيَحِجُّ وَيَغْزُوْ وَانَّهٗ الْمُنَافِقُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِمَا ذَا دَخَلَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ قَالَ لِطَعْنِهٖ عَلٰى اِمَامِهٖ وَاِمَامِهٖ اَهْلِ الذِّكْرِ

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমি হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে বলিতে শুনিয়াছি, মানুষ নামাজ পড়িবে, রোজা রাখিবে, হজ্ব করিবে এবং জেহাদ করিবে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে মুনাফিক। জনৈক সাহাবা আরজ করিলঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্! কি কারণে তাহার মধ্যে মুনাফেকী ঢুকিয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে মুনাফেক কেন বলা হইতেছে? হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উত্তরে বলিলেনঃ সে পূর্ববর্তী মুহাদ্দেছীন, ফকীহ, সূফী ও বুজুর্গানে দ্বীনকে পথভ্রষ্টে বলিবে এবং তাঁহাদের সমালোচনা করিবে। ইহাই সে মুনাফেক হওয়ার একমাত্র কারণ।" ছুবহানাল্লাহ্! এই চৌদ্দ শতাব্দীর লোকজনের অবস্থাও হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার প্রিয় উম্মতকে বলিয়া দিয়াছিলেন।

## মাওদুদী কে?

পাঠকবৃন্দ! এখন মাওদুদী সাহেবের ফয়সালা আপনারা নিজেই করুন। হাঁ, আমরা মাওদুদী সম্পর্কে ইহা বলিতে পারি যে, তিনি বড় রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং বে-আদব ও মুল্হিদ অর্থাৎ তিনি মুহাদ্দেছীন ও ফকীহ্ ইমামগণ সম্পর্কে যেই অশ্লীল ভাষায় প্রলাপ বকিয়াছেন, ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রথম শ্রেণীর বে-আদব।

মাওদুদী সাহেব কোন আলেমে দ্বীন নহে। ইহা প্রত্যেক দলের আলেমগণের সর্বসম্মত কথা। ইহা সম্পর্কে প্রত্যেক দলের আলেমগণ বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। (তাঁহার কিতাব 'তাফ্হীমাৎ' দ্রষ্টব্য)

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মাওদুদী সাহেব ছহীহ্ হাদীস ও সাহাবাগণের বাণী সমুহ পরিত্যাগ করিয়া নিজের খেয়াল-খুশীমতে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কিতাবের অনেক জায়গায় মওজুদ আছে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা এইখানে সংকুলান হইবেনা। ইন্শাআল্লাহ্ অন্যত্র তাঁহার সকল অবস্থা এবং আসল রূপটি বর্ণনা করা হইবে।

আসলে কথা হইল এই যে, বর্তমান যুগের সাদাসিদা ও সরল প্রকৃতির মুসলমানগণকে ধোকা দেওয়ার জন্য তিনি 'জামায়াতে ইসলামী' নাম দিয়া নিজেকে 'মুজাদ্দেদ' বলার জন্য পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের ঐক্যমতের বিপরীত এক 'নতুন ইসলামের' বুনিয়াদ পত্তন করেন। এই রকম ধোকায়



লিপ্ত না হওয়া মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। কেননা, ইসলামের যেই আসল অর্থ এবং বাস্তব ইসলামের যেই প্রকৃত পরিধি রহিয়াছে, মাওদুদী উহা হইতে অনেক দূরে এবং উহার আওতা বহির্ভূত। তিনি তো একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনীতিবিদ নেতা। হাকীকতে ইসলাম বা ইসলামের আসল রূপের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক আছে? তিনি তাঁহার রচনাবলীতে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দেছ দেহলভী এবং মুজাদ্দেদ আল্ফে-সানী প্রমুখ ইসলামের বড় বড় মহাপুরুষগণের এবং সাহাবায়ে কেরামের অশ্লীল ভাষা দ্বারা অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। ইসলামের যেই বিধান মাওদুদী সাহেবের মতের বিরোধী হইবে, তাহা যদিও রাসূলের বাণী হউক না কেন, তবুও উহা তাঁহার মতে দুরস্ত নহে। আল্লাহ্ তা'লার লাখো শুকরিয়া যে, বর্তমানে নবুওয়াতের পদ বন্ধ। নতুবা মাওদুদী সাহেব নিজে নবী বলিয়া দাবী করিয়া বসিতেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং ইসলামের মহাপুরুষগণ যাঁহারা সমগ্র বিশ্বের সমর্থন লাভ করিয়াছেন, আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের সমালোচনার কোন নজীর নাই শুধু মাত্র মাওদুদীর রচনাবলীই ইহাতে পরিপূর্ণ।

## মাওদুদীর যুক্তি ও বিবেকের ফয়সালা

মাওদুদী সাহেব প্রত্যেক কাজে যুক্তি ও বিবেকের ঘোড়া দৌড়াইয়া থাকেন। কুরআনের যে আয়াত, রাসুলের যেই হাদীস এবং ইমামগণের যেই উক্তি তাঁহার ধ্যান-ধারণা ও যুক্তির মাপকাঠি অনুযায়ী হয়, তিনি শুধু উহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যেই আয়াত, হাদীস এবং ইমামগণের উক্তি তাঁহার ধ্যান-ধারণার বিপরীত হয়, উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। ইবনে তাইমিয়্যারও এইরূপ অভ্যাস ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, হাদীসে আছে- বিতর নামাজে সূরা এখ্লাস, সুরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিবে। কিন্তু ইহা সম্বন্ধে ইবনে তাইমিয়্যা যুক্তি ও বিবেকের ঘোড়া দৌড়াইতে আরম্ভ করেন, তিনি বলিলেনঃ সূরা এখ্লাস তো সূরা ফালাক ও সূরা নাস হইতে ছোট। অতঃপর প্রথমে সূরা এখ্লাস পাঠ করা এবং তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা কিভাবে দুরস্ত হইতে পারে? এই কারণে ইবনে তাইমিয়্যা উক্ত হাদীসটি মানেন না। তদ্রূপ মাওদুদী সাহেবও ইবনে তাইমিয়্যার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলেন। ইবনে তাইমিয়্যা যেইরূপ হউক না কেন, তবুও তিনি একজন বড় আলেম এবং হাদীসের হাফেজ ছিলেন, কিন্তু মাওদুদী

সাহেব তো সেইরূপ কোন আলেম নহেন, বরং একজন রাজনৈতিক নেতা বটে।

কোন কোন সাদাসিধা মুসলমান ভাই বলিয়া থাকে যে, "মাওদুদী সাহেবের চিন্তাধারা অনেক উর্ধ্বে।" ইহা এক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সত্য কথা যে, মাওদুদী সাহেব মুজাদ্দিদ ও মুজ্তাহিদ বলিয়া প্রচার করিবার খেয়াল ও চিন্তাধারা অবশ্যই আছে। তাই তিনি সমস্ত মুহাদ্দেছীন, ফকীহ্, সুফী, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ এবং মাযহাবী ইমাম ও আলেমগণকে জাহেল বা মূর্খ বলিয়া বকাবকি করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার রচিত 'তাজ্দীদ ওয়া ইয়াহ্য়ায়ে দ্বীন' নামক কিতাবটি দ্রষ্টব্য। ইহা 'ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন' নামে বাংলায় অনুদিত হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে কোন কোন মুসলমান ভাই ইহাও বলিয়া থাকে যে, "মাওদুদী সাহেবের বই-পুস্তকের ভাষা অত্যন্ত কঠিন, উহা বুঝা দায়, যে কোন লোকে উহা বুঝিতে পারেনা। সুতরাং তাঁহার ভাষা বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ তাঁহার সমালোচনা করিয়া থাকে।"

বন্ধুগণ! চিন্তা করুন এবং ভাবিয়া দেখুন যে, আপনাদের উক্ত কথা কতদুর সঠিক হইতে পারে? মাওদুদী সাহেবের কিতাব তো আর আসমানী কিতাব নহে। তাঁহার কিতাব তো কোন নূতন ভাষায় নাজিল হয় নাই যে, উহা নবী ছাড়া অন্য কেহই বুঝিতে পারিবেনা! অথচ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে এইরূপ আলেমও বোধ হয় বিদ্যমান আছেন-যাঁহারা আসমানী কোন নূতন কিতাবও নাজিল হইলে, উহা পড়িতে ও বুঝিতে পারিবেন। ততদুর ক্ষমতা আমাদের এবং আপনাদের মাঝে না থাকার দরুণ অন্য মুহাক্কেক ও অভিজ্ঞ আলেমগণকেও নিজের স্বল্প জ্ঞানের উপর অনুমান করা বোকামী ছাড়া আর কি হইতে পারে? বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের যেই আলেমগণ মাওদুদীর বিরুদ্ধে কলম ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহারই কিতাব-পত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়া তাঁহার কিতাব-পত্রের সারমর্ম পুস্তকাকারে ছাপাইয়া জনসাধারণের সম্মুখে মাওদুদীর ভ্রান্ত আকীদা এবং আসল রূপটি তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কি কেহই মাওদুদীর লেখা ও কথা বুঝিতে পারেন নাই? আর মুহাক্কেক ও অভিজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে কেহই যদি তাঁহার কথা বুঝিতে না



পারেন তবে তাঁহার ভাষা ছমঝ্‌নেওয়ালা সেই ব্যক্তিটি কে? হে! নগণ্যের চেয়ে নগণ্য প্রত্যেক সাধারণ উর্দু পাঠকও মাওদুদীর কিতাব বুঝিতে পারে।

মাওদুদীর স্বদেশী ও সমবয়সী মুহাক্কেক ও অভিজ্ঞ আলেমগণও তাঁহার আক্বীদা ও রচনার কঠোর প্রতিরোধ করিয়াছে। যেমন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবর আক্বীদাগুলি তাহার ছোট ভাই ছোলাইন বিন আবদুল ওহাব প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

মাওদুদীর চরিত্র, আকীদা-বিশ্বাস, তাঁহার রচনার অবস্থা, তাঁহার লিখিত বই-পত্রের আসল রূপটির উপর প্রত্যেক চিন্তাশীল, মুহাক্কেক ও অভিজ্ঞ আলেমগণ কলমের অনেক কালি খরচ করিয়াছেন। বিশেষতঃ 'আয়েনায়ে মাওদুদীয়াত' (মাওদুদীর স্বরূপ) 'মোকালেমায়ে কাজেমী ওয়া মাওদুদী' (কাজেমী ও মাওদুদীর কথোপকথন) এবং 'ইন্‌কিশাফাত' (মাওদুদীর নগ্নরূপ) ইত্যাদি কিতাবগুলি অবশ্যই আপনারা পাঠ করুন। এই কিতাবগুলিতে মাওদুদী সাহেবের গোবর ফাঁস করা হইয়াছে এবং তাঁহার ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস ও রচনার গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। এমনকি কোন কোন কিতাবে তাঁহার রচিত কিতাবগুলির শব্দের তাৎপর্য্যও আলোচিত হইয়াছে। 'ইন্‌কিশাফাত'(মাওদুদীর নগ্নরূপ) একটি পাঠোপযোগী কিতাব, ইহাতে প্রত্যেক দলের আলেমগণের দস্তখতকৃত ফতোয়া মওজুদ আছে।

এলাহাবাদ গরীবে নেওয়াজ দারুল উলুম মাদ্‌রাসার মুহ্‌তামেম আল্লামা মোস্তাক আহমদ নেজামী ছাহেবের রচিত 'জামায়াতে ইসলামী কা শীশ্‌মহল' এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। এই কিতাবে আল্লামা নেজামী ছাহেব জামায়াতে ইসলামের 'শীশ্ মহলের' সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। তিনি নিজের পক্ষ হইতে কিছু লেখেন নাই। মাওদুদী সাহিত্যের এলোমেলো উক্তি সমুহ বরাত সহকারে লেখনী শক্তির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করিয়াছেন। আল্লামা বলেন-

انھیں کی محفل سنوارتاھوں چراغ میرا ھے رات انکی

انھیں کے مطلب کی که رھا ھوں زبان میری ھے بات انکی

"তাদের সভা শোভিত করছি, বাতি আমার নিশী তাদের,
তাদের মতলব বল্‌ছি আমি, কণ্ঠ আমার কথা তাদের ॥"

ছুব্‌হানাল্লাহ্!

আল্লামা নেজামী ছাহেব দুই লাইনেই নিজের কিতাবের সারমর্ম বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এই জামানার কোন কোন পীর, সুফী দরবেশও মাওদুদীর অনুসারী হইয়া বসিয়াছেন। অথচ মাওদুদী সাহেব সুফী-দরবেশ, জুব্বা-পরিহিত ব্যক্তি, মুরাকাবা-মুশাহাদা, চিল্লাদান, ওজিফা পাঠ ইত্যাদি পীর ও দরবেশগণের রীতি নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। মাওদুদী রচিত 'তাজ্‌দীদ ওয়া ইয়াহ্‌য়ায়ে দ্বীন' বা 'ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন' বইটি পড়িয়া দেখুন। আল্লাহতা'লা সকল মুসলমানকে বুঝিবার তৌফিক দান করুন।

## নবীগণ গুনাহ করিতে পারে কি না?

পাঠকবৃন্দ! আপনারা মাওদুদী সাহেবের দ্বীনদার এবং জ্ঞান-গভীরতার প্রতি লক্ষ্য করুন, তিনি 'তারজুমানুল কুরআন এবং 'তাফহীমাত' পুস্তিকাগুলিতে লিখিয়াছেন-

انبیاء کرام گناه کر سکتے ھیں اور بڑے بڑے نبیوں سے بڑے بڑے گناه ھوئے ھیں.

"নবীগণ গুনাহ্ করিতে পারেন এবং বড় বড় নবীগণ হইতে বড় বড় গুনাহ্ সংঘটিত হইয়াছে।"

তাঁহার উল্লেখিত বাক্যের ফলাফল কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, মাওদুদীর নিকট তাহার খবরও নাই।

দেখুন, 'নুরুল-আনোয়ার' নামক কিতাবে আছে-



اِذَا ارْتَکَبَ کَبِیْرَۃً الخ سَقطت عَدَالَتُه

"যখন কোন ব্যক্তি কবীরাহ্ বা বড় গুনাহ্ করিয়া বসে, তখন তাহার আদালত নষ্ট হইয়া যায়।"

وَالْعَدَالَةُ وَهِیَ الْاِسْتِقَامَةُ فِی الدِّیْنِ

"আর আদালত অর্থ ধর্মের উপর অটল থাকা।"

অতঃপর মাওদুদীর কথা অনুযায়ী যদি নবীগণ কবীরা গুনাহ্ বা বড় গুনাহ্ করিয়া বসেন, তবে নবীগণ ধর্মের উপর অটল না থাকাই প্রমানিত হয়। আর যিনি ধর্মের উপর অটল থাকিবেন না, তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা তো দূরের কথা, তাঁহার পয়গাম এবং কথা-বার্তাও গ্রাহ্য হইবেনা। যে ব্যক্তির আদালত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা অগ্রাহ্য। এখন মাওদুদীর বক্তব্য অনুযায়ী নবীগণের কথা-বার্তা গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইল। যখন নবীগণের কথা-বার্তা গ্রহণযোগ্য নহে তবে ধর্ম কি ভাবে রহিল? বাস্তব পক্ষে সমস্ত ইমাম, মুহাদ্দেছ, মুফাচ্ছের ও আলেমগণের সর্ব সম্মত মাছয়ালা যে -

اَلْاِحْتِرَازُ عَنْ جَمِیْعِ ذٰلِكَ مِنْ خَوَاصِّ الْاَنْبِیَاءِ.

"বড় গুনাহ্ হউক বা ছোট গুনাহ্ হউক, সকল প্রকার গুনাহ্ হইতে বিরত থাকাই নবীগণের পরম ও চরম বৈশিষ্ট্য।"

মাওদুদী সাহেব বলেন-না, গুনাহ্ করাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। (নাউজু বিল্লাহ)

ইহার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হইল যে, মাওদুদীর ধারনা মতে নবীগণের ধর্ম ত্রুটি মুক্ত নহে। জানিনা, মাওদুদী সাহেবও কোন কোন সময় দ্বীনে ইসলামের ধূয়াও উড়াইয়া থাকেন কেন? ধর্মের মুলে কুঠারাঘাত করিয়া উহার আগায় পানি বর্ষণ করিতেছে! ধর্ম প্রচারকদের গায়ে কালি ছিটাইয়া আবার ধর্মের রক্ষকও সাজিতেছে! ইহা কোন প্রকার দর্শন?

## নবীর দুর্নাম করিলে নিজেই কাফের হইয়া যায়

'নওয়াদেরুল ফতোয়া' নামক কিতাবে আছে-

هرکه پیغمبری را بعیب ونقص یاد کند اگرچه اندك بود کافر شود.

"যদি কোন ব্যক্তি কোন দোষ-ত্রুটি ও মান হানিকর কোন কথা বার্তার দ্বারা কোন নবীকে স্মরণ করে, যদিও উহা কিঞ্চিত পরিমাণ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।"

কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রাঃ) তাঁহার রচিত 'মা-লা-বুদ্দাহ্ মিন্হু' নামক কিতাবে লিখিয়েছেন–

هر ملعونی که در جناب پاك سرور کائنات دشنام دهد یااهانت کند در امری از امور دین او یا در صورت مبارك او یا در وصفی از اوصاف او خواه آنکس مسلمان بود یاذمی یا حربی اگرچه از راه هزل کرده باشد کافر ست واجب القتل توبه او مقبول نیست اجماع امت بر آنست که بے ادبی بهرکس از انبیاء کفر ست خواه فاعل او حلال دانسته مرتکب شود یاحرام دانسته.

"যেই অভিশপ্ত ব্যক্তি হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে গালা-গালি করিবে অথবা তাঁহার ধর্মের কোন বিষয়ে অবমাননাকর কথা বলিবে, অথবা তাঁহার ছুরত বা কোন গুণাবলীতে অপমানজনক কোন কিছু সংযুক্ত করিবে, তবে সেই ব্যক্তি মুসলমান হউক বা জিম্মী অথবা বিধর্মী রাষ্ট্রের হউক, কাফের হইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক কতল করা ওয়াজিব। তাহার তওবা কবুল হইবেনা। উম্মতে মুহাম্মদীয়া এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে যে, নবীদের শানে কোন প্রকার বে-আদবী করা কুফরী। যদিও বে-আদবীকারী উহা হালাল জানিয়া করে বা হারাম জানিয়া করে।"



উক্ত কিতাবের অন্যত্র বলা আছে–

هرکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را عیب کرد یا موی مبارکش را مویك گفت کافر شود.

"যদি কেহ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দুর্নাম করে অথবা তাঁহার দাঁড়ী মুবারককে ঘৃণা সহকারে কিছু বলে, তবে সেই লোকটি নিশ্চয়ই কাফের হইয়া যাইবে।"

چلپی میں ہے من قال ان النبی صلی الله علیه وسلم هزم فی بعض غزواته یستتاب فان تاب فبها ونعم والا قتل لانه تنقص.

অর্থাৎ "কেহ যদি এই কথা বলে যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কোন কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়াছেন, তবে সে তওবা করা উচিত যদি সে তওবা করে, তবে ভালই করিল, নতুবা তাহাকে কতল করা যাইবে। কারণ সে নবীর মান হানিকর কথা বলিয়াছে।"

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ) তাঁহার রচিত "তফসীরে কবীর" নামক কিতাবে বর্ণনা করেন- "যদি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম গুনাহ্ করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের উপর উহার অনুসরণ করা ওয়াজিব হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ গুনাহ্ করা আমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িবে। কারণ, কুরআন শরীফে বলা হইয়াছে-

فَاتَّبِعُوْنِىْ "তোমরা আমার অনুসরণ করিয়া চল, যেন খোদার মুহাব্বত তোমাদের হাসিল হয়।"

যদি নবী হইতে গুনাহ্ সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে উম্মতের জন্য গুনাহ্ করা ওয়াজিব হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু, যদি নবী হইতে গুনাহ্ সংঘটিত হয়, তবে সেই নবী উম্মতের মাঝে প্রথম শ্রেণীর গুনাহ্গার হইবে। কারণ, নবী হইতেই প্রথমে গুনাহ্ সংঘটিত হইয়াছে, পরে গুনাহ্গার উম্মত হইতে গুনাহ্ প্রকাশ পাইয়াছে। এখন গুনাহ্গার উম্মত গুনাহ্ করার ব্যাপারে নিজের নবীর অনুসারী এবং নবী তাহার জন্য অনুসরণীয় ও ইমামে পরিণত হইয়াছে, (নাউজুবিল্লাহ্)।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, খারেজীরা যেমন ফুজায়লা খারেজী বলিয়াছে- "নবী হইতে গুনাহ্ সংঘটিত হইয়া থাকে।" এই খারেজীদের মতে উক্ত গুনাহ্ বলিতে কুফরী ও শির্ককে বুঝায়। অতঃপর তাহারা বলিয়া থাকে যে, "নবী হইতে কুফরীও প্রকাশ পায়।" ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিলে 'তফসীরে কবীর' '১ম খণ্ড পাঠ করুন।

তদ্রূপ আবুজ্জুনুব (পাপ রাশির জনক) মাওদুদী খারেজী সাহেবও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে কবীরা গুনাহ্ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন তাঁহার রচিত 'তাফ্হীমাত' নামক পুস্তকে আছে-"আল্লাহ্তা'লা ইচ্ছা করিয়া নবী হইতে গুনাহ্ সংঘটিত করাইয়া থাকেন।"

মাওদুদীর এই বিষাক্ত তীর দুই দিকে জখম করিয়াছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ্তায়ালার পাক পবিত্রতার মধ্যে, দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নবুওয়াতের মধ্যে। (নাউজুবিল্লাহ্)

মুসলমান ভাইগণ! আপনারা জানিয়া রাখুন, আল্লাহ্পাক স্বইচ্ছায় কোন লোক হইতে গুনাহ্ সংগটিত করাইয়া থাকেন না। যদি এইরূপ হয়, তবে আল্লাহ্ পাকও অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। আর তখন আল্লাহ্তা'লা 'ছুব্হান' বা পবিত্র থাকিবেন না। (নাউজুবিল্লাহ্)

বন্ধুগণ! আপনারা মাওদুদীকে মানেন বা না মানেন, ইহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমরা তো ইহা কামনা করি যে, কোথায়ও যেন আপনাদের পরিণাম ফল খারাপ না হয়। তবুও যদি আপনারা নিজের জেদ বা হঠকারীতা এবং ঘৃণিত ও ভূল চিন্তাধারা হইতে ফিরিয়া না আসেন, তবে আপনাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্পাকের উপর সোপর্দ করা হইল।



বেরাদরানে ইসলাম!

আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, মাওদুদী সাহেবের উক্তি দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে গুনাহ্ সংগটিত হওয়া সম্ভব। যেমন বাকিল্লানী মুলহিদ বলিয়াছেন- "যখন নবী করীম ছ(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে কোন জিনিস হইতে নিষেধ করা হইয়া থাকে, তারপর তিনি যদি উক্ত নিষিদ্ধ কাজটি করিয়া বসেন, তবে তাঁহার এই কাজের দ্বারা উক্ত নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবেনা, তিনি উক্ত কাজটি খোদার নাফরমানী হিসাবেও করিতে পারেন এবং তাঁহার এই নাফরমানীর ব্যাপারে প্রতিবাদ করা সাহাবায়ে কেরামের উপর ফরজ নহে।" (নাউজুবিল্লাহ)

তদ্রূপ মাওদুদী সাহেবেরও একই মত। তিনি নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে মাছুম নিষ্পাপ বলিয়া মানেন না। আসল কথা হইল-মাওদুদী সাহেব যেইরূপ গুনাহ ও পাপে লিপ্ত, সেইরূপ তিনি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কেও গুনাহে লিপ্ত বলিয়া ধারণা করিতেছেন।

খোদার কৃছম, কাফের এবং নাস্তিক ব্যতীত এইরূপ কথা কোন মুসলমানের দ্বারা হইতে পারে না।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মাওদুদী সাহেব কবীরা গুনাহ্ যেমন কুফরী, জ্বেনা, হারাম কাজ বা চুরি প্রভৃতি গুনাহ্ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পক্ষ হইতে সংগটিত হওয়া জায়েজ রাখিয়াছেন। যেমন তাঁহার কিতাবের ভাষার ভাব-ভঙ্গি হইতে প্রকাশ পাইতেছে।

পাঠকবর্গ! বর্তমানে মাওদুদী সাহেবের অধিকাংশ কিতাব বাংলাভাষায় অনুদিত হইয়াছে। যেমন 'লণ্ডনের ভাষণ' 'ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন' 'তাফ্হীমাত' ও 'রছায়েল ও মছায়েল' ইত্যাদি বইগুলি গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করুন।

মহাশয়! ইসলামের জন্য ইহা হইতে আর কি বড় ধোকা হইতে পারে? আল্লাহ্পাক সকল মুসলমানকে হেফাজত করুন, যেন কেহই ইচ্ছাকৃতভাবে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জন্য কোন ছগীরা বা কবীরা গুনাহ্ জায়েজ বলিয়া মনে না করে। যেহেতু আল্লাহপাক নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে উত্তম নমুনা ও আদর্শ রাখা হইয়াছে।" সুতরাং আল্লাহতা'লা কোন নাফরমান ও গুনাহ্গারের গুনাহ্কে (তাহা ছগীরা গুনাহ হউক বা কবীরা গুনাহ) নমুনা ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে হুকুম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

মুসলমান ভাইগণ! এই নাস্তিক দ্বারা ধর্ম ও মুসলিম জাতি বে-ইজ্জত হওয়া সম্পর্কে আপনারা আশ্চার্য্যন্বিত না হইয়া পারিবেন না। মাওদুদী সাহেব লণ্ডনের খ্রীষ্টানদিগকে খুশী করিবার জন্য এবং তাহাদের 'বাহ্বা' অর্জনের জন্য এই ভাষণ দান করেন-

"আমাদের ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) না অতি মানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত।"

মাওদুদীর উক্ত ভাষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিশ্বনবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আফ্জালুল্ বশর তথা মহামানব নহে, (নাউজুবিল্লাহ)।

অথচ সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীয়া ঐক্যমত পোষণ করে যে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আফ্জালুল্ বশর ও মহামানব এবং মকামে আব্দীয়াত বা বান্দা হওয়ার উচ্চ আসনে এবং উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। মাওদুদীর উক্ত বক্তব্য অনুযায়ী নাস্তিক বাকিল্লানীর ধারণাও ছিল। সে নবী ও রাসুল ছাড়া অন্যান্য লোকও নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে উত্তম হওয়া অথবা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) অন্যান্য লোক হইতে উত্তম না হওয়া জায়েজ এবং সম্ভব বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

মুসলমান ভাইগণ! আপনারা ভাবিয়া দেখুন, যখন আহমদ বিন খাবেত বলিল যে, হযরত আবু জার জনাবে রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে অধিকতর মুত্তক্বী ও আবেদ ছিলেন, তখন সমস্ত মুহাক্কেক আলেমগণ তাহার পিছনে লাগিলেন এবং তাহার উক্ত বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করিলেন। এখন সেই আহমদ বিন খাবেতের চেয়ে লক্ষগুণ নাপাক এবং অশ্লীল শব্দ মাওদুদীর লিখিত ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। আর আমরা এবং আপনারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়া বসিয়া রহিয়াছি, অধিকন্তু, মাওদুদীর উক্ত কাজ



কে ইসলামের খেদমত বলিতেছি। ইহা কোন প্রকার ইসলাম হইল জানিনা।

বন্ধুগণ! নিশ্চয়ই উক্ত ব্যক্তিটি ইসলামের নামে ধোকাবাজী করিতেছে, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাইতে পারেনা। কেননা, তাহার মুখ এবং কলম হইতে যেই সব কথা বাহির হইয়াছে, উহা কোন মুসলমানের মুখ এবং কলম হইতে বাহির হইতে পারেনা।

মাওদুদীর আশঙ্কা ছিল, সে যদি মুহাম্মদ মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নবুওয়াতকে সরাসরিভাবে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়, তবে জনসাধারণ তাহাকে পাথর ছুড়িয়া 'কুত্তার' মত মারিয়া ফেলিবে। তাই সে একটু চালাকির মাধ্যমে জনসাধারণের সম্মুখে এমন কথা বর্ণনা করিয়া দিল, যদ্বারা সে অদুর ভবিষ্যতে তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপ নামধারী মুসলমানের মুখ এবং কলম দিয়াই ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে এইরূপ কথা বাহির করানো ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ অহরহ চেষ্টা করিতেছে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, ঐ জাতীয় লোকেরাই এইসব নিছক কুফরী করিতে পারে, যাহারা ইসলামের নামে ধোকাবাজী করিয়া থাকে। আর যাহারা ঐ সব ধোকাবাজকে সৎ ও সাধু বলিয়া মনে করিয়া থাকে তাহারাও ঐ প্রকার ধোকায় লিপ্ত রহিয়াছে। আল্লাহ্পাক সকল মুসলমানকে হেফাজত করুন।

জানিয়া রাখা উচিত যে, যতগুলি গোমরাহ্ ফের্কা ও ভণ্ড দল আছে, আল্লাহ্ পাক তাহাদের মাধ্যমে কোন মঙ্গল তথা দ্বীনে ইসলামের উপকারী কোন কিছু প্রকাশ করান নাই, তাহাদের দ্বারা বিধর্মী দেশগুলি হইতে না কোন দেশ জয়লাভ হইয়াছে, না কোনখানে ইসলামের পতাকা বুলন্দ করা হইয়াছে, বরং এইসব লোক সর্বদা মুসলমানদের শান্তি-শৃঙ্খলায় আঘাত হানিতে থাকে, ঈমানদারগণের ঐক্য ও সংহতির মাঝে ফাটল সৃষ্টি করিতে থাকে, ইসলামী বিশ্বে ফাসাদ ও বিশৃঙখলা সৃষ্টির জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে।

মাওদুদীর একটি বাহাদুরী এই-তিনি সাদাসিধা মুসলমান এমন কি কোন কোন ছুফী আলেম সাহেবের চোখে ধুলা দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

মাওদুদী সাহেব 'ইসলামের হাকীকত' নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন-"ইসলামী শরীয়াতে হানাফী, শাফেয়ী ও আহলে হাদীস প্রভৃতি আলাদা মাযহাব গঠন করার কোনই অবকাশ নাই, ইহা একমাত্র মূর্খতার কারণেই হইয়া থাকে।"

এইদিকে তাঁহার এই বক্তব্য, আর ঐদিকে তিনি 'জামায়াতে ইসলামী' নাম দিয়া একটি আলাদা মাযহাব তৈয়ার করিয়া বসিয়াছেন, যদ্বারা মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে একটি বড়ই ফাটল সৃষ্টি হইয়াছে।

মাওদুদী সাহেব সাহাবায়ে কেরামের সহিত কি কি বে-আদবী করিয়াছেন, উহা সময় বিশেষ প্রকাশ করা হইবে।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মাওদুদী সাহেব কোন কোন কথায় ইবনে তাইমিয়্যা এবং ইবনে কাইয়্যমের অনুসরণ করিয়া থাকেন, আবার কোন কোন মাছয়ালায় নাস্তিক বাকিল্লানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলেন এবং কোন কোন মাছয়ালায় তাঁহার মন-গড়া খেয়াল ও ধ্যান-ধারণার বশীভুত হইয়া কাজ করেন। আল্লাহপাক আমরা এবং সকল মুসলমানকে সর্বদা সৎপথে পরিচালিত করুন আর এইরূপ ভণ্ড ও ধোকাবাজ হইতে হেফাজত করুন। আমিন!

## মাওদুদী ছহীহ হাদীসকে মিথ্যা বলিয়াছে

মাওদুদী সাহেব তাঁহার রচিত 'রছায়েল ও মছায়েল' নামক কিতাবে হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর হাদীসকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। দাজ্জাল সম্পর্কে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ ও তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে প্রায় চল্লিশটির মত বিভিন্ন হাদীস মওজুদ আছে। ঐ সমস্ত হাদীসের নির্ভূলতা সম্পর্কে কোন মতানৈক্যও হইতে পারেনা। তবুও মাওদুদী সাহেব তাঁহার বিবেকের ঘোড়া দৌড়াইয়া ঐ হাদীসগুলি লইয়া বেশ তামাশা করিয়াছেন। তদ্রূপ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উম্মত তিয়াত্তর (৭৩) দলে বিভক্ত হইবে বলিয়া যেই হাদীসটি আছে, উহাকে তিনি ১৯৫৪ ইংরেজীর তাঁহার লিখিত 'তারজুমানুল্ কুরআন' নামক মাসিক পত্রিকার ৩২ পৃষ্ঠায় 'আফ্সানা' বা বানানো কেচ্ছা-কাহিনী ও রূপকথা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন-"ইহার অনেক বড় অংশ কাগজের অস্তিত্ব ছাড়া না পূর্বে অস্তিত্ব ছিল, না এখনও আছে।"

পাঠকবর্গ! আপনারা দেখুন, মাওদুদী কিভাবে ছহীহ হাদীসের বে-ইজ্জতি করিয়াছে এবং মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে! অথচ ঐ হাদীসটি ছহীহ্ তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ প্রভৃতি বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণনা করা



হইয়াছে, আর মাওদুদী সাহেবের দৃষ্টিতে উহা কাগজের অস্তিত্ব এবং বানানো কেচ্ছা-কাহিনী ও রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নহে।

মুসলমান ভাইগণ! আপনারা আইনের চোখে দেখুন, মাওদুদী হযরত রসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শানে মানহানিকর কি প্রকার বকাবকি করিয়াছে! আর সাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দেছীন, মুফাচ্ছেরীন, ফকীহ্গণ, ইমামগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরামের শানে কিরূপ অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। আপনারা তাহার বিভিন্ন পুস্তকাদি গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করিয়া দেখুন। মাওদুদী সাহেব নিজেই 'তাজ্দীদ ওয়া ইয়াহ্য়ায়ে দ্বীন' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন-

میں سلف کو بے خطا نہیں سمجھتاھوں.

"আমি পূর্ববতী মনিষীগণকে নির্ভূল বলিয়া মনে করিনা।"

পাঠকবর্গ! হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফে-সানী ও হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহ্লভী প্রমুখ বুজুর্গানে দ্বীনের মত মহাপুরুষগণও মাওদুদীর বিষাক্ত ছোবল হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। (মাওদুদী রচিত 'তাজ্দীদ ওয়া ইয়াহ্য়ায়ে দ্বীন, বা 'ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন' বইগুলি দ্রষ্টব্য)। এমনকি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, বুখারী শরীফের হাদীস সমুহ, সাহাবায়ে কেরাম ও মুহাক্কেক ওলামায়ে কেরামও মাওদুদী কৃত সমালোচনা হইতে রেহাই পান নাই। আল্লাহ্পাক মুসলমানগণকে মাওদুদীর ফেৎনা হইতে হেফাজত করুন। আমিন!

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাদের মত মানুষ কি না

কওমে নূহ্, কওমে আ'দ ও কওমে ছামুদের লোকেরা আল্লাহ্র নবীগণের শানে বে-আদবী করিতে গিয়া বলিয়াছিল-

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

"তোমরা তো আমাদের মত মানুষ।।" (আল্-কুরআন) ফেরাউনী লোকেরা হযরত মুছা ও হারুন (আঃ) কে বলিয়াছেন-

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

"আমরা কি আমাদের মত দুইজন মানুষের উপর ঈমান আনিব?" (আল্-কুরআন)

কাফের সর্দারগণ হযরত নূহ্ (আঃ) কে বলিয়াছিল-

مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا

"আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখিতেছি।" (আল-কোরআন)

হযরত ছালেহ (আঃ) কে কাফেরগণ বলিয়াছিল-

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

"তুমি তো আমাদের মতই মানুষ।" (আল্-কুরআন)

হযরত হুদ (আঃ) সম্পর্কে কাফেরগণ বলিয়াছিল-

مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ.

"এই লোকটি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, তোমরা যাহা আহার কর, সে উহা আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর, সে উহা পান করে।" (আল-কুরআন)

ওলীদ নামক কাফের নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে মানুষ বলিয়াছিল। যেমন-

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

"ইহা মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নহে।"

কুরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্র নবীগণকে নিজের মত মানুষ বলা কাফেরগণের প্রধান আলামত।

মাওদুদী সাহেব তাঁহার এক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন-

رسول نہ فوق البشر ہے نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر ہے۔



"রাসুল না অতি মানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত।" (লণ্ডনের ভাষণ,১১ পৃষ্ঠা)

জানিনা, এইখানে তিনি 'অতি মানব' বলিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন! অথচ সমস্ত মুহাক্কেক আলেমগণ এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মানবীয় গুণাবলী এবং নূরানী গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত ছিলেন। কোন কোন সময় নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উপর মানবীয় গুনাবলী প্রভাব বিস্তার করিত এবং কোন কোন সময়ে নূরানী গুণাবলী প্রভাব বিস্তার করিত। যেমন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জীবনেতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহন করে। আর সমস্ত মুহাদ্দেছ এবং মুফাচ্ছেরগণের বর্ণনা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়।

হাদীসে আছে- একদা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইফ্তার করা ব্যতীত অনবরত রোজা রাখিতে শুরু করিলেন। সাহাবায়ে কেরামও হুজুরের দেখাদেখি অনবরত রোজা রাখিতে আরম্ভ করিলেন। এই অনবরত রোজা রাখার দরুণ নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম দুর্বল হইয়া পড়েন। তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহাদিগকে বলিলেনঃ أَيُّكُمْ مِثْلِي "তোমাদের মাঝে আমার মত কে আছ?

এই হাদীসের আলোকে মুহাদ্দেছীনে কেরাম বর্ণনা করিয়াছেন- নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মানবীয় গুণাবলীর উপর কখনও নুরানী গুণাবলী প্রভাব বিস্তার করিত এবং কখনও নুরানী গুণাবলীর উপর মানবীয় গুণাবলীর প্রভাব বিস্তার করিত।

মাওদুদী সাহেব যদি 'অতি মানব নহে' বলিতে রাসুলে পাক (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কেও সকল আদম-সন্তানের মত মানুষ বলিয়া মনে করেন, তবে ইহা মারাত্মক ভুল হইবে। কারণ, নবীর মধ্যে এইরূপ নূরানী শক্তি হওয়া আবশ্যক, যাহা অন্যান্য সকল মানুষ হইতে নবীকে উচ্চ আসনের অধিকারী করে। মাওদুদীর উক্তি 'রাসুল না অতি মানব' এই কথার মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হইতেছে, কারণ মাওদুদী সাহেব রাসুলকে মানবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, অথচ রাসুলের মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর সাথে

সাথে নূরানী গুণাবলীরও বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। আর উহা খোদার পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। নতুবা, রাসুল সাধারণ মানুষের মত হইয়া যাইবে, তখন রাসুল আর রাসুল থাকিবেনা।

## নবীগণের রূহের তাৎপর্য বর্ণনা

নবুওয়াতের বাহক বা নবীর রূহের মধ্যে এক কুদ্‌সী বা অতিপবিত্র শক্তি বিরাজ করে। যেইরূপ সাধারণ মানুষের রূহ ( عالم اصغر ) তাহাদের শরীরে বিরাজ করে এবং সাধারণ মানুষের শরীর যেইরূপ তাঁহাদের রূহের তাবেদার ও অনুগত থাকে, তদ্রূপ ঐ কুদ্‌সী বা অতিপবিত্র রূহও ( عالم اكبر ) সকল দেহে বিচরণ করে এবং সকল দৈহিক জগত উহার তাবেদার হইয়া থাকে। আর উহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নিকট হইতে ( خارق فطرت ) অভ্যাস ও রীতি বিরোধী মু'জেজা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেহেতু ঐ পবিত্র রূহের আয়েনা পরিষ্কার এবং মরিচা ও ধুলি-বালি ইত্যাদি হইতে পরিচ্ছন্ন থাকে, তাই তাঁহার নিকট ঐ অবতীর্ণ কিতাবের মধ্যে কখনও ভূল-ত্রুটি হইতে পারেনা।

আর ফেরেস্তাগণের জ্বাত বা সত্তার মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে, উহার প্রতিচ্ছবি ঐ পবিত্র রূহের আয়েনার উপর পড়িয়া থাকে এবং ঐ পবিত্র রূহ উহাকে খোদার সৃষ্টি জগত পর্যন্ত সরবরাহ করিয়া থাকে।

সাধারণ মানুষের রূহ তো স্বপ্নের মধ্যে ফেরেস্তাগণের সহিত সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু নবীর পবিত্র রূহ জাগ্রত অবস্থায় ফেরেশ্‌তাগণের সহিত কথাবার্তা বলিয়া তাকে। সাধারণ মানুষের রূহের অবস্থা হইল-যখন উহার জাহেরী ইন্দ্রিয় শক্তি কোন কাজে মশ্‌গুল থাকে, তখন বাতেনী শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আর যখন বাতেনী শক্তি কাজে নিয়োজিত হয়, তখন জাহেরী ইন্দ্রিয় শক্তি অকেজো হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীগণের পবিত্র রূহের অবস্থা হইল-তাঁহাদের না জাহেরী ইন্দ্রিয় শক্তি কাজে নিয়োজিত হইলে বাতেনী শক্তি নিষ্ক্রিয় হইত, না বাতেনী শক্তি কাজে মশ্‌গুল হইলে জাহেরী ইন্দ্রিয় শক্তি অচল হইয়া পড়িত, আর না এই দুই শক্তি পরস্পরের কর্তব্য কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করিত। বরং তাঁহাদের ঐ দুইটি শক্তির প্রভাব তাঁহাদের পবিত্র



দেহ অতিক্রম করিয়া অন্যান্য দৈহিক জগতেও পৌঁছিয়া যায়। আর উহা মানবীয় শিক্ষার প্রভাবে হয় না, বরং ঐ পবিত্র রূহ এবং ফেরেস্তাগণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করিয়া থাকে।

সাধারণ রূহের প্রকৃতি হইল-উহার জাহেরী ইন্দ্রিয় শক্তি কোন কাজে মশ্‌গুল হওয়ার দরুন উহার বাতেনী শক্তিকে এবং বাতেনী শক্তি কোন কাজে মশ্‌গুল হওয়ার ফলে উহার জাহেরী ইন্দ্রিয় শক্তিকে নিজের কর্তব্য কাজ হইতে বিরত রাখে। আর শুধু তাহাই নহে, বরং উহার একটি ইন্দ্রিয় শক্তি কোন কাজে নিয়োজিত হওয়ার ফলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তিগুলিকে অকেজো করিয়া দেয়। যেমন আমরা যখন নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করি, তখন কোন কিছু ভাল রূপে দেখিনা, আর যখন কোন কিছু অপলক নেত্রে অবলোকন করি, তখন আমরা শুনিতে পাইনা। ভয়ের সঞ্চার হইলে তখন লোভের সৃষ্টি হইতে পারেনা, লোভ হইলে তখন রাগ আসেনা, আর যখন আমরা কোন কিছুর ফিকির বা চিন্তায় মগ্ন হই, তখন জিকির বা আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে গাফেল হইয়া পড়ি আর যখন ভালভাবে খোদার ধ্যানে তন্ময় হইয়া পড়ি, তখন অন্য কিছুর চিন্তা লোপ পায়। কিন্তু নবীগণের পবিত্র রূহের প্রকৃতি সেইরূপ নহে। তাঁহাদের জাহেরী ও বাতেনী অনুভব শক্তি একই সাথে কাজ করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের একটি ইন্দ্রিয় শক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তির প্রতিবন্ধক হয়না। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন–

عَيْنَانِ تَنَامُ وَالْقَلْبُ يَقْظَانِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَيْنِىْ تَنَامُ وَقَلْبِىْ لَايَنَامُ.

"আমার চোখ দুইটি নিদ্রায় মগ্ন হয়, কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত থাকে।" তাই নবীগণের ঘুমের দ্বারা তাঁহাদের ওজু ভঙ্গ হয় না। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের ঘুমের দ্বারা ওজু ভাঙ্গিয়া যায়। কুরআন মজিদে আছে-

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ. الاية

আল্লাহ্‌পাক বলিয়াছেন- "হে নবী! আপনি ঐ মুশরিকগণকে বলিয়া দিন যে, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার নিকট ওহী আসিয়া থাকে।"

পাঠকবৃন্দ! আপনারা উক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করুন, এই আয়াতে কি নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে আমাদের মতই মানুষ বলা হইয়াছে, না অন্য রকমের?

দেখুন,

উক্ত আয়াতে (يُوْحٰى اِلَىَّ) ইউহা ইলাইয়্যা (অর্থাৎ "আমার নিকট ওহী আসিয়া থাকে।") এই বাক্যটি হুজুর আকরম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে সকল মানুষ হইতে পৃথক ভাবে দেখাইয়াছে। যেমন 'হাইওয়ান' বা জানোয়ার বলিতে মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুকে বুঝায়। 'হাইওয়ান' বলিতে সমস্ত মানুষ, গাধা, শুকর, কুকুর, বিড়াল, গরু-ছাগল প্রভৃতি জীব-জন্তু বুঝাইয়া থাকে, তবে কি কেহই এই কথা বলিবে যে, গরু-গাধা, শুকর ও কুকুর ইত্যাদিও আমাদের মত হাইওয়ান। কখনও ইহা বলিবে না। কারণ, মানুষ তো হাইওয়ান বটে, কিন্তু শুকুর, গরু-গাধা প্রভৃতি হাইওয়ানের মত নহে। কেননা, মানুষ হইল 'হাইওয়ানে নাতেক' বা বাক্‌শক্তি সম্পন্ন জীব। মানুষ বিবেক, জ্ঞান এবং বাক্‌শক্তির মালিক। এইখানে যেইরূপ 'নাতেক' অর্থাৎ 'বাক্‌শক্তি সম্পন্ন' শব্দটি অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া দিয়াছে, ঠিক তদ্রুপ 'ইউহা ইলাইয়া' (আমার নিকট ওহী আসিয়া থাকে) কুরআনের উক্ত বাক্যটি সাধারণ মানব হইতে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)কে পৃথক ও বিশিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ডক্টর ইকবাল (রাঃ) বলেন–

پروانه بھی اك پتنگا بھی جگنو بھی اك پتنگا

وه روشنی کا طالب یه روشنی سراپا

"শ্যামা পোকাও একটি পতঙ্গ, জোনাকী পোকাও একটি পতঙ্গ, কিন্তু শ্যামা পোকা আলো সন্ধানী, আর জোনাকী পোকা আপাদ-মস্তক আলোতে পরিপূর্ণ।

ঠিক তদ্রুপ হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ও একজন মানব, আর আমরাও মানব, কিন্তু আমরা সকলেই ঈমান ও নূরের সন্ধানী, আর জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আপাদ মস্তক ঈমান ও নূরের খনি।

যেই মহাত্মাগণের অনুভব শক্তি সাধারণ মানুষের অনুভব শক্তি অপেক্ষা এতটুকু প্রখর হইয়া থাকে– তাঁহারা ঐ সমস্ত কিছু দেখিয়া থাকেন, যাহা সাধারণ মানুষে দেখিতে পায় না, তাঁহারা ঐ সমস্ত কিছু শুনিয়া থাকেন, যাহা



সাধারণ মানুষে শুনিতে পায় না, এইরূপ অলৌকিক শক্তি এবং পবিত্র রূহ যেই মানব গোষ্ঠীর মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহারাই হইলেন আল্লাহর নবী ও রাসূল।

ইহাতো সমস্ত নবীগণের পবিত্র রূহের প্রকৃতি। কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের পবিত্র রূহ হইল 'রূহুল্‌-আরওয়াহ্‌' বা সকল রূহের রূহ, সকল প্রাণের প্রাণ। আর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইলেন নবীগণের সরদার ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা সর্ব সম্মত রায়।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 'রূহে মুহাম্মদী' বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর রূহ মুবারক কিরূপ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর তাঁহার জ্বাত বা সত্বা কিরূপ মর্যাদা সম্পন্ন মানব। ঐ জ্বাত বা সত্বার মানবীয় সীমারেখা নির্ধারণ করা এবং তাঁহাকে শুধু 'মানব'গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা গোমরাহী ছাড়া আর কি হইতে পারে? মানবের কি শক্তি? সে আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুব' আল্লাহ্‌র বন্ধু জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর 'মানব হওয়া' সম্পর্কে বক্তব্য রাখিবে! আল্লাহ্‌ তা'লাই জানেন তাঁহার মাহ্‌বুব মুহাম্মদুর রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কোন প্রকার মানব? ওলামায়ে ইসলাম যেইরূপ খোদার কালাম এবং রাছুলের হাদীসের কঠিন বাণীগুলির তা'বিল বা যুক্তি ভিত্তিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ঠিক তদ্রূপ মাওদুদী সাহেবের অনুসারীদের মধ্যে কোন কোন লোক মাওদুদীর খারাপ উক্তিগুলির বিভিন্ন তা'বিল ও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। অথচ স্পষ্ট কথা এবং সরল উক্তির মধ্যে এইরূপ তা'বিল ও ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকিতে পারেনা। বিশেষতঃ শানে উলুহিয়াত (খোদার প্রভুত্বে) অথবা শানে রিসালাত (রাসুল হওয়ার পদে) এর ব্যাপারে মান-হানিকর অথবা বে-আদবীপূর্ণ শব্দগুলির তা'বিল ও ব্যাখ্যা করা ইসলামী শরীয়াতে জায়েজ নাই। স্পষ্ট ও সরল কথার মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার কি অবকাশ আছে? রাসুল, সাহাবা, ইমাম, পীর, সুফী, দরবেশ এবং ওলামায়ে দ্বীনের কাপড়ের আঁচলকে হেফাজত করা মাওদুদীর কাপড়ের আঁচলকে বাঁচানো অপেক্ষা লক্ষগুণ বেশী প্রয়োজন। মাওদুদীর শানে যদি বিন্দুমাত্র মানহানিজনক কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়, তবে তাহার অনুসারীগণ কখনও বরদাশ্‌ত করেনা। কিন্তু মাওদুদী যে নবীগণ, ছাহাবাগণ, ইমামগণ, মুহাদ্দেছীন এবং পীর ও দরবেশগণের শানে মানহানিজনক কথা এবং বে-

আদবী পূর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, উহা উম্মতে মুহাম্মদী মুসলমানগণ কিরূপে বরদাশ্‌ত করিতে পারে? ইহা সত্বেও মাওদুদীর কাপড়ের আঁচলকে বাঁচাইবার জন্য তাহার অনুগামীগণ মাওদুদীর কথাগুলির বিভিন্ন প্রকার তা'বিল ও ব্যাখ্যা করিতে প্রাণ পণ চেষ্টা চালাইতেছে। অথচ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাসুল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম ও মহাপুরুষগণের শানে মাওদুদী মানহানিকর বিভিন্ন বাজে কথা এবং নেকামী করিয়াছে, ঐগুলি সম্পর্কে তাঁহার অনুসারী নামধারী মুসলমানদের মধ্যে কোন চেতনাবোধ নাই।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যদি কোন লোক নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মানহানি বা অবমাননার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে 'মানব' বলে, তবে ঐ লোকটিকে নিজের ঈমান হইতে হাত ধুইয়া ফেলা উচিত। কারণ, ইসলামী শরীয়াতের আলেমগণ সম্মান-সূচক শব্দ সংযুক্ত করা ছাড়া হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে শুধু মানব বলা জায়েজ রাখেন নাই। যেমন কুরআনের উক্ত আয়াতে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে 'মানব' বলার সাথে সাথে 'ইউহা ইলাইয়্যা' বা "আমার নিকট ওহী আসিয়া থাকে" বিশিষ্ট গুণ সম্বলিত বাক্যটি সংযুক্ত করা হইয়াছে। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে সম্মানসূচক শব্দ সহকারে স্মরণ করা ওয়াজিব এবং অত্যাবশ্যক বলিয়া বিশ্বাস করা ইসলামী শরীয়াতের আলেমগণের চিরাচরিত রীতি, আর বস্তুতঃ ইহা নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে।

### শেষ জামানায় মসজিদ ও নামাজিদের অবস্থার বর্ণনা

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشَكُ اَنْ يَّاتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَلَايَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ مَسَاجِدُ هُمْ عَامِرَةٌ وَهِىَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدٰى عُلَمَا ؤُهُمْ شَرٌّمِنْ تَحْتِ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ –

رواه البيهقى

অনুবাদঃ- হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন- "অনতিবিলম্বে মানব সমাজের



কাছে এমন একটি যুগ উপস্থিত হইবে, সেইযুগে শুধু ইসলামের নাম এবং কুরআন মজিদের পাঠ-রীতি থাকিবে। মুসলমানদের মসজিদগুলি পাকা দালান বিশিষ্ট এবং সুসজ্জিত হইবে, কিন্তু উহা হেদায়েত শূন্য হইয়া পড়িবে। তাহাদের আলেম সম্প্রদায় আসমানের নীচে অতি নিকৃষ্ট সৃষ্টজীব হইবে, তাহাদের পক্ষ হইতে পৃথিবীতে ফেত্‌না-ফাসাদ আরম্ভ হইবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা পূনরায় ফিরিয়া আসিবে।" (বায়হাকী)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীসের মর্মার্থ এই যে, মুসলমানগণের নাম ইসলামী হইবে, যেমন বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী ইত্যাদি নূতন নূতন ইসলামী নামে দল গঠন হইতেছে। আর তাহারা নিজেকেই মুসলমান বলিয়া বেড়াইবে, কিন্তু তাহাদের রীতি-নীতি সবকিছু ইসলামের বিপরীত হইবে।

অথবা হাদীসের অর্থ এই যে, ইসলামের আরাকান ও আহ্‌কাম ইত্যাদির নাম ও রূপ তো বিদ্যমান থাকিবে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইয়া পড়িবে। নামাজীর সংখ্যা অধিক হইবে এবং নামাজের প্রথা প্রচলিত থাকিবে, কিন্তু নামাজে একাগ্রচিত্ততা এবং খোদা-ভীতি থাকিবেনা। মুসলমানেরা জাকাত আদায় করিবে, কিন্তু জাতির সেবা তাহাদের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাহারা হজ্জ করিবে, কিন্তু উহা শুধু দেশ-ভ্রমণ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পার্থিব ধন-সম্পদ লাভের জন্য করিবে। কুরআন মজিদের নক্‌শাগুলি কাগজের উপর লিখিত এবং শব্দগুলি মুখের উপর উচ্চারিত হইবে, কিন্তু কুরআনের ইজ্জত-সম্মান মুসলমানের অন্তরে থাকিবে না। অথবা প্রথা স্বরূপ কুরআন মজিদ পড়ানো হইবে এবং ঘরের মধ্যে উহা রাখা হইবে, শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির উপর কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআনের দোহাই দেওয়ার জন্য উহা ঘরে রাখা হইবে, কিন্তু স্বীয় জীবনের কাজ-কর্মের জন্য খ্রীষ্টানদের আইন-কানুন ও রীতি-নীতি ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া চলিবে। মোটকথা এই সে মুসলমানগণ কুরআন করীমের আদব-ইজ্জত এবং কুরআনের অনুসাশন ভুলিয়া যাইবে।

মুসলমানদের মসজিদগুলির ইমারত, দালান-কোঠা ইত্যাদি অত্যন্ত সু-উচ্চমানের হইবে এবং মসজিদের দেওয়ালগুলি নানা প্রকার নক্‌শা, কুরআনের আয়াত, কবিতা ইত্যাদি দ্বারা সুরঞ্জিত হইবে এবং বিজলীর কারসাজি দ্বারা সুসজ্জিত থাকিবে, কিন্তু প্রকৃত খাঁটি নামাজীর সংখ্যা অল্প,

তাহাদের ইমাম ভ্রান্ত আকীদার হইবে। মুসলমানের মসজিদগুলি হেদায়েতের পরিবর্তে বিধর্মীগণের আস্তানায় পরিণত হইবে। মসজিদ হইতে লাউড স্পীকার দ্বারা দরসে কুরআন এবং দরসে হাদীসের আওয়াজ আসিবে। কিন্তু ঐ দরস বা কুরআন-হাদীস শিক্ষা মৃত্যু বিষে পরিণত হইবে। কেননা, এই দরস সমুহে আসল কুরআনের নামে কুফরী ও হঠকারীতা ছড়াইয়া পড়িবে। অধিকন্তু, এই মসজিদগুলির পাকা দালানে সুদ, ঘুষ, হারাম ইত্যাদি টাকাও খরচ করা হইবে, বাহ্যিক চিত্র ও নক্‌শা বেশী সৌন্দর্য হইবে, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হইবে কিন্তু ঐ মসজিদগুলিতে রূহানীয়াত এবং ইসলামের আসল নূর ও আলো থাকিবেনা। কেননা, হারাম উপায়ে অর্জিত টাকা-পয়সা দ্বারা তৈরীকৃত মসজিদে রূহানীয়াত ও নূর থাকেনা। এইরূপ দালান-কোঠা ও আড়ম্বর বিশিষ্ট অনেক মসজিদ হইবে, যেইখানে হেদায়াতের পরিবর্তে অন্ধকার এবং লোক দেখানোর রীতিই থাকিবে। অথবা তাহারা শান-শওকত বিশিষ্ট মসজিদ তৈয়ার করিবে, কিন্তু সেইখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য থাকিবেনা, বরং শুধুমাত্র নাম ও খ্যাতির জন্যই মসজিদ তৈয়ার করিবে। শেষ জামানায় অসৎ প্রকৃতি আলেমের সংখ্যা অধিক হইবে। যাহাদের ফেত্‌না ফাসাদ সমগ্র মুসলমান সমাজকে ঘিরিয়া লইবে। যেমন, একটি গোলাকৃত বৃত্তের রেখা যেইস্থান হইতে আরম্ভ হয়, সেইখানেই উহা পৌঁছিয়া উক্ত বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে এবং মধ্যবর্তী সমস্ত জায়গাকে উহা নিজের বেষ্টনীর মধ্যে ঘিরিয়া লয়, এই আলেমগণের ফেত্‌না ফাসাদও তদ্রূপ হইবে। এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, সকল আলেমই অসৎ প্রকৃতির হইবে, নতুবা ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আল্লাহ্‌তায়ালা এই ধর্মে কেয়ামত পর্যন্ত হক্কানী-রব্বানী আলেমও সৃষ্টি করিবেন, যাহারা ধর্মকে উহার আসল রূপে স্থায়ী রাখিবেন। যেমন, বর্তমানকালে খত্‌মে নবুয়াতের ব্যাপারে কাদেয়ানী ফেত্‌না, আল্লাহ্‌ মিথ্যা বলার শক্তি রাখেন, রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শানে অবমাননাকর উক্তি ও বে-আদবী, আউলিয়ায়ে কেরামের শানে বে-আদবী, কেয়ামে-মিলাদ, ফাতেহা এবং মুনাজাত ইত্যাদি সম্পর্কে ফেত্‌না-ফাসাদ দৃষ্টি গোচর হইতেছে, হক্কানী-রব্বানী আলেমগণ ঐ সমস্ত ফেত্‌না ফাসাদ হইতে ইসলাম ধর্মকে হেফাজত করিতে থাকিবেন।



## মুজাদ্দেদ সম্পর্কে বর্ণনা

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا– رواه ابوداؤد

অনুবাদঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন-"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'লা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে একজন মুজাদ্দেদ পাঠাইতে থাকিবেন, যিনি এই উম্মতের ধর্মকে নূতন রূপ দান করিবেন।"

ব্যাখ্যাঃ বিশ্বনবী জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর উম্মতের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই উম্মতের মধ্যে সর্বদাই ওলামা এবং আউলিয়ায়ে কেরাম হইতে থাকিবেন। কিন্তু প্রত্যেক শতাব্দীর শুরু বা শেষ পর্যায়ে তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিতে থাকিবেন এবং বেদায়াতগুলিকে নির্মূল করিবেন, ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যাগুলিকে সংশোধন এবং ধর্মের সত্যিকার তাবলীগ করিবেন।

উল্লেখিত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক লোকই নিজের খেয়াল-খুশী মোতাবেক 'মুজাদ্দেদ' গণনা করিয়াছে যে, প্রথম শতাব্দীতে অমুক ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে অমুক ব্যক্তিকে মুজাদ্দেদরূপে চিহ্নিত করিয়াছে। ধর্মের মধ্যে ফেত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টিকারীগণও চিহ্নিত করিয়াছে। ধর্মের মধ্যে ফেত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টিকারীগণও নিজে নিজেকে মুজাদ্দেদ বলিয়া প্রচার করিয়াছে।

উক্ত হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মুজাদ্দেদ বলিতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা জামায়াত নহে। বরং কখনও ইসলামী হুকুমতের বাদশাহ্‌, কখনও মুহাদ্দেছগণ, কখনও ফকীহ্‌গণ, কখনও আধ্যাত্মিক সূফীগণ, কখনও ধনী সম্প্রদায়গণ এবং কখনও কোন কোন শাসনকর্তাগণও ধর্মের সংস্কার করিবেন। কখনও এক ব্যক্তি বা কখনও তাঁহাদের জামায়াত যাহারা ধর্মের এই গুরু দায়িত্ব এবং বিশিষ্ট খেদমত পালন করিবেন, তাঁহারাও মুজাদ্দেদ

বলিয়া পরিগণিত হইবে। যেমন এক সময়ে হযরত সুলতান মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগীর যিনি ইসলাম ধর্ম হইতে বাদশাহ আকবর কর্তৃক প্রচারিত বেদায়াত সমুহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন এবং কুতুবুল্ ওয়াক্ত হযরত মুজাদ্দেদ আল্‌ফে-সানী (রাঃ) অথবা বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দেদ আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেজা খান (রাঃ) যিনি মুখ ও কলমে হক ও বাতেলকে বাছাই করিয়াছেন।

## মুজাদ্দেদগণের তালিকা

লক্ষ্যনীয় যে, বর্তমান যুগে মুজাদ্দেদের বাজার অতি সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। অনেক আলেম ও সুফীগণ নিজে নিজেকে মুজাদ্দেদ বলিয়া বেড়াইতেছে।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- প্রত্যেক শতাব্দীর মধ্যে একজন মুজাদ্দেদ পাঠানো হইবে। কিন্তু যুগের গতিমাণ এতদূর পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, প্রত্যেক শতাব্দীর মধ্যে লক্ষাধিক মুজাদ্দেদ লিখিতভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। আর একজন মুজাদ্দিদ অপর মুজাদ্দেদের বিরোধিতা করিতে দেখা যাইতেছে। এখন সাদাসিধা ও সরলমনা সাধারণ লোকেরা বড়ই ধাঁ ধাঁ এবং মুছিবতে পড়িয়া গিয়াছে কোন্ মুজাদ্দেদের কথা মানিবে? আর সত্যিকার ভাবে মুজাদ্দেদ কে? কারণ, বর্তমান যুগের তথাকথিত মুজাদ্দেদগণ মুজাদ্দেদের পদকে তাহাদের স্বভাব-জনিত খেয়াল-খুশীর পদ হিসাবে তৈয়ার করিয়া লইয়াছে। যখন তাহারা দুই চারটি কথা বলিতে পারিয়াছে, তাহা শুদ্ধ হউক বা অশুদ্ধ হউক, উহাতে তাহাদের কিছু আসে যায়না, তখনই তাহারা নিজেকে মুজাদ্দেদ বলিয়া প্রচার করিয়া দেয়। আর জনসাধারণ নিজের বিশ্বাস্য ব্যক্তিকে মুজাদ্দেদ বলিতে আনন্দ ও গৌরব মনে করিতে থাকে। অতঃপর মুজাদ্দেদ হওয়ার জন্য কি কি বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, এইখানে তাহা বর্ণনা করা আমি একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রখ্যাত আলেমগণ বর্ণনা করিয়াছেনঃ মুজাদ্দেদের জন্য ইহা অতীব প্রয়োজন যে, এক শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার এলম বা জ্ঞান-গরীমা খ্যাতি লাভ করিতে হইবে। আলেম সমাজ তাঁহার 'ইহ্‌য়ায়ে-ছুন্নাত' এবং 'ইজালায়ে বেদায়াত' (অর্থাৎ রাসুলের ছুন্নাতকে জীবিত করা



এবং বেদায়াতগুলিকে দূরিভূত করা) এবং অন্যান্য দ্বীনি-খেদমতের আলোচনা হইতে হইবে। সুতরাং যেই আলেম শতাব্দীর শেষ জামানা পায় নাই অথবা পাইয়াছে কিন্তু সে দ্বীনি-খেদমত আন্জাম দেওয়ার মধ্যে প্রসিদ্ধ হয় নাই, তবে সেই আলেম মুজাদ্দেদ বলিয়া অভিহিত হইবেনা। নিম্নে মুজাদ্দেদগণের তালিকা পাঠক সম্মুখে পেশ করা যাইতেছে-

হিজরী প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ) তিনি নবম হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন, উক্ত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বলা উচিত, কিন্তু সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তিনি হিজরী প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দেদই ছিলেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এবং ইমাম হাছান ইবনে জিয়াদ (রাঃ)।

তৃতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন কাজী আবুল আব্বাছ ইবনে সুরাইহ্ শাফেয়ী (রাঃ), ইমাম আবুল হাছান আশ'য়ারী (রাঃ) এবং মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবরী (রাঃ)।

চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন, ইমাম আবু বকর বাকিল্লানী (রাঃ) এবং ইমাম আবু হামিদ ইস্পারাইনী (রাঃ)।

পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন কাজী ফখরুদ্দিন হানাফী (রাঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাজ্জালী (রাঃ)।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রাঃ)।

সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন ইমাম তক্বিউদ্দীন ইব্নে দাক্বীকুল ঈদ (রাঃ)।

অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন ইমাম জায়নুদ্দীন ইরাকী (রাঃ), আল্লামা শামশুদ্দীন জাজরী (রাঃ) এবং আল্লামা সিরাজুদ্দীন বিল্‌কিনী (রাঃ)।

নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন ইমাম জালালুদ্দিন ছাইয়্যুতি (রাঃ) এবং আল্লামা শামশুদ্দীন সাখারী (রাঃ)।

দশম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন ইমাম শিহাবুদ্দীন রমলী (রাঃ) এবং মোল্লা

আলী ক্বারী (রাঃ)।

একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন ইমাম রব্বানী হযরত মুজাদ্দেদ আল্ ফেসানী (রাঃ), হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহ্‌লভী (রাঃ) এবং হযরত আল্লামা মীর আবদুল ওয়াহেদ বিলগেরামী (রাঃ) ( مصنف سبع سنابل )

দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগীর (রাঃ), হযরত শাহ্ কলিমুল্লাহ চিশ্‌তী দেহ্‌লভী (রাঃ), শাইখ গোলাম নকশবন্দ লক্ নৌভী (রাঃ) এবং হযরত কাজী মুহিবুল্লাহ বিহারী (রাঃ)।

এয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন হযরত শাহ্ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেছ দেহ্‌লভী (রাঃ)। তিনি ১১৫৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৩৯ হিজ রীতে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জ্ঞান-গরীমা, তাক্ ওয়া-পরহেজগারী দ্বারা দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। আর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার জ্ঞান-গরীমা ও কামালিয়াত সম্পর্কে সমগ্র হিন্দুস্থান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সারা জীবন দ্বীনে খেদমত, শিক্ষা-দীক্ষায়, ফতোয়া এবং কিতাব লেখার মধ্যে অতিবাহিত করেন।

ইসলামী বিশ্বের আলেম সম্প্রদায়ের শর্তাবলী অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ছিলেন আ'লা হযরত মাওলানা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেজা খান বেরলভী ছুন্নী হানাফী (রাঃ)। কারণ, তিনি ১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরীতে ইন্ তিকাল করেন। তিনি এয়োদশ শতাব্দী হইতে ২৮ বৎসর ২ মাস ২০ দিন সময় পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার জ্ঞান-গরীমা, শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নছিহত এবং কিতাব-পত্র লেখার দিক দিয়া হিন্দুস্থান হইতে আরব পর্যন্ত তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। আর তিনি চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ৩৯ বৎসর ১ মাস ২৫ দিন সময় পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ধর্মের সংস্কার, ফেত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টিকারীগণের প্রতিবাদ খণ্ডন, সত্য-প্রতিষ্ঠা, অসত্য অপসারণ এবং ছুন্নাতকে মজবুত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার গুরু দায়িত্বকে এতই সুন্দর ও দক্ষতার সহিত পালন করিয়াছিলেন যে, উহাই তাঁহার মুজাদ্দেদ হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি তের বৎসর দশ মাস বয়সে লেখা-পড়া শেষ করেন এবং সেইদিন হইতে তিনি ফতোয়া দিতে শুরু করেন। তাঁহার রচিত কিতাবের



সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক। ইমাম জালালুদ্দীন ছাইয়ুতি (রাঃ) এর পরে অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ইহা শুনা যায় নাই, যে এত অধিক কিতাব রচনার মধ্যে আ'লা হযরতের প্রতিযোগী হইয়াছে।

বর্তমান জামানায় কোন কোন লোক নিজের খেয়াল-খুশীর বশবতী হইয়া নিজের ধারণা মতে যে কোন একজনকে মুজাদ্দেদ বলিয়া থাকে। কিন্তু ইসলামী বিশ্বের আলেমগণের বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী তাহাদের নাম মুজাদ্দেদগণের তালিকা ভূক্ত হয় নাই।" (আল্লামা ছৈয়দ জফরউদ্দীন বিহারী সাহেবের কথিকা হইতে সংগৃহীত)

## প্রাথমিক যুগের ন্যায় শেষ যুগেও মুসলমানের সংখ্যা কম হবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ – رواه مسلم

**অনুবাদঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- "ইসলাম ধর্ম গরীব অবস্থায় বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং যেইরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেইরূপ আবার গরীব অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর গরীবদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে।" (মুসলিম)

**ব্যাখ্যাঃ** ইসলাম ধর্ম সর্ব প্রথম অবস্থায় অল্প সংখ্যক লোকই গ্রহণ করিয়াছিল এবং সর্বশেষ অবস্থায় উহা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে বিরাজ করিবে। উক্ত দুই জামায়াতের লোক খুবই ভাগ্যবান।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও গরীব লোকেরাই ইসলাম ধর্মের উপর স্থির থাকে। অধিকাংশ ধনী লোক পথ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে আছে- "ধর্ম দরিদ্র অবস্থায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং যেইরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ আবার প্রত্যাবর্তন করিবে। সুতরাং দরিদ্র ও গরীব লোকদের জন্য সু-সংবাদ রহিয়াছে। এই গরীব লোক বলিতে তাঁহাদিগকে বুঝায়, যাঁহারা আমার ছুন্নাতকে দুরস্ত করিতে থাকিবে,

যাহা অন্য লোকে ব্যতিক্রম করিয়াছে।”

এই অবস্থা কেয়ামতের খুব নিকটবর্তী সময়েই হইবে যে, প্রথম অবস্থায় যেইরূপ খুব অল্প সংখ্যক গরীব লোকেরাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কেয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে খুব অল্প সংখ্যক গরীব লোকই ইসলাম ধর্মের উপর স্থির থাকিবে। ঐ প্রথম অবস্থার গরীব লোকেরাও অতি ভাগ্যবান ছিলেন এবং এই শেষ অবস্থার গরীব লোকেরাও ভাগ্যবান হইবে। অবশিষ্ট সমগ্র পৃথিবীতে কুফরীই বিস্তার করিবে।

মিশ্‌কাত শরীফের একটি বর্ণনায় আছে যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে সৎপন্থী লোক খুবই কম হইবে এবং বাতিল পন্থী লোক বেশী হইবে। যেমন বর্তমান জামানায়ও উহার কিছু প্রতিফলন দেখা যাইতেছে যে, সৎপন্থী অর্থাৎ আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোক অন্যান্য বাতিল ফেরকার লোকদের তুলনায় গরীব ও দরিদ্র এবং আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোক অন্যান্য বাতিল-পন্থী লোকদের তুলনায় কমিয়া যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- বর্তমান জামানার ওহাবী, তাবলীগ জামায়াত ও মাওদুদী জামায়াতের লোক দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তদ্রূপ মন-গড়া ও ভিত্তিহীন মিথ্যা তরীকত পন্থীদের লোক অত্যন্ত চাকচিক্যময় দেখা যাইতেছে। আর সৎ ও বাস্তব তরীকত পন্থীদের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এইগুলি কেয়ামতের আলামতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এখন প্রশ্ন হইল যে, اَلْحَقُّ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى "সত্য সর্বদা বুলন্দ থাকে এবং উহার উপর অন্য কিছু বুলন্দ হয় না।” এই হাদীসের ভাবার্থ কি হইবে? উত্তরে বলা যায় যে, উক্ত হাদীসের ভাবার্থ হইল-সৎ পন্থী লোকেরা সর্বদা বাতিল লোকদের সহিত তর্ক-বিতর্কের মধ্যে লাগিয়া থাকিবে এবং হাদীস-কুরআন, ইজ্‌মা-কিয়াস ইত্যাদি হইতে সংগৃহীত প্রমাণাদি এবং যুক্তি-তর্কে সৎ পন্থী লোকেরা সর্বদা বিজয়ী থাকিবে। যেমন আপনারা আমাদের আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের বর্ণনা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন।

বর্তমান জামানার লোকের চেয়ে পূর্ববর্তী জামানার লোকেরা খাঁটি ও প্রকৃত মুসলমান ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌! ঐ জামানার অধিকাংশ লোকেরা সুন্নী ছিলেন। ওহাবী মাত্র দুই একজন ছিল আর মাওদুদী এবং তাবলীগ জামায়াতের লোক তো ছিই না।



ইহা সর্বজন বিদিত যে, জামানার অবস্থা যতই নাজুক হইতে চলিয়াছে, ততই বাতিল ফেরকার লোক বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। আহ্‌লে হক বা সৎপন্থী লোক কমিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইরশাদ অনুযায়ী হইতেছে।

## শেষ যুগের লোকেরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে লোভ লালসা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِيْ زَمَانٌ عَلٰى اُمَّتِيْ يُحِبُّوْنَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْعُقْبٰى وَيُحِبُّوْنَ الدُّوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُوْرَ وَيُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ وَيُحِبُّوْنَ الْعِيَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحُوْرَ وَيُحِبُّوْنَ النَّفْسَ وَيَنْسَوْنَ اللّٰهَ هُمْ مِنِّيْ بُرَاءٌ وَاَنَا مِنْهُمْ بَرِيْءٌ –

(منبهات ابن حجر)

অনুবাদঃ হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন "আমার উম্মতের নিকট অনতিবিলম্বে এমন একটি যুগ আসিবে, সেই যুগের লোকেরা পাঁচটি জিনিসকে পছন্দ করিবে এবং পাঁচটি জিনিসকে ভূলিয়া যাইবে। প্রথম, তাহারা দুনিয়াকে পছন্দ করবে এবং আখেরাত বা পরকালকে ভূলিয়া যাইবে। দ্বিতীয়, তাহাদের ঘরগুলিকে পছন্দ করিবে এবং কবর গুলিকে ভূলিয়া যাইবে। তৃতীয়, তাহারা মাল-দৌলতকে ভালবাসিবে এবং পরকালের হিসাব নিকাশকে ভূলিয়া যাইবে। চতুর্থ, তাহারা পরিবারের লোকজনকে ভালবাসিবে এবং বেহেশ্‌তের হুর গুলিকে ভূলিয়া যাইবে। পঞ্চম, তাহারা নিজের আত্মাকে ভালবাসিবে এবং আল্লাহ্‌তা'লাকে ভূলিয়া যাইবে। এইরূপ লোক আমার নিকট হইতে দুরে রহিয়াছে এবং আমি তাহাদের নিকট হইতে দুরে রহিয়াছে।” (মুনব্বহাতে ইবনে হাজর)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত লোকেরা যখন আল্লাহ্‌কে ভূলিয়া যাইবে, তবে তাহারা আল্লাহর রাসুলের সহিত কিভাবে মুহাব্বত রাখিবে? ইহার পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন যে, উক্ত লোকেরা আমার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। আর যখন তাহারা হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াছাল্লাম) হইতে দূরে রহিয়াছে, তবে হুজুরও তাহাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন।

হযরত ছুফিয়ান ছুরী (রাঃ) বলেন; "এই জামানায় কাহারও নিকট ধন-সম্পদ জমা হয়না, কিন্তু যেই ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সেই ব্যক্তির নিকটই ধন-সম্পদ জমা হইয়া থাকে।

(১) দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা (২) অতিরিক্ত লোভ-লালসা (৩) অত্যন্ত কৃপণতা (৪) কম পরহেজগারী এবং (৫) পরকাল বিস্মৃতি।

অন্য একটি হাদীসে আছে, হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেনঃ "অনতিবিলম্বে আমার উম্মতের নিকট এমন একটি যুগ আসিবে, সেই যুগের লোকেরা পাঁচটি জিনিসকে পছন্দ করিবে এবং পাঁচটি জিনিসকে ভূলিয়া যাইবে। (১) তাহারা দুনিয়াকে পছন্দ করিবে এবং আখেরাতকে ভূলিয়া যাইবে। (২) নিজের জীবনকে ভালবাসিবে এবং মৃত্যুকে ভূলিয়া যাইবে (৩) নিজের ঘর বা দালান-কোঠাকে ভালবাসিবে এবং কবরকে ভূলিয়া যাইবে (৪) ধন-সম্পদকে ভালবাসিবে এবং পরকালীন হিসাব-নিকাশকে ভূলিয়া যাইবে (৫) সৃষ্টি জগতকে ভালবাসিবে এবং স্রষ্টাকে ভূলিয়া যাইবে।"

অপর এক হাদীসে আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন; "অনতি বিলম্বে আমার উম্মতের নিকট এমন একটি যুগ আসিবে-সেই যুগে মানুষের ধর্ম হইবে তাহাদের টাকা পয়সা এবং তাহাদের স্ত্রী তাহাদের কেবলা (যেই দিকে মানুষ মুখ করিয়া দাঁড়ায়) বা লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইবে এবং তাহাদের পেট তাহাদের বিশিষ্ট চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।"

অর্থাৎ শেষ যুগের মানুষের দ্বীন-ধর্ম টাকা-পয়সা উপার্জনের খাতিরে হইবে এবং দুনিয়া লাভের জন্য ধর্মকে ভূলিয়া যাইবে। ধন-সম্পদের জন্য নিজের দ্বীন-ধর্মকে নষ্ট করিয়া দিবে এবং তাহাদের স্ত্রীগণ পর্দাহীন ভাবে তাহাদের সম্মুখে চলিতে থাকিবে, আর পুরুষগণ তাহাদের পিছনে পিছনে চলিতে থাকিবে। তাহারা স্ত্রীগণের পরামর্শ ব্যতীত চলিবেনা। স্ত্রীগণের কথামতই তাহারা পদক্ষেপ নিবে।

মানব জাতি সর্বদা পেটের বা অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় মশ্‌গুল থাকিবে, ইহা ছাড়া তাহাদের জন্য কোন চিন্তাই থাকিবেনা। মুসলমানকে সরল পথে পরিচালিত করুন। আমিন!



## মিথ্যা হাদিস বর্ণনাকারীর শাস্তি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْاٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَ مَنْ كَذِبَ عَلٰى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ – روه البخارى

অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন; "আমার নিকট হইতে মানুষের কাছে পৌছাইয়া দাও, যদিও একটি আয়াত হইয়া থাকে এবং বনি ইসরাঈল বা ইহুদী জাতি হইতে কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা কর, ইহাতে কোন অসুবিধা নাই। যেই ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যার অপবাদ আনে, তবে সেই ব্যক্তি দোজখের আগুনে তাহার স্থান নির্ণয় করুক।" (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীস হইতে বুঝা গেল, যদি কোন লোকের ধর্মীয় মাছয়ালা বা কুরআনের আয়াত ভালভাবে মুখস্ত থাকে, তবে সে উহা অন্য লোকের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া উচিত। দ্বীনের তাবলীগ শুধু ওলামায়ে কেরামের জন্য ফরজ নহে, বরং প্রত্যেক মুসলমানের উপর তাহার জ্ঞান মোতাবেক তাবলীগ করা দরকার। দ্বীনের তাবলীগ এক মহান পূণ্যের কাজ। বনি ইসরাঈল হইতে কিস্‌সা-কাহিনী, অতীত ঘটনাবলী এবং উদাহরণ শ্রবণ কর এবং যদি উহা ইসলামের বিপরীত মুখী না হয়, তবে উহা অন্য লোকের নিকট বর্ণনা কর। কিন্তু বনি ইসরাঈলের কিতাব গুলি হইতে শরীয়াতের হুকুম-আহ্‌কাম গ্রহণ করার অনমুতি নাই।

স্মরণ রাখা উচিত যে, মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী ও অমূলক হাদীস রচনাকারী দোজখী এবং ইহা কবীরা গুনাহে গণ্য। উপরন্তু ইহা কখনও কুফরী বিশেষ। কারণ, ইহাতে মিথ্যাও রহিয়াছে এবং ধর্মের মধ্যে ফেত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টি করাও। হাঁ, জয়ীফ (দূর্বল) হাদীস উক্ত হুকুম বহির্ভূত। কেননা, জয়ীফ হাদীস নেক আমলের ফজিলত বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মাওজু' অর্থাৎ বানানো হাদীস কোথাও গ্রহনযোগ্য নহে। এই কারণেই মুহাদ্দেছীনে কেরাম ছহীহ্‌ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে তাঁহাদের পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

## বর্তমান কালের তাবলীগ জামায়াতের বর্ণনা

লক্ষ্যনীয় যে, বর্তমান জামানার 'তাবলীগ জামায়াত' হইল ভিন্নমুখী। তাহারা তো মাওজু' অর্থাৎ বানানো হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকে, যাহা সরাসরি হারাম, এমনকি কুফরীও । ইহা একটি নূতন জামায়াত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা হইল মৌং ইলিয়াছ। তাহাদের এই প্রকার তাবলীগের প্রচলন নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জামানা হইতে বিগত দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। হ্যাঁ, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জামানায় কালেমাতুল্লাহ্ বা দ্বীনের প্রচারের জন্য তাবলীগ করা হইত এবং কুরআন, হাদীস, ধর্মীয় মাছয়ালা পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং যাহারা নুতন মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে কুরআন হাদীস ও দ্বীনি মাছয়ালা গুলি তা'লীম দেওয়া যাইত এবং কাফের ও মুশ্‌রিকগণকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া যাইত। কিন্তু বর্তমান যুগের 'তাবলীগ জামায়াতের' কাজ হইল- তাহারা প্রত্যেক বৎসর একটি ইজ্‌তেমা'(গণজমায়েত) করিয়া থাকে, যেন উহার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে তাহাদের প্রভাব সৃষ্টি হয়। তাহাদের মধ্যে হুকুকুল্ ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হক সম্পর্কে কোন ধারণাও থাকেনা। অথচ ইহা ইসলাম ধর্মের একটি বড় রুকন। যথা স্ত্রী, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন এবং ছেলে-মেয়ে প্রভৃতি লোকের হক তাহারা আদায় করেনা।

ইসলামী শরীয়াতে মুবাল্লেগ বা প্রচারকারীর প্রাথমিক কর্তব্য হইল যে, তাহারা নিজের প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনকে দ্বীনি-তালীম দান করিবে। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজিদে ঘোষণা করেন-

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا–

"তোমরা দোজখের আগুন হইতে নিজেকে বাঁচাও এবং তোমার পরিবারের লোক, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনকে বাঁচাও।" কিন্তু বর্তমান যুগের তাবলীগ জামায়াতের লোকদের অবস্থা হইল যে একজন আফ্রিকা হইতে আসিল, অন্যজন রাশিয়া হইতে এবং আর একজন হিন্দুস্থান হইতে আসিল। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের লোক বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে এবং সেইখানে প্রচার করা হয় যে, অমুক দেশের বা অমুক শহরের মুফ্‌তি বা মুহাদ্দেছ তাবলীগের জন্য আসিয়াছে। তাহাদের ভাষা ইহারা বুঝিতেছেনা এবং ইহাদের ভাষা উহারা



বুঝিতেছেনা। দেখুন, এক ব্যক্তি তাবলীগের জন্য বরিশাল হইতে চট্টগ্রামে আসিল, তাহার ভাষা এখানকার লোকেরা ভালমতে বুঝিতে পারিতেছেনা এবং সেও এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতেছেনা। অতঃপর যখন ঐ বরিশালের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হইলঃ "চাচা মিঞা! আপনি এইখানে কি জন্য আসিয়াছেন?" সে উত্তরে বলিল, "বাবা ! আমি তো মহা বিপদে পড়িয়া গিয়াছি, ইহারা না আমার কথা বুঝিতেছে, আর না আমি তাহাদের কথা ভালভাবে বুঝিতেছি।" বলা হইল, আচ্ছা, আপনি এইখানে কি জন্য আসিয়াছেন? সে বলিল, বাবা! আমাদের জামায়াতের লোকেরা বলে-"চল, আমাদের সাথে তাবলীগে। নতুবা ঈমান পাকা হইবেনা এবং বেহেশ্‌তে ঢুকাও সম্ভব হইবেনা। তাবলীগে পাকা চিল্লা আদায় করিলে হজ্ব এবং ওমরা হজ্বের ছওয়াব হাসেল হইবে এবং ইহা হজ্ব হইতে উত্তম।" বেচারা ঈমান কামেল করিবার জন্য তো আসিল, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের অবস্থা দোজখবাসীদের অবস্থা হইতে কম নহে। স্মরণীয় যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর হাদীস بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً

"আমার নিকট হইতে একটি হাদীস হইলেও উহা মানুষের কাছে তাবলীগ কর" ইহা দ্বারা সনদ-সম্বলিত হাদীসই বুঝায়। কিন্তু বর্তমান জামানার তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা সনদ সম্পর্কে জানাতো দূরের কথা, তাহারা ছহীহ্ মাওজু' হাদীস এমনকি শুদ্ধভাবে মতনও জানেনা। সাদাসিধা লোক-জনকে ঈমান ও জান্নাতের ধোকা দিয়া একটি জালে আটকাইয়া থাকে। আসলে কথা হইল-মুসলমানগণকে কুরআন ও হাদীস এবং ঈমান ও জান্নাতের কথা বলিয়া ধোকা দেওয়া অতি সহজ ব্যাপার।

মুসলমান ভাইগণ! সাবধান, এইরূপ বিপদে নিজেকে নিক্ষেপ করিবেন না। প্রয়োজনবোধে নিজের স্থানীয় কোন আলেম বা মুহাদ্দেছ অথবা ইমাম সাহেব হইতে মাছয়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন। যিনি ভালভাবে হাদীস জানেন বা ধর্মীয় মাছয়ালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন, তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বা মাছয়ালা শুনিবেন। তাবলীগ জামাতের লোকদের অবস্থা আমরা কি ভালভাবে জানি? তাহারা কি আলেম, না জাহেল, তাহারা কি মু'মিন, না মুনাফিক, না তাহারা কুরআন-হাদীস হইতে দুই-চারটি কথা শিখিয়া মুসলমান

সমাজকে ধোকা দেওয়ার জন্য আসিয়াছে? মুসলমানগণ! হুশিয়ার, এই জামানায় ঈমান বাঁচানো বড়ই মুস্কিল। ইসলামের সাধু সাজিয়া অনেক লোক আসল ঈমানকে হরণ করিবার জন্য আসিবে। ইহা হইল শেষ যুগ। আল্লাহ্ পাক সকলকে রক্ষা করুন। আমিন!

দেওবন্দী গবেষণাগারের আলেম সৈয়দ আহমদ রেজা বাজনওয়ারী তাঁহার রচিত 'আনোয়ারুল বারী' নামক কিতাবে বর্তমান জামানার তাবলীগ জামায়াতের খারাপ অভ্যাস ও অসৎ প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা এইখানে সংকুলান হইবে না।

তাবলীগ জামায়াতের লোকদের ইহাও একটি খারাপ অভ্যাস যে, মসজিদে জামাতের পর ছুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ পড়িয়া নফল নামাজ ও তাস্‌বীহ্ ইত্যাদি পড়া ব্যতীত তাহারা গোলাকারে বসিয়া পড়ে, তারপর তাহাদের মিশনের কাজ শুরু করে। যদ্বারা অন্যান্য নফল নামাজ ও তাস্‌বীহ্ ইত্যাদি আদায়কারী এবং অন্যান্য ইবাদতকারীদের অনেক অসুবিধা ঘটায়। অনেক নামাজী ব্যক্তিদেরও ক্ষতি করিয়া থাকে। সুতরাং মুসল্লিগণের উচিত যে, এইরূপ তাবলীগ জামায়াতের লোককে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

اِنَّ عَلِيًّا رَاٰى مُؤَذِّنًا يَثُوْبُ فِى الْعِشَاءِ فَقَالَ اَخْرِجُوْا هٰذَا الْمُبْتَدِعَ مِنَ الْمَسْجِدِ

"হযরত আলী (রাঃ) একটি মুয়াজ্জিনকে দেখিলেন, সে এশার নামাজের সময়ে একত্রিত হওয়ার জন্য মসজিদে আওয়াজ করিতেছে, তখন হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমরা এই বেদায়াতী লোকটিকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দাও।"

## মাথা মুড়ানো সম্পর্কে বর্ণনা

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَاْسِهٖ وَتُرِكَ بَعْضُهٗ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اَحْلِقُوْا كُلَّهٗ اَوْتَرَكُوْا كُلَّهٗ - رواه مسلم -



অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) একটি ছেলেকে দেখিলেন যে, তাহার মাথার কিছু অংশ মুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এবং কিছু অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ঐ ছেলেটির অভিভাবকগণকে উক্ত কাজ হইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা পুরা মাথা মুড়াইয়া ফেল, অথবা পূরা মাতা ছাড়িয়া দাও (অর্থাৎ চুল রাখিয়া দাও)।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীসে এই কথার দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, হজ্ব এবং ওমরা হজ্বের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও মাথা মুড়ানো জায়েজ আছে। মাথা মুড়ানো এবং মাথায় চুল রাখা পুরুষ লোকের জন্য ইখতিয়ার রহিয়াছে। কিন্তু হজ্ব এবং ওমরা হজ্বের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মাথা না মুড়ানো ছুন্নত ও উত্তম তরীকা। যেমন, ইহা হযরত আলী ব্যতীত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এবং অন্যান্য সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল।

স্মরণীয় যে, অর্ধেক মাথায় চুল রাখা এবং অপর অর্ধেক মাথায় চুল কাটিয়া ফেলা জায়েজ নহে। কেননা ইহা ইহুদী এবং খ্রীষ্ঠানদের অভ্যাস। আর স্ত্রী লোকদের মত ঘাড়ের নীচে লম্বা চুল রাখাও জায়েজ নহে। মাথায় তৈল দেওয়া এবং চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইয়া ফেলা ছুন্নাত। হাদীসের আসল অর্থ হইল-"তোমরা ইহুদী, খ্রীষ্টান ও স্ত্রীলোকের সামঞ্জস্য হইওনা।"

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মাথা মুড়ানো খারেজী লোকদের আলামত। যেমন-অধিকাংশ 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' হাদীস গ্রন্থ সমূহের বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন-

سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ

"খারেজী লোকদের আলামত হইল মাথা মুড়ানো।" এই কারণে রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন-"যে ব্যক্তি মাথা মুড়াইয়াছে, সে আমার দলভূক্ত নহে।"

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَرَوَى الدَّارُ قُطْنِىْ فِى الْاَفْرَادِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَاتُوْضَعُ النَّوَاصِىْ اِلَّا فِىْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ وَلِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَمَّ الْخَوَارِجَ وَجَعَلَ سِيْمَاهُمْ حَلَقَ الرُّؤُسِ وَلِاَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِصَبِيْغٍ لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوْقًا لَضَرَبْتُ الَّذِىْ فِيْهِ عَيْنَاكَ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَلَّذِىْ يَحْلُقُ فِى الْمِصْرِ خَلِيْقُ الشَّيْطَانِ وَلِاَنَّ فِيْ ذٰلِكَ تَشَبُّهًا بِالْاَعَاجِمِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ – هكذا فى الغنية.

"হযরত আবু মুছা এবং হযরত ওবাইদ ইবনে ওমাইয়ার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন-"যেই ব্যক্তি মাথা মুড়াইয়াছে, সে আমার দলভুক্ত নহে।" দারুকুত্নী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন- "হজ্ব এবং ওমরাহ্ হজ্বের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মাথা মুড়াইবেনা।" আর খারেজী সম্প্রদায়ের মাথা মুড়ানোর ব্যাপারে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাহাদের সমালোচনা করিয়াছেন। আর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একজন রঞ্জন শিল্পীকে বলিলেন, "যদি আমি তোমাকে মাথা মুড়াইতে দেখিয়া থাকি, তবে আমি তোমার কপালে মারিবে"।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- "যে ব্যক্তি মাথা মুড়াইয়া থাকে, সে শয়তানের অভ্যাস পালন করিয়া থাকে। কারণ, মাথা মুড়ানো হইল নিজে আজমী বা বর্বর লোকদের সামঞ্জস্য ইখ্তিয়ার করা।" হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- "যেই ব্যক্তি অন্য জাতির সামঞ্জস্য ইখ্তিয়ার করিয়াছে, তবে সে তাহাদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গিয়াছে।"

এখন কথা হইল হযরত জাফর ইবনে আবু তালিবের ছেলেদের মাথা মুড়ানোর বিষয় লইয়া। অর্থাৎ মাথায় চুল রাখা উত্তম তরীকা হওয়া সত্বেও নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কেন হযরত আবু তালিবের ছেলেদের মাথা মুড়ানোর জন্য হুকুম দিয়াছিলেন? ইহার রহস্য এবং আসল তথ্য সম্পর্কে শাইখ মুহাক্কেক আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহ্লভী (রাঃ) এবং 'মুজাহেরে হক'



নামক কিতাবের প্রণেতা ইহাই বর্ণনা করেনঃ "যেহেতু উক্ত ছেলেদের মাতা আছমা বিন্তে উমাইশ বিপদ গ্রস্ত ছিলেন, ছেলেদের চুল ধোয়া এবং চিরুণী দ্বারা আঁছড়াইয়া ফেলা ইত্যাদি কাজ তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিলনা, তাই উক্ত ছেলেদের মাথা মুড়াইয়া ফেলেন।"

উক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রয়োজনবোধে মাথা মুড়ানো জায়েজ আছে। মাথা মুড়ানোকে অভ্যাসে পরিণত করা জায়েজ নহে। যেমন মুহাদ্দেছীনে কেরাম হাদীসের আলোকে উক্ত মাছয়ালা সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলেনঃ "হজ্ব এবং ওমরাহ্ হজ্বের সময়ে, প্রয়োজনের সময়ে এবং সন্তান জন্ম লাভ করিবার পর মাথা মুড়ানো ছুন্নাত ও জায়েজ। ইহা ছাড়া অন্য কোন সময়ে মাথা মুড়ানো অত্যন্ত খারাপ। স্বয়ং নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এবং সমস্ত সাহাবাগণের পবিত্র অভ্যাস ও নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা মাথায় চুল রাখিতেন।"

ছুন্নাত মতে চুল রাখার তিনটি নিয়ম আছে (১) জুম্মাহ্ (২) লিম্মাহ্ (৩) ওয়াফ্রাহ্।

কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখাকে 'জুম্মাহ্' বলা হয়, কানের নীচে ও কাঁধের উপরিভাগ পর্যন্ত চুল রাখার নাম 'লিম্মাহ্' এবং কান পর্যন্ত চুল রাখার নাম 'ওয়াফ্রাহ্'।

মাথা মুড়াইয়া ফেলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ছুন্নাতেরও পরিপন্থী। যদি কোন লোক মাথা মুড়ানোকে ছাবেত করিতে চাহে, তবে তাহারা উহাকে শুধু জায়েজ হিসাবেই ছাবেত করিতে পারিবে, কিন্তু রাসুলের ছুন্নাত হিসাবে ছাবেত করিতে পারিবেনা।

## মাথা মুড়ানো ছুন্নাত নহে

কোন ওজর বা অপারগতা ছাড়া পুরুষ লোকদের জন্য মাথা মুড়ানো মাকরূহ্ আর দাঁড়ী মুড়ানো হারাম এবং স্ত্রী লোকদের জন্য মাথা মুড়ানোও হারাম।

প্রখ্যাত মুহাদ্দেছ মোল্লাহ আলী ক্বারী (রাঃ) বলেনঃ

تَحْلِيْقُ الرَّأْسِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ لِاَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ سَائِرِ اَصْحَابِهٖ وَاظَبَ عَلٰى تَرْكِ حَلْقِهٖ اِلَّا بَعْدَ فِرَاغِ اَحَدِ النُّسُكَيْنِ.

"মাথা মুড়ানো ছুন্নাত নহে। কারণ, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এবং তাঁহার সাহাবাগণ হজ্ব এবং ওমরাহ্ হজ্ব হইতে অবসর হওয়ার পর মাথা মুড়ান ছাড়া অন্য সময়ে সর্বদাই মাথায় চুল রাখিতেন এবং মাথা মুড়ানোকে ত্যাগ করাই তাঁহাদের নিয়ম ছিল।"

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اِخْتِلَافٌ وَفِرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُوْنَ الْقِيْلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِعْلَ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَايَرْجِعُوْنَ حَتّٰى يَرْتَدَّ السَّهْمُ عَلٰى فُوْقِهٖ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ طُوْبٰى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوْهُ يَدْعُوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَيْسُوْا مِنَّا فِىْ شَيْئٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ اَوْلٰى بِاللّٰهِ مِنْهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاسِيْمَاهُمْ قَالَ اَلتَّحْلِيْقُ. رواه ابوداؤد.

'আবু দাউদ' নামক ছহীহ্ হাদীস গ্রন্থে আছে- "হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন-"অনতিবিলম্বে আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য এবং বিভিন্ন দলের আবির্ভাব হইবে। তাহাদের মধ্যে একদল লোক সুন্দর সুন্দর কথা বলিবে, কিন্তু তাহারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকিবে। তাহারা কুরআন শরীফ পড়িবে, কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠ-নালীর নীচে অতিক্রম করিবেনা, তাহারা ধর্ম হইতে এইভাবে বাহির হইয়া যাইবে, যেমন ধনু হইতে তীর ফলক বাহির হইয়া যায় এবং তাহারা ধর্মের দিকে ফিরিয়া আসিবেনা যদিও তীর ফলক ধনুর মধ্যে ফিরিয়া আসে (অর্থাৎ তীর ছুড়িবার পর তীর ফলক যেইরূপ ধনুর মধ্যে ফিরিয়া আসা অসম্ভব, সেইরূপ তাহারাও ধর্মের দিকে ফিরিয়া আসা অসম্ভব) তাহারা আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট জীব। যেই ব্যক্তি তাহাদিগকে কতল বা হত্যা করিবে এবং তাহারা যাহাকে শহীদ করিবে, সেই ব্যক্তির জন্য সু-সংবাদ রহিয়াছে। তাহারা মানুষকে আল্লাহ্র কিতাব কুরআনের দিকে ডাকিবে, কিন্তু (কুরআন এবং) আমার ছুন্নাত হইতে কোন কিছুর মধ্যে তাহারা নাই। যেই ব্যক্তি



তাহাদিগকে হত্যা করিবে, সে আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ করিবে।" সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেনঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! তাহাদের চিহ্ন কি?" হুজুর বলিলেনঃ (তাহাদের চিহ্ন হইল) "মাথা মুড়ানো।" (আবু দাউদ)

## খারেজী ও ওহাবীদের চিহ্ন

নেসায়ী শরীফে হযরত সুরাইক ইবনে শিহাব (রাঃ) হইতে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীসের শেষাংশ নিম্নরূপঃ

একদা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে কিছু গণিমতের মাল আনা হইল। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ঐ মালগুলি তাঁহার ডান পার্শ্ব ও বাম পার্শ্বের লোকজনের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার পিছন দিকে অবস্থিত লোকগুলিকে কিছুই দিলেন না। অতঃপর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পিছন দিকের একটি লোক দাঁড়াইয়া বলিলঃ "হে মুহাম্মদ! তুমি বন্টন করার মধ্যে ইনসাফ কর নাই" সেই লোকটি চুল মুড়ানো কাল বর্ণের ছিল এবং তাহার গায়ে দুইটি সাদা কাপড় ছিল। তাহার কথা শুনিয়া নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেনঃ "খোদার শপথ, তুমি আমার পরে অন্য কাহাকেও আমার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ন ও ইনসাফকারী পাইবে না।" তারপর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ "শেষ জামানায় একটি দল আত্মপ্রকাশ করিবে, এই লোকটিও সেই দলের একজন এবং তাহাদের তরীকাভুক্ত। তাহারা কুরআন শরীফ পড়িবে, কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামিবে না। তাহারা ইসলাম ধর্ম হইতে এইভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেইভাবে তীর ফলক ধনুক হইতে বাহির হইয়া যায়। سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ "তাহাদের চিহ্ন হইবে মাথা মুড়ানো। তাহারা সর্বদা আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত দাজ্জাল তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইবে। অতঃপর তোমরা যখন ঐ দলের লোকদের সাক্ষাৎ পাইবে তখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। কেননা, তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীব।"

উল্লেখিত হাদীসগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, খারেজীদের বিশিষ্ট আলামত হইল মাথা মুড়ানো। ঐ খারেজীগণ হযরত ওসমান গনি (রাঃ)কে বেদায়াতী বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিল এবং হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আমীর

মুয়াবিয়া (রাঃ)কে 'শির্‌ক' এর সহিত ফতোয়া প্রদান করিয়াছিল। ইহা সম্পর্কে ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে।

বুখারী শরীফে একটি দীর্ঘ হাদীস আছে, উহার মধ্যবর্তী অংশটি নিম্নরূপ–

فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ اِتَّقِ اللّٰهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِىَ اللّٰهَ. (بخارى)

"হুজুর আকরম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) 'হুনাইন' যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মাল সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করিতে ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেল, যাহার চক্ষুদ্বয় ভিতরের দিকে ধসানো ছিল, কপাল বা গালের টোল দুইটি ফুলা, কপালখানি উঁচু, দাঁড়ি খুব ঘন ও বেশী ছিল, মাথা মুড়ানো এবং লুঙ্গি উঁচু করিয়া পরিহিত ছিল, সে বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করুন (অর্থাৎ মাল বন্টনের মধ্যে ন্যায়-বিচারের প্রতি লক্ষ্য করুন এবং খোদার হুকুম মানিয়া চলুন) এই কথা শুনিয়া হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, "তোমার ক্ষতি হউক, জমিনের বাসিন্দাগণের মধ্যে আমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় করার ব্যাপারে অধিকতর উপযুক্ত নহি?" (অর্থাৎ আমি সকলের চেয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম অধিকভাবে মানিয়া চলি, তুমি আমাকে হুকুম মানিয়া চলার কি নির্দেশ দিতেছ?) এই হাদীসের শেষাংশে আছে, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেনঃ এই লোকটির বংশ হইতে এমন একটি দল সৃষ্টি হইবে, তাহারা সুন্দর, মধুর সূরে এবং তাজ্‌বীদ সহকারে কুরআন শরীফ পড়িবে, কিন্তু এই কুরআন তাহাদের কণ্ঠনালীর নীচে অতিক্রম করিবে না। তাহারা ইসলাম ধর্ম হইতে এইভাবে বাহির হইয়া যাইবে, যেইভাবে ধনুক হইতে তীর ফলক বাহির হইয়া যায়, যদি আমি সেই দলের আত্ম-প্রকাশের জামানা পাইতাম, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে হত্যা করিতাম, যেইভাবে কওমে আ'দ এবং কওমে ছামুদকে হত্যা করা হইয়াছে।" (বুখারী)

উল্লেখিত বর্ণণাগুলি দ্বারা প্রমানিত হইল যে, সর্বদা মাথা মুড়ানোর অভ্যাস করা খারেজী এবং বে-আদব ও অসৎ-চরিত্র লোকদের আলামত। হাঁ, যেই হাদীস সমুহে মাথা মুড়ানোর জন্য হুকুম দেওয়া হইয়াছে, উহার কারণ হইল-



কোন কোন লোক খ্রীষ্টানদের অভ্যাস অনুযায়ী মাথার কিয়দংশ মুড়াইয়া ফেলে এবং কিয়দংশ মাথায় চুল রাখিয়া দেয়, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, ইহা হারাম, বরং ইহার চেয়ে সমস্ত মাথা মুড়াইয়া ফেলা উত্তম। অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের ঐ খারাপ অভ্যাসের তুলনায় পূরা মাথা মুড়াইয়া ফেলা ভাল। ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতে গিয়া হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মাথা মুড়ানোকে জায়েজ হিসাবে হুকুম দিয়াছেন। অন্য একটি জাতির খারাপ অভ্যাসের তুলনায় মাথা মুড়ানোর এই হুকুম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা মাথা মুড়ানো রাসুলের ছুন্নাত বলিয়া প্রমাণিত হইবেনা। কারণ, ছুন্নাত বলিতে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এবং সাহাবাগণের চিরাচরিত অভ্যাসকেই বুঝায়, যাহা তাঁহাদের কথা ও কাজের দ্বারা ছাবেত আছে।

## হযরত আলী (রাঃ) কেন মাথা মুড়াইতেন

**প্রশ্নঃ** হযরত আলী (রাঃ) তাঁহার মাথা মুড়ানোর ব্যাপারে কেন সর্বদা পাবন্দী করিতেন?

**উত্তরঃ** হাদীসে আছে;

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا كَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى ثَلَاثًا. (رواه ابوداؤد واحمد والدارمى)

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন; "যেই ব্যক্তি জানাবত বা নাপাক অবস্থায় গোসল করে এবং সেই গোসলে যদি একটি চুল পরিমাণ জায়গাও সে না ধুইয়া ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহাকে আগুণে এইরূপ এইরূপ আজাব দেওয়া যাইবে।" (অর্থাৎ তাহাকে দোজখের আগুনের মধ্যে আজাবের উপর আজাব দেওয়া হইবে, একে তো নাপাক থাকার কারণে এবং অপরটি তাহার সমস্ত নামাজ নষ্ট করার কারণে। তাই গোসলের মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত)।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন; "এই কারণে আমি আমার মাথার সহিত শত্রুতা করিয়াছি, এই কারণে আমি আমার মাথার সহিত শত্রুতা করিয়াছি, এই কারণে আমি আমার মাথার সহিত শত্রুতা করিয়াছি।" ইহা তিনবার বলিলেন।

(আবু দাউদ, আহমদ, দ্বারমী, মিশ্‌কাত ও বুখারী)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দেছগণ বলিয়াছেন; নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ইরশাদ "যেই ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় গোসলের মধ্যে একটি চুলও নাধুইয়া ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার উপর আজাব হইবে" ইহা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "যখন আমি এই আজাবের কথা এবং সতর্কবানী শুনিলাম, তখন আমার চুলের নীচে পানি পৌছিবেনা বলিয়া এই ভয়ে আমি আমার মাথার সহিত শত্রুর মত কাজ করিলাম। অর্থাৎ এক শত্রু অপর শত্রুকে যেইভাবে মারিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমিও আমার মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলিলাম।"

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন হজ্বের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে মাথা মুড়াইতেন না। হযরত আলী (রাঃ) এর উক্ত কথা (আমি আমার মাথার সহিত শত্রুতার কারণে এই কাজ করিয়াছি, অন্য কোন কারণে করি নাই) দ্বারা এক প্রকার ওজর বা অপারগতাই বুঝায়। যেহেতু তৎকালীন আরবদেশে পানির খুব অভাব ছিল, তাই জানাবতের গোসলে পানি সমস্ত শরীরে বিশেষভাবে মাথার চুলের গোড়ায় পৌছিয়াছে কি না, ইহার মধ্যে সন্দেহ ছিল। এই ভয়ে হযরত আলী (রাঃ) মাথা মুড়াইয়া ফেলিতেন। নতুবা, হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন যাহা করিতেছেন (অর্থাৎ মাথায় চুল রাখিতেছেন) ইহাই ছুন্নাত বলিয়া হযরত আলীরও জানা ছিল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রাঃ) বারবার বলেন যে, "আমি আমার মাথার সহিত শত্রুতা করিতেছি।" অতঃপর তাঁহার এই কাজ হইতে মাথা মুড়ানো শুধু জায়েজ হিসাবে ছাবেত হইতে পারে। কিন্তু উহা ছুন্নাত বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কেননা, হযরত আলী (রাঃ) নিজেই ফতোয়া দিতেছেন; " জানাবতের গোসলে মাথার কোন অংশ শুক্না থাকার ভয়ে আমি নিজের মাথার সহিত শত্রুতা করিতেছি।" ইহা তো তাঁহার একটি



ওজর বা অপারগতা বিশেষ। সুতরাং আমরাও কোন ওজর বা অপারগতার সময়ে মাথা মুড়ানোকে জায়েজ বলিয়া থাকি। হজ্বের সময়ে মাথা মুড়ানো নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কাওল এবং ফে'ল দ্বারা সুন্নাত হিসাবে ছাবেত আছে।

উক্ত হাদীস হইতে হযরত আলী (রাঃ) সর্বদা মাথা মুড়াইতেন বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারেনা বরং তিনি চুল ছাঁটিয়া ফেলিতেন। হাঁ, যদিও তিনি মাথা মুড়াইতেন, কিন্তু তাঁহার এই কাজ জায়েজ বলিয়া প্রমানিত হইতে পারে, ছুন্নাত হিসাবে ছাবেত হইতে পারেনা। হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সর্বদা মাথা মুড়ানোকে ওহাবী নজদীগণের আলামত স্থির করিয়াছেন। সুতরাং বিশেষতঃ এই জামানায় সুন্নী মুসলমানগণ সর্বদা মাথা মুড়ানোর অভ্যাস হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত কর্তব্য।

আল্লামা শাইখ ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল্‌-বাইজুরী (রাঃ) এর রচিত 'আল্‌-মুয়াহেবুল- লুদুন্নীয়াহ্' (ইহা ইমাম তিরমিযীর 'শামায়েলে মুহাম্মদীয়া' কিতাবের শরাহ) নামক কিতাবের ৩৬ পৃষ্ঠায় আছে-

اَلشَّعْرُ فِىْ الرَّأْسِ زِيْنَةٌ وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ وَحَلْقُهُ بِدْعَةٌ وَقَالَ فِىْ شَرْحِ الْمَصَابِيْحِ لَمْ يَحْلِقِ النَّبِىُّ رَأْسَهُ فِىْ سِنِى الْهِجْرَةِ اِلَّا فِىْ عَامِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمَرَةِ الْقَضَاءِ وَحَجَّةِ الْوِدَاعِ وَلَمْ يَقْصُرْ شَعْرَهُ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا فِىْ الصَّحِيْحَيْنِ.

"মাথায় চুল রাখা সৌন্দর্য, চুল ছাড়িয়া দেওয়া ছুন্নাত এবং উহা মুড়াইয়া ফেলা বেদায়াত।"

'মুসাবিহ্' নামক হাদীস গ্রন্থের ব্যাখ্যা কারীগণ বলিয়াছেন, "নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হিজরতের বৎসর সমুহে মাথা মুড়ান নাই, কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির বৎসরে এবং ওমরাতুল্ ক্বাজা ও বিদায় হজ্বের বৎসরেই মাথা মুড়াইয়া ছিলেন। আর তিনি একবার মাত্রই মাথা মুড়াইয়াছিলেন, ইহা ছাড়া অন্য কোন সময়ে তিনি মাথা মুড়ান নাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখিত বর্ণনা সমুহ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কোন ওজর বা অপারগতা ছাড়া

মাথা মুড়ানো বেদায়াত এবং ছুন্নাতের পরিপন্থি কাজ।

হাঁ, অবশ্য কোন কোন ফিকাহের কিতাবে (যেমন শ্বামী ও আলমগীরী প্রভৃতি কিতাবে) কোন কোন আলেম হইতে মাথা মুড়ানো ছুন্নাত বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাঁহাদের উক্ত উদ্ধৃতির ভিত্তি অধিকতর আল্লামা তীবী প্রমুখ আলেমগণের বক্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হানাফী মাযহাবের বড় বড় মুহাক্কেক আলেমগণ মাথা মুড়ানোকে রুখ্ছাত বলিয়াছেন। যেমন আল্লামা শায়খুল মুহাদ্দেছীন মোল্লা আলী ক্বারী বলেনঃ

وَلَايَخْفٰى اَنَّ فِعْلَهُ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِسُنَّتِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَبَقِيَّةِ الْخُلَفَاءِ مِنْ عَدَمِ الْحَلْقِ اِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ النُّسُكِ يَكُوْنُ رُخْصَةً لَاسُنَّةً وَاللّٰه تَعَالٰى اَعْلَمُ (مرقات)

ইহা অতীব স্পষ্ট যে, "নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ও অবশিষ্ট খোলাফায়ে রাশেদীনের ছুন্নাত তথা মাথা না মুড়ানোর খেলাফ বলিয়া হযরত আলীর উক্ত কাজটি রুখ্ছাত হিসাবে গণ্য হইবে। ইহা ছুন্নাত হইতে পারেনা।" (মিরকাত)

অধিকন্তু, হযরত আলী (রাঃ) عَـادَيْتُ رَاْسِى (আমি আমার মাথার সহিত শত্রুতা করিয়াছি) বলিয়া তিনি নিজেই এই কথার দিকে ইশারা করিতেছেন যে, মাথা মুড়ানো ছুন্নাত নহে, বরং ওজর বা অপারগতা হেতু রুখ্ছাত। আর যদি মাথা মুড়ানো ছুন্নাত হইত, তবে عَـادَيْتُ "আমি শত্রুতা করিয়াছি" এই কথাটি বলিতেন না। কেননা, ছুন্নাতের মুকাবিলায় 'আমি শত্রুতা করিয়াছি' বলা যায় না! সুতরাং হাদীস ব্যাখ্যা কারীগণ উহাকে ওজর বা অপারগতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

'মিরকাত' নামক কিতাবে আছে -

مخافة ان لايصل الماء الى جميع شعرى اى عاملت مع رأسى معاملة المعادى مع العدو من القطع والجز فجززته وقطعته وروى ابوداؤد فى آخر هذا الحديث انه كان يجز شعره وعن ابى عبيدة عاديت شعرى



رفعته عند الغسل وايضا اى فعلت برأس مايفعل بالعدو من الاستيصال وقطع دابره وفيه نوع اعتذار عن ترك المتابعة ظاهرا وسببه كثرة الجماع الموجبة بكثرة الغسل.

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছে; আমার মাথার সমস্ত চুলের ভিতরে পানি না পৌঁছিবার ভয়ে আমি এইরূপ করিতেছি অর্থাৎ দুশ্মনের সহিত যেইরূপ কাজ করা হয়, আমার মাথার সহিত আমিও সেইরূপ কাজ করিয়াছি।" এই হাদীসের শেষাংশে 'আবু দাউদ' নামক হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে- "হযরত আলী (রাঃ) তাঁহার মাথার চুল কাটিয়া ফেলিতেন।" হযরত আবু উবায়দাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হযরত আলী বলেন; "আমি আমার মাথার সহি শত্রুতা করিয়াছি, আমি উহা গোসলের সময় উঠাইয়াছি। অর্থাৎ আমি আমার মাথার চুল উঠাইয়া এবং মাথা মুড়াইয়া আমার মাথার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি, যেইরূপ শত্রুর সহিত করা হয়।

উক্ত কাজে হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্যে অনুসরণ করিতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁহার এক প্রকার ওজর প্রকাশ পাইতেছে। আর ইহার কারণ হইল অধিকভাবে সহবাস করা, যদ্বারা অধিকভাবে গোসল করা প্রয়োজন হয়।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وُقِّتَ لَنَا فِىْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبْطِ وَحَلَقِ الْعَانَةِ اَنْ لَّانَتْرُكَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. (رواه مسلم)

অনুবাদঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- "আমাদের গোঁফ ছাঁটার মধ্যে, নখ কাটার মধ্যে, বগলের নীচের কেশগুলি দুর করা এবং নাভীর নীচের কেশগুলি মুড়াইয়া ফেলার ব্যাপারে আমাদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, আমরা যেন এই ব্যাপারে চল্লিশ দিনের অধিক সময় অতিবাহিত না করি।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ- অন্য একটি হাদীসে আছে- নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কাটিতেন এবং গোঁফ ছাঁটিতেন। আর নাভীর নীচের

কেশগুলি বিশ দিনের মধ্যে মুড়াইয়া ফেলিতেন এবং বগলের নীচের কেশগুলি চল্লিশ দিনের মধ্যে দুর করিয়া ফেলিতেন। অর্থাৎ চল্লিশ দিনের অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন না। আর যদি উহা হইতে অল্প দিনের মধ্যে দুর করিয়া থাকে, তবে ইহা অত্যন্ত ভাল। আর চল্লিশ দিনের অধিক উক্ত কাজগুলি ছাড়িয়া দেওয়া মাকরূহ এবং তখন নামাজও মাকরূহ হইয়া থাকে। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, গোঁফ ছাঁটিয়া ফেলা ছুন্নাত, মুড়াইয়া ফেলা ছুন্নাত নহে। বরং অধিকাংশ ফকীহগণ গোঁফ মুড়াইয়া ফেলাকে বেদায়াত বলিয়াছেন।

## শবে বরাতের বর্ণনা

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَطْلُعُ اللّٰهُ اِلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهٖ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ. (رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه)

অনুবাদঃ- হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেনঃ- "শা'বান মাসের পনর তারিখ রাত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতি কৃপা দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। আর মুশরিক বা শত্রুতাকারী লোক ছাড়া সমস্ত মাখ্‌লুকাতকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।" (তাবরানী ও ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যাঃ- কোন কোন লোক শা'বান মাসের পনর তারিখ রাত্রি, যাহাকে 'শবে বরাত বলা হয়, উহার মৌলিকতাকে অস্বীকার করিয়া থাকে। অথচ অধিকাংশ মুফাচ্ছেরীন কেরাম

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ.

"আমি কুরআন শরীফটি বরকতওয়ালা রাত্রিতে অবতীর্ণ করিয়াছি" খোদার এই বাণী হইতে 'বরকত ওয়ালা রাত' বলিতে শা'বান মাসের পনর তারিখ রাত তথা 'শবে-বরাত' কে বুঝাইয়াছেন। তাফসীরের কিতাব সমুহে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে।

এইখানে আমি উক্ত রাত্রির মৌলিকতা ও ফজিলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস



বর্ণনা করিতেছি। উল্লেখিত যেই হাদীসটি ইমাম তাবরানী (রাঃ) হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে এবং ইমাম ইবনে হাব্বান (রাঃ) তাঁহার 'ছহীহ্' কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সঠিক ভিত্তি ও মৌলিকতা ছহীহ্ হাদীস দ্বারা ছাবেত আছে। যেই ব্যক্তি উহা অস্বীকার করিবে, সে হাদীসের অস্বীকারকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইমাম বায়হাক্বী (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন, "আমার নিকট জিব্রাঈল ফেরেস্তা আসিয়া বলিল,

هٰذِهٖ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَاللّٰهُ فِيْهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُوْرِ غَنَمِ بَنِىْ كَلْبِ الخ.

আজ শা'বান মাসের পঞ্চদশ রাত্রি। আল্লাহ্ পাক এই রাত্রিতে 'বনি কাল্‌ব (ইহা আরবের একটি বড় গোত্র, এই গোত্রের লোকেরা অনেক ছাগল পালিত) এর ছাগলগুলির লোম সংখ্যা পরিমাণ মানুষকে দোজখের আগুন হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন। আর মুশরিক, শত্রুতাকারী, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী, পায়ের চুল-গিরার নীচে লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধানকারী, পিতা-মাতাকে অমান্যকারী, সর্বদা মদ্যপানকারী লোকের দিকে এই রাত্রিতে আল্লাহ্ পাক তাকায় না।

ইমাম আহমদ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- "শা'বান মাসের পঞ্চদশ রাত্রিতে আল্লাহ্ পাক মখলুকাতের দিকে নজর করিয়া থাকেন, অতঃপর তিনি শত্রুতাকারী এবং হত্যাকারী এই দুই ব্যক্তি ছাড়া সকল মানুষের গুনাহ মাফ করিয়া থাকেন।"

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন; "হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) রাত্রে নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন, এবং অনেক লম্বা সিজদা করিলেন, এমনকি আমার ধারণা হইল যে, তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। অতঃপর আমি আমার ধারণা মোতাবেক তাঁহার বৃদ্ধ আঙ্গুলটি নড়া-চড়া করিলাম, ইহাতে উহা নড়িয়া উঠিল। তৎপর আমি আমার

ধারণা হইতে ফিরিয়া আসিলাম এবং আমি শুনিলাম যে, তিনি সিজদার মধ্যে বলিতেছেনঃ

اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ لَااُحْصٰى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার মার্জনার সহিত তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার রাগ হইতে মুক্তি কামনা করিতেছি এবং তোমার দ্বারা তোমার (পাকড়াও) হইতে তোমারই নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। তুমি নিজেই তোমার যেইরূপ প্রশংসা করিয়াছ, আমি তোমার সেইরূপ প্রশংসা করিতে পারিনা।"

তারপর তিনি যখন সিজদা হইতে মাথা তুলিলেন এবং নামাজ হইতে অবসর হইলেন তখন তিনি বলিলেন- "আয়েশা ! তুমি ধারণা করিয়াছ যে, আল্লাহ্‌র রাসুল তোমার সহিত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছে এবং তোমার (পালাক্রম) রাত্রিতে অন্য স্ত্রীর নিকট চলিয়া গিয়াছে" আমি বলিলাম- "না, তাহা নহে, বরং আপনার দীর্ঘ সিজদার দরুণ আপনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই আমি ধারণা করিয়াছিলাম।" তারপর তিনি বলিলেন- আয়েশা! অদ্য কোন রাত্রি, তাহা কি তুমি জান? আমি বলিলাম- আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন- "অদ্য শা'বান মাসের পঞ্চদশ রাত্রি, আল্লাহ্‌পাক এই রাত্রিতে তাঁহার বান্দাগণের দিকে কৃপাদৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং গুনাহ্ হইতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণকে মাফ করিয়া থাকেন, আল্লাহ্‌র রহ্মত কামনাকারীগণের উপর রহ্মত বর্ষণ করিয়া থাকেন, আর হিংসুক ব্যক্তিগণকে ঐভাবে ছাড়িয়া দেন, যেভাবে তাহারা বিদ্যমান আছে।"

উক্ত হাদীসটি আল্লামা বায়হাক্বী (রহঃ) হযরত আলা' ইবনে হারেছ (রাঃ) এর সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন- هٰذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ "ইহা উত্তম মুরছাল হাদীস।"

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন- "যখন শা'বান মাসের পঞ্চদশ রাত্রি হইবে,



فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا الخ.

তখন ঐ রাত্রিতে তোমরা নামাজ পড়িবার জন্য দাঁড়াইয়া যাও এবং উহার দিবাকালে রোজা রাখ, কারণ ঐ রাত্রিতে আল্লাহ্ পাক সুর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন যে কোন লোক মাগফেরাত কামনাকারী আছ? যাহাকে আমি মাফ করিয়া দিই। কোন লোক রিজিক বা ধন-দৌলতের জন্য প্রার্থনাকারী আছ? যাহাকে আমি রিজিক বা ধন-দৌলত প্রদান করি। কোন লোক রোগ হইতে আরোগ্য কামনাকারী আছ? যাহাকে আমি আরোগ্য করিয়া দিই, কোনলোক এইরূপ-সেইরূপ আছ? যাহাকে আমি তাহার মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া দিই। এমনকি ফজর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা এইভাবে তাঁহার বান্দাগণকে সম্বোধন করিতে থাকেন।"

উক্ত হাদীসটি ইবনে মাজাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্রূপ শায়েখ ইমাম হাফেজ রুকনুদ্দিন আবদুল আজীম ইবনে আবদুল ক্বাবী আল্‌মুনজরী (রহঃ) রচিত 'আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, 'শবে-বরাত' এ নফল নামাজ, তাস্‌বীহ ইত্যাদি অধিকভাবে পাঠ করা উচিত। ইহা বরকত ও রহমত নাজিল হওয়ার রাত্রি, দোয়া কবুল হওয়ার রাত্রি এবং খোদার রহ্মতের সমুদ্রের ঢেউ উঠার রাত্রি। এই রাত্রিতে অধিকভাবে নফল নামাজ এবং দোয়া দরূদ পাঠের মাধ্যমে নিজের থলে ভরতি করিয়া লওয়া প্রত্যেক বান্দার উচিত। এই রাত্রিতে সুফী মহাত্মগণ একশত রাকাত নফল নামাজ পড়িয়াছেন বলিয়া ছাবেত আছে। যদি ততটুকু সম্ভব না হয়, তবে বিশ অথবা বার অথবা চার বা দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পার। এই রাত্রিতে কবর জেয়ারত করিবেন। নিজের ও সমস্ত মুসলমানের গুনাহ মাফ চাহিবেন। নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে দোয়া করিলে এই রাত্রে কবুল হইয়া থাকে।

"শবে-বরাতের" নামাজ জামায়াত সহকারে পড়া ধর্মীয় ইমামগণ 'মাকরূহ' বলিয়াছেন। ফিকাহ্ ও ফতোয়ার কিতাব সমূহে উহার বিস্তারিত বর্ণনা

রহিয়াছে। কিন্তু জামায়াত সহকারে নফল নামাজ পড়াকে রুখিবার জন্য খামোখা (غلو كرنا) উঠিয়া-পড়িয়া লাগা কাহারো পক্ষে উচিত নহে। কারণ, কোন কোন আউলিয়ায়ে কেরাম জামায়াত সহকারে নফল নামাজ পড়িয়াছেন বলিয়া ছাবেত আছে। কোন কোন ফকীহ্ মুফাচ্ছেরীনে কেরামও যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াত সহকারে নফল নামাজ পড়াকে জায়েজ বলিয়াছেন। অতঃপর যদি মুসল্লীগণ এশারের নামাজ পড়িবার জন্য মসজিদে সমবেত হয়, তবে কোন আড়ম্বর ব্যতীত যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা মসজিদের এক পার্শ্ব জামায়াত সহকারে নফল নামাজ পড়িতে পারে। আর যাঁহারা পড়িতে চাহেনা, তাহাকে ডাকিয়া, অথবা বাধ্য করিয়া বা তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া তাহাকে জামাতের সহিত নামাজ পড়ানো অনুচিত। কেননা এই সমস্ত ইবাদত এবং নফল কাজ সমূহ চুপে চুপে করা উত্তম। অধিকন্তু, ফকীহ্গণও জামায়াত সহকারে নফল নামাজ পড়া মক্রূহ বলিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক দিকে লক্ষ্য করা অত্যন্ত ভাল।

স্মরণীয় যে, কোন কোন মূর্খ লোক ঐ রাত্রিতে গোলাবাজী ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকে। সাবধান, ইহা একেবারে হারাম। ঐরূপ খেলা-ধুলা এবং রং-তামাশা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

পাঠকবৃন্দ! এই রাত্রি অধিকভাবে ইবাদত, তাস্বীহ ও জিকির ইত্যাদি করিবার রাত্রি। এই রাত্রিতে বিনয়সহকারে খোদার দরবারে নিজের গুনাহ্ হইতে তওবা করুন এবং আল্লাহ্র রহমতের জন্য প্রার্থী হউন। আর নিজের অন্তরকে নরম করিয়া কান্না-কাটি করুন। ইহা অত্যন্ত বরকতওয়ালা রাত্রি। এই রাত্রিত্রে নিঃসন্দেহে দোওয়া কবুল হইয়া থাকে। এই রাত্রিতে আসমান হইতে অগণিত ফেরেস্তা জমিনে নাজিল হইয়া থাকে। এই রাত্রির অনেক ফজিলত আছে। ইহা বিস্তারিত বর্ণনা এইখানে সংকুলান হইবে না।

**টীকাঃ-** 'লাইলাতুর রাগায়েব' অর্থাৎ রজব মাসের প্রথম জুম্মার রাত্রি এবং শা'বান মাসের পনর তারিখের রাত্রি যাহাকে 'শবে-বরাত' বলা হয়, উক্ত রাত্রি সমূহে নফল নামাজ পড়া এবং রাত্রে জাগিয়া ইবাদত করা সূফীয়ায়ে কেরামের নিয়ম ছিল এবং বড় বড় সূফীগণ ঐ রাতগুলিতে নফল নামাজ পড়াকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন। যেমন, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রাঃ)



রচিত 'ইহ্য়াউল্ উলুম' নামক গ্রন্থে এবং আবু তালিব মক্কী (রাঃ) লিখিত "কুয়াতুল কুলুব" নামক কিতাবে উক্ত রাত্রিগুলি সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে।

'বাহ্জাতুল আছরার' নামক কিতাবে উক্ত রাত্রিগুলি সম্পর্কে ছৈয়্যদুনা শাইখ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর বর্ণনা মওজুদ আছে। তিনি উক্ত রাত্রি সমূহে নফল নামাজ পড়িতেন বলিয়া উক্ত কিতাবে ছাবেত রহিয়াছে। রজব চাঁদের সাতাইশ তারিখ রাত্রেও নফল নামাজ পড়া ও দিনে রোজা রাখা অত্যন্ত ফজিলত। উল্লেখিত রাত্রিগুলিতে নামাজ পড়া, দোয়া কবুল হওয়া এবং বিভিন্ন বৈশিস্ট্যাবলী সম্পর্কে বুজুর্গানে দ্বীন অনেক কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। তাই আমাদের আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ উক্ত রাত্রিগুলিতে নফল নামাজ পড়া, জাগ্রত থাকিয়া অন্যান্য ইবাদত করা মুস্তাহাব ও মুস্তাহ্ছান মনে করেন।

নফল নামাজ জামাতে আদায়ের হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখিত কিতাব " আচ্ছালাতুত্ তা- তাউওয়ায়ূ বে ইক্বতেদায়ীল মুতাউয়ে" নামক কিতাবটি পাঠ করার অনুরোধ রইল। যা আমার স্নেহের এম, এম, মহিউদ্দীন বাংলায় ভাষান্তর করেছে।

### কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে সূদ ব্যাপক আকার ধারণ করিবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقٰى اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلَ الرِّبٰوا فَاِنْ لَّمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهٗ مِنْ بُخَارِهٖ وَيُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ. (رواه ابوداؤد واحمد والنسائى وابن ماجة)

**অনুবাদঃ-** হযরত ছাইয়্যাদুনা আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন; মানব-জাতির নিকট এমন একটি যুগ আসিয়া পড়িবে, তখন সূদ না খাওয়া কোন লোকই থাকিবেনা। যদি সূদ না

খাইয়াও থাকে, তবেও তাহার নিকট সূদের ছিঁটা-ফোঁটা পৌঁছিবে। (আহমদ, আবু দাউদ, নেসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যাঃ- কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে সূদের ব্যাপারটি এতই ব্যাপক আকার ধারণ করিবে এবং এতই সর্ব-সাধারণ হইয়া পড়িবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাধ্যমে হউক বা মাধ্যম ব্যতীত হউক যেই কোন সময়ে অবশ্যই সূদ খাইয়া বসিবে, যেমন বর্তমান যুগে ইহা ঘটিতেছে।

বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কোন কাজ-কর্ম চলেনা আর কোন ব্যাংক সূদ ছাড়া লেনদেন করে না। এখন ঐ সূদের টাকা দ্বারা যেই কারবার চলিবে, উহার মধ্যে অবশ্যই সূদ শামিল হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু, কেহই সূদ গ্রহণ করিবে, কেহই সূদ প্রদান করিবে কেহই সূদের দলীল-পত্র লিখিবে, কেহই ঐ সমস্ত সূদের কারবার ওয়ালার ঘরে দাওয়াত খাইবে, কেহই ঐ সমস্ত মানুষ হইতে ধর্মীয় কাজে চাঁদা লইবে। অতঃপর এই সূদের টাকা-পয়সা যেই কোন প্রকারে প্রত্যেক জায়গায় এবং প্রত্যেক স্তরে অবশ্যই পৌঁছিয়া যাইবে।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যেই ব্যক্তির উপার্জিত ধন-সম্পদ হালাল ও হারামে মিশ্রিত, তাহার সেইখানে চাকুরী করিয়া বেতন লওয়া, তাহার নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করা তাহার সেইখানে দাওয়াত খাওয়া ইত্যাদি কাজ জায়েজ আছে। হাঁ, সম্পূর্ণ হারাম উপার্জনকারী লোকের সেইখানে না চাকুরী করা জায়েজ আছে, আর না তাহাদের সহিত কোন কাজ-কর্ম দুরস্ত আছে। তাই হাদীসে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সূদ ব্যাপক আকার ধারণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত মানুষকে ফাছেক বা গুনাহ্গার বলেন নাই। নিছক সূদখোর ফাছেক বটে। কিন্তু যাহার নিকট সূদের ছিঁটা-ফোঁটা পৌঁছিয়াছে, তাহাকে ফাছেক বলা যাইবেনা।

আল্লাহতালা হযরত মুসা (আঃ) কে ফেরাউনের নিকট এবং নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে আবু তালিবের নিকট লালন-পালনের জন্য রাখিয়াছিলেন, তাহাদের উভয়ের উপার্জন হালাল ও হারামে মিশ্রিত ছিল, তাঁহাদের উপার্জন কোন একেবারে হালাল ছিলনা। যদি হালাল ও হারাম মিশ্রিত উপার্জনকারী মানুষের নিকট দাওয়াত খাওয়া এবং তাঁহাদের নিকট



হইতে চাঁদা লওয়া হারাম হইত, তবে তাহাদের নিকট আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূল মুসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের লালন-পালন করাইতেন না। আর যদি হালাল-হারাম মিশ্রিত টাকা-পয়সা হইতে এই সমস্ত কাজ-কর্ম পৃথক করিয়া দেওয়া হয়, তবে বর্তমানে কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি টিকিয়া থাকিতে পারেনা। কেননা, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক লোক হইতে চাঁদা লওয়া হয়। খাঁটি হালাল টাকা কিনা, উহা বিবেচনা করা হয়না, আর উহা করাও সম্ভব নহে। এই মাসয়ালাটি অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। উক্ত পদ্ধতিতে বর্তমান কালের ব্যাংক ইত্যাদি বিভাগের চাকুরীর অবস্থাও সকলে জানিতে পারিয়াছেন। অবশ্য এই জমানায় হালাল উপার্জন করা অসম্ভব নহে, অবশ্য মুস্কিল বটে। (মিরআত ইত্যাদি)

মোট কথা এই যে, উল্লেখিত হাদীসে সূদের ব্যাপারে অতি ব্যাপক আকার ধারণ করা সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আশ্রাফ হউক বা আতরাফ হউক, সম্মানিত হউক বা অসম্মানিত হউক, যেই কোন ব্যক্তি সূদ অথবা সূদের ছিটা-ফোঁটা হইতে বাঁচিয়া থাকা বড়ই মুস্কিল হইবে।

খাঁটি সূদ হইতে দুরে সরিয়া থাকাতো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। সূদের ছিটা বা সূদ মিশ্রিত কাজকর্ম হইতে দূরে সরিয়া থাকার জন্য চেষ্টা করাও অপরিহায্য। যদিও ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকা বড় কঠিন ব্যাপার, তবুও শক্তি অনুযায়ী দূরে সরিয়া থাকার জন্য চেষ্টা করিবেন। বর্তমানে খাঁটি হালাল-রিজিক খুব কম। যদি সূদ না থাকে, তবে সেইখানে সূদের ছিটা অবশ্যই আছে। হারাম রিজিক খাইলে ক্বলব (অন্তঃকরণ) শক্ত হইয়া যায়। আল্লাহ্পাক মুসলমান সমাজকে হালাল রিজিক দান করুন এবং ক্বলবের কাঠিন্যতা হইতে হেফাজত করুন, আমিন।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, অত্যন্ত অভাবের দায়ে যদি কোন লোকের টাকার দরকার হয়, তবে সেই সময় সূদ দেওয়ার অনুমতি আছে। যেমন 'দুর্‌রে মুখ্‌তার' নামক কিতাবে আছে يَجُوزُ لِلْمُحْتَاجِ الْاِسْتِقْرَاضُ بِالرِّبْحِ

"মুনাফা প্রদান করিয়া ঋর্ণ ধার করা অভাবগ্রস্থ লোকের জন্য জায়েজ আছে।"

ছুবহানাল্লাহ্ !চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমানে প্রকাশ পাইতেছে। আর চৌদ্দশত বৎসর পরে কি কি হইবে, উহা জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে দেখানো এবং জানানো হইয়াছে। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপ মনে হয়, যেন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াই বলিয়াছেন। আর হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দৃষ্টি হইতে বিশ্বের কোন কিছু লুকায়িত ছিলনা। আল্লাহপাক নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে কেয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর জ্ঞান এবং প্রত্যেক যুগ-কাল ও স্থানের এলম দান করিয়াছেন।

## নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর নখ ও চুল মুবারক বিশেষ তাবারুক

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى مِنًى فَاَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ اَتٰى مَنْزِلَهٗ بِمِنًى وَنَحَرَ نُسُكَهٗ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهٗ ثُمَّ دَعَا اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىَّ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ اِحْلِقْ فَحَلَقَهٗ فَاَعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اِقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ. (متفق عليه)

**অনুবাদঃ-** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) 'মিনা' নামক জায়গায় তশরীফ আনিলেন, অতঃপর তিনি 'জ-ম্‌রাহ্' নামক স্থানে আসিয়া তথায় কাঁকর নিক্ষেপ করিলেন তারপর তিনি মিনায় অবস্থিত তাঁহার তাবুতে পদার্পণ করিলেন। অতঃপর তিনি নাপিতকে ডাকিলেন এবং তাহাকে নিজের (মাথার) ডান পার্শ্বটি মুড়াইয়া দিতে বলিলেন, সে উহা মুড়াইয়া দিল। তারপর নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হযরত আবু তাল্‌হা আনসারীকে ডাকিলেন এবং তাঁহাকে উক্ত চুলগুলি দান করিয়া দিলেন। তিনি আবার নাপিতকে তাঁহার (মাথার) বাম পার্শ্বটি মুড়াইয়া দিতে বলিলেন, সে উহা মুড়াইয়া দিল। তারপর তিনি উক্ত চুলগুলি হযরত আবু তালহা (রাঃ) কে দান করিয়া বলিলেন- এইগুলি মানুষের মধ্যে বন্টন করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)



**ব্যাখ্যাঃ-** উক্ত ব্যাপারটি বিদায় হজ্বে সংগঠিত হইয়াছিল। নাপিতের নাম ছিল মুয়াম্মর ইবনে আবদুল্লাহ। যখন সে হাতে ক্ষুর লইয়া হুজুরের মাথা মুড়াইতে আরম্ভ করিল, তখন হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন-"হে মুয়াম্মর! এই নেয়ামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।" সে আরজ করিল "আমার জন্য আল্লাহ্‌র বড় নেয়ামত এই যে, আজ আমার হাত হুজুরের মাথার উপর অবস্থান করিতেছে।"

উক্ত দিনে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) একশতটি জানোয়ার কুরবাণী দিয়াছিলেন। তেষট্টি (৬৩) জানোয়ার তিনি নিজ হস্তে জবেহ করিলেন এবং সাইত্রিশটি (৩৭) জানোয়ার হযরত আলীর হাতে জবেহ করাইয়াছিলেন।

উল্লেখিত হাদীস হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রথমে মাথার ডানপার্শ্বে এবং পরে বাম পার্শ্ব মুড়ানো উচিত। হাজামত করিবার পর (ক্ষৌর কর্মের পর) দাঁড়ি এবং গোঁফ বিন্যাস করা এবং পরে নখ কাটা ছুন্নাত।

নবী করীম (সঃ) নিজের পবিত্র নখও জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করিয়াছিলেন। এই চুল এবং নখগুলি তাবারুক হিসাবে সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছিল। সাহাবায়ে কেরাম তো এই তাবারুকগুলি তাঁহাদের কবরে লইয়া গিয়াছেন, যেন তথাকার মুস্কিল আছান এবং বালা মুছিবত দুরিভূত হয়, যেমন- হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং হযরত আমর বিন আ'স প্রমুখ সাহাবাগণ নিজে উক্ত তাবারুকগুলি কবরে লইয়া গিয়াছেন। আর কোন কোন সাহাবা উক্ত তাবারুকগুলি দুনিয়াতে রাখিয়া যান, যেন কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সমাজ উক্ত তাবারুকগুলির জেয়ারত করিতে থাকে। যেমন এখনও বিভিন্ন স্থানে হুজুরের উক্ত পবিত্র চুল জেয়ারত কারীদের মনোবাসনা পূরণ করিতেছে। সাহাবায়ে কেরাম উক্ত চুলগুলি পানিতে ডুবাইয়া ঔষধ হিসাবে পান করিতেন।

উক্ত হাদীস হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, মানুষের চুল মানব-দেহ হইতে পৃথক হইয়াও পবিত্র থাকে। আল্লাহ্‌পাক হযরত নবী করিম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর শরীরের কোন কোন অংশ হেফাজত রাখিয়াছেন।

বুজুর্গানে দ্বীনের তাবারুকগুলি বিশেষতঃ হুজুরের পবিত্র চুল এবং নখ সমূহ হেফাজতে রাখা, উহার জেয়ারত করা, উহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করা, উহার অছিলায় খোদার দরবারে প্রার্থনা করা, উহা নিজের সহিত কবরে লইয়া যাওয়া জায়েজ এবং অতি উত্তম। কেননা, উল্লেখিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে উক্ত জি

নিসগুলি বন্টন করা হইয়াছিল। (মেরআ'ত, মেরক্বাত ও আশিয়া'ত ইত্যাদি)

উল্লেখিত হাদীস হইতে ইহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) স্বয়ং নিজ হাতে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সমুহ তাবারুক হিসাবে অপর ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন এবং তাবারুক হিসাবে উহার ব্যবহার করাইয়াছেন।

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যেই সমস্ত জিনিস নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জ্বাত বা সত্ত্বার সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রহিয়াছে যদিও উহা তাঁহার পবিত্র চুল হউক বা জুব্বা হউক, অথবা পবিত্র সেণ্ডল হউক, অন্য যেই কোন জিনিস হউক, যাহা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) স্পর্শ করিয়াছেন, অথবা যেই কোন প্রকারে তাঁহার সহিত সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ সমস্ত জিনিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং উহা দ্বারা বরকত হাসিল করা পরিপূর্ণ ও কামেল ঈমানের চিহ্ন বিশেষ এবং ইহা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর মুহাব্বতের জ্বলন্ত প্রমাণ। আর জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর স্মৃতি সমূহে প্রাণ উৎসর্গ করা ইসলামের একটি উত্তম আলামত। কোন ঈমানদার ব্যক্তি উহা অস্বীকার করিতে পারেনা। অধিকন্তু, এইরূপ স্মৃতি সমূহের প্রতি তা'জীম ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং উহা দ্বারা বরকত হাসিল করা বস্তুতঃ জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কে তা'জীম ও সম্মান করা। কারণ ইহাই তো আসল ঈমান। অধিকাংশ ছহীহ্ হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র বাণী এবং কাজ কর্ম দ্বারা উহা প্রমাণিত হইতেছে।

বুখারী শরীফে হযরত ওছমান বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-তিনি বলেন; আমার পরিবারের লোকেরা এক পেয়ালা পানি সহ আমাকে হযরত উম্মে সাল্মা (রাঃ) এর নিকট পাঠাইলেন, সকলের এই নিয়ম ছিল যে, যখন কোন লোকের উপর বদ-নজর পড়িত অথবা অন্য কোন রোগ হইত, তবে তাহারা হযরত উম্মে সাল্মা (রাঃ) এর নিকট পানির পেয়ালা পাঠাইয়া দিত। উম্মে সাল্মা (রাঃ) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর চুল মোবারক রূপার একটি পুটলীর মধ্যে রাখিতেন। তারপর তিনি উহা বাহির করিয়া দিতেন। ঐ চুল মোবারক পানির মধ্যে নাড়া-চড়া করিয়া উক্ত পানিটুকু রোগগ্রস্থ মানুষকে পান করাইতেছেন। আমি উক্ত পুটলী ঝাকিয়া দেখিলাম যে, উহাতে লাল বর্ণের কয়েকটি চুল ছিল।



মুসলিম শরীফে হযরত আছমা বিন্‌তে আবু বকর (রাঃ) হইতে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত আছে, উহার শেষাংশ নিম্নরূপ-

هَذِهٖ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى تَشْتَشْفِىْ بِهَا.

"ইহা হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর জুব্বা, যাহা হযরত আয়েশার নিকট ছিল। হযরত আয়েশা যখন ইনতিকাল করিলেন, তখন আমি উহা লইলাম। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এই জুব্বাটি পরিধান করিতেন। এখন আমরা উহা ধুইয়া পানি রোগীগণকে পান করাইতেছি, যাহার বরকতে তাহারা আরোগ্য লাভ করিতেন।"

হযরত উম্মে আতিয়াহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন; নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার লুঙ্গি মোবারক আমাদের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সকল কাপড়ের পূর্বে এই কাপড় খানা হযরত জয়নাব (রাছুলের কন্যা) কে পরিধান করিয়া কাফন দিও। অর্থাৎ এই কাপড়টি তাহার শরীরের সহিত মিলাইয়া রাখিও।"

হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহ্লভী (রাঃ) বলিয়াছেন; বুজুর্গানে দ্বীনের পোষাক এবং পবিত্র স্মৃতি দ্বারা বরকত হাসিল করার জন্য এই হাদীস আসল ভিত্তি।"

হযরত কাব্শা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাদের ঘরে তশরীফ আনিয়াছিলেন, তখন আমাদের ঘরে একটি চামড়ার কলসী লটকানো ছিল, উহার মুখে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁহার মুখ লাগাইয়া পানি পান করিলেন। অতঃপর আমি ঐ কলসীর মুখটি কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছি।"

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল, যে সমস্ত জিনিষকে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) স্পর্শ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত জিনিসের বরকত ছাবেত আছে।

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর স্মৃতি সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যেন হুজুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে স্থানে হুজুর তশরীফ রাখিতেন, যে স্থানে তিনি বসবাস করিতেন, (উহা মক্কা হউক বা মদীনা হউক) যে স্থানে তিনি ইবাদত করিতেন এবং যে সমস্ত জিনিসে হুজুরের হাত

লাগিয়াছে, ঐ সমস্ত জায়গা এবং ঐ সমস্ত জিনিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যেন হুজুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। (কিতাবুশ্ শেফা)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর টুপির মধ্যে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর কয়েকটি চুল মোবারক ছিল। এক যুদ্ধে তাঁহার উক্ত টুপি পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি যেই টুপির জন্য ছুটিয়া গেলেন, যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থার দরুণ এই মুহূর্তে তাঁহার সাথীগণ ইহা পছন্দ করিলেন না। তখন হযরত খালিদ (রাঃ) বলিলেনঃ "আমি উক্ত টুপির জন্য কোন ভয় করি নাই, বরং উক্ত টুপির মধ্যে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর চুল মোবারক ছিল। আমার ভয় ছিল যে, যদি উক্ত চুল মুশরিকগণের হস্তগত হয় এবং আমি উহার বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ি!"

হযরত আবদুর রহমান ছালমী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি আহমদ বিন ফজ্‌লুইয়া জাহেদ (রাঃ) (তিনি একজন তীরন্দাজ যোদ্ধা ছিলেন) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ "যখন হইতে আমি ইহা শুনিলাম যে, আমার এই ধনুটি হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নিজের পবিত্র হাতে স্পর্শ করিয়াছেন, তখন হইতে আমি ওজু ছাড়া উহা স্পর্শ করি নাই।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কে লোকেরা দেখিল যে, যেইখানে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মিম্বরে বসিতেন, উক্ত স্থানে তিনি হাত লাগাইয়া তাঁহার কপালে স্পর্শ করাইতেন। (কিতাবুশ্ শেফা)

ছুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর স্মৃতি সমূহের কিরূপ তা'জীম করিতেন! বাস্তবিক পক্ষে ইহাই আসল ঈমান।

উল্লেখিত সমস্ত হাদীস এবং বর্ণনা দ্বারা ঈমানদারগণের সামনে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, হুজুরের স্মৃতিগুলি হইতে বরকত হাসিল করা এবং ঐ সমস্ত স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহপাকের উত্তম নেয়ামত।

এইরূপ বরকত হাসিল করা এবং উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা স্বয়ং নবী করীম (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র কাজ-কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। হুজুরের স্মৃতি সমূহের তা'জীম অস্বীকারকারী গুনাহ্গার এবং দুর্বল ঈমানের চিহ্ন বিশেষ।

স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেকটি কাজ পবিত্র শরীয়ত মোতাবেক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতঃপর বর্তমান যুগে তো প্রথা চলিতেছে যে, পীর সাহেব নিজের মুরীদগণের মধ্যে তাবারুক বিতরণের মাছয়ালাটির এতই জোর দিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে এতই অতিরঞ্জিত করা হইতেছে যাহা না জায়েজ ছাড়া আর কি হইতে পারে? পবিত্র শরীয়তের হুকুম এবং আদেশ-নিষেধাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা মুসলমানগণের জন্য একান্ত কর্তব্য।



## পারিশ্রমিক নিয়ে কোরআন পাঠ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ اَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ اِنَّ فِى الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْغًا اَوْ سَلِيْمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلٰى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَكَرِهُوْا ذٰلِكَ وَقَالُوْا اَخَذْتَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ اَجْرًا حَتّٰى قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ اَجْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَصَبْتُمْ اَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا اِلٰى مَعَكُمْ سَهْمًا (مشكوة).

অনুবাদঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে; হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর সাহাবাদের একটি জামায়াত এক গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, উক্ত গ্রামে বৃশ্চিক দংশিত বা সর্প-দংশিত একটি মানুষ ছিল। অতঃপর উক্ত জামায়াতের নিকট ঐ গ্রামের একটি লোক আসিয়া বলিল, "তোমাদের মধ্যে কি কেহই মন্ত্র এবং ঝাঁড়-ফুককারী আছ? অবশ্য আমাদের বস্তীর মধ্যে বৃশ্চিক বা সর্প-দংশিত একটি লোক রহিয়াছে।" তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এক বিশিষ্ট সাহাবী কিছু সংখ্যক ছাগল গ্রহণ করিবার শর্তে উক্ত জায়াগায় চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ ঐ সাহাবা বলিলেন, "আমি এই শর্তে মন্ত্রপাঠ করিতে পারি এবং ঝাঁড়-ফুক করিতে পারি, যদি তোমরা আমাকে এতগুলি ছাগল প্রদান কর।" অতঃপর ঐ গ্রাম্য লোকটি ইহাতে রাজী হইল। ঐ সাহাবা উক্ত রোগীর উপর 'সূরা ফাতেহা' পাঠ করিয়া ফুঁক দিলেন। তৎক্ষণাৎ সে আরোগ্য হইয়া গেল। তারপর তিনি ঐ ছাগলগুলি লইয়া তাঁহার সাথী-গণের নিকট আসিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সাথীগণ উক্ত কাজটি পছন্দ করিলেন না। তাঁহারা বলিল, "তুমি আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করিয়া পারিশ্রমিক লইয়াছ" অতঃপর তাঁহারা মদীনা শরীফে আসিলেন এবং হুজুরের দরবারে আরজ করিলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করিয়া পারিশ্রমিক লইয়াছে।" তখন

ছরকারে দো-আলম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন; "নিঃসন্দেহে পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই সর্বাধিক উপযুক্ত।" (বুখারী)

অন্য একটি বর্ণনায় আছে হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিয়াছেন; "তোমরা ঠিকই করিয়াছ, ঐ ছাগলগুলি তোমরা বন্টন করিয়া লও এবং তোমাদের সহিত আমার ভাগটিও রাখিও।" (মিশকাত)

ব্যাখ্যাঃ- আরব দেশের এক কূপের ধারে কোন এক গোত্রের লোক বসবাস করিত এবং তাহারা মুসলমান ছিলনা। বর্তমানেও আরবে পানির কূপের ধারে লোকেরা বসতি স্থাপন করিয়া থাকে, তাহারা পানির ব্যবসা করিয়া জীবন-যাপন করিয়া থাকে। সেইরূপ একটি বসতি এলাকায় সাহাবায়ে কেরামের একটি জামায়াত তশরীফ আনিলেন। উক্ত এলাকার একটি লোককে বৃশ্চিক বা সাপে দংশন করিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের একটি লোক সাহাবায়ে কেরামের নিকট আসিয়া আরজ করিল, "আমাদের বস্তির মধ্যে এক ব্যক্তিকে সাপে দংশন করিয়াছে, আপনাদের মধ্যে কি কেহই ঝাঁড়-ফুঁককারী আছে?" তখন সাহাবায়ে কেরাম হইতে আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) ত্রিশটি ছাগলের শর্ত করিয়া সেইখানে পদার্পণ করিলেন। তিনি 'সূরা-ফাতেহা' পড়িয়া উক্ত রোগীর উপর ফুঁ দিলেন। সে আরোগ্য হইয়া গেল। তারপর হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) ঐ ছাগলগুলি তাঁহার সাথী গণের নিকট লইয়া আসিলেন। যেহেতু ঐ জামায়াতের মধ্যে ত্রিশজন সাহাবা ছিলেন, তাই হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) ত্রিশটি ছাগল লইয়াছিলেন, যেন প্রত্যেকের ভাগে এক একটি করিয়া পড়ে। কিন্তু সাহাবায়েকেরাম উহাকে নাজায়েজ বলিয়া মনে করিলেন। যখন তাঁহারা সফর হইতে মদীনা শরীফে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর দরবারে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! উনি কুরআন শরীফ পড়িয়া পারিশ্রমিক লইয়াছেন।" জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলিলেন, সে ঠিকই করিয়াছে, তোমরা উক্ত ছাগলগুলি পরস্পরের মধ্যে বন্টন করিয়া লও এবং আমার ভাগও নির্ণয় করিয়া রাখ।" নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) নিজের ভাগ নির্ণয় করিয়া রাখিতে হুকুম দিয়াছিলেন, যেন তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং ইহাও জানিয়া রাখেন যে, নিঃসন্দেহে উহা হালাল।

উল্লেখিত হাদীসের ঘটনা দ্বারা প্রামাণিত হইল যে, কুরআন শরীফ ও আল্লাহ্‌র জিকির পাঠ করিয়া ফুঁ দেওয়া এবং উহার জন্য পারিশ্রমিক লওয়া দুরস্ত আছে।

প্রশ্নঃ- মুতাকাদ্দেমীন ফকীহ্‌গণ বলিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ পড়িয়া



পারিশ্রমিক লওয়া দুরস্ত নহে। যেমন- ইমামুল মুছলেমীন হযরত আবু হানীফা (রাঃ) কুরআন শিক্ষা দানের উপর পারিশ্রমিক লওয়াকে হারাম বলিয়াছেন। অথচ উল্লেখিত হাদীসে কুরআন শরীফ পড়িয়া পারিশ্রমিক লওয়া দুরস্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

উত্তরঃ- কুরআন শরীফ দুই প্রকারে পাঠ হইয়া থাকে। (১) ইবাদত হিসাবে (২) ইবাদত ব্যতীত অন্য হিসাবে।

ইবাদত হিসাবে কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া দুরস্ত নহে। ইবাদত ব্যতীত অন্য হিসাবে যেমন- কোন দুঃখী বা রোগীর উপর ফুঁ দেওয়া এবং উহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া যাওয়া তাহার ইবাদত নহে। সুতরাং ইহাতে পারিশ্রমিক লওয়া দুরস্ত আছে। ইহাদ্বারা আরও প্রমাণিত হইল যে, কুরআন শরীফ বিক্রয় করা এবং উহা খরিদ করা আর উহা লিখিয়া পারিশ্রমিক লওয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় কিতাব-পত্র বেচা-কেনা করা জায়েজ আছে। মুতায়াখ্‌খেরীন ওলামায়েকেরাম ইহার উপর কেয়াস করিয়া কুরআন শিক্ষা দানের জন্য পারিশ্রমিক লওয়াকে জায়েজ বলিয়াছেন।

উল্লেখিত হাদীস হইতে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, ঝাঁড়-ফুঁক ইত্যাদির প্রচলন সাহাবায়ে কেরামের জামানায় ছিল এবং জনসাধারণের ইহাও জানা ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম ঝাঁড়-ফুঁক করিতেন আর কুরআন শরীফ এবং দোয়া সমূহে তা'ছির বা গুণাগুণ রহিয়াছে। ঐ সাহাবাগণ প্রথমে শর্তারোপ করিয়া ছিলেন যে, "আমরা ফুঁ দিলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ রোগী আরোগ্য হইয়া যাইবে, কিন্তু আমরা ইহার জন্য ত্রিশটি ছাগল লইব।" ইহাতে উক্ত বস্তির লোকেরা রাজী হইয়া গেল।

পাঠকবৃন্দ ! সাহাবায়ে কেরামের উক্ত কাজটি তো দর-দামের মাধ্যমে হইয়াছিল। যদি তাহারা কোন প্রকার শর্তারোপ ব্যতীত ঐ ছাগলগুলি লাভ করিতেন তবে উহা হাদিয়া (উপঢৌকন) বা নাজরানা বলিয়া পরিগণিত হইত, উহা পারিশ্রমিক হইতনা। যেহেতু আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছে-

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا.

"আমার (কুরআনের) আয়াতগুলি সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিওনা।" ইহাও এক প্রকার বিক্রয়, তাই এই বিনিময় দুরস্ত হয় নাই। সুতরাং আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য সাহাবাগণ উক্ত কাজটি পছন্দ করিলেননা। কিন্তু হযরত রাসুলে খোদা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সাহাবাগণের

ঐ সন্দেহ দুর করিলেন এবং বলিলেন-

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.

"নিঃসন্দেহে পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই সর্বাধিক উপযুক্ত।" নাজায়েজ এবং অবৈধ কাজে পারিশ্রমিক লওয়া নিষিদ্ধ। কুরআন শরীফ পাঠ অথবা উহা দ্বারা চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ নহে। সুতরাং উহার জন্য পারিশ্রমিক লওয়া কেন নিষিদ্ধ হইবে।

উক্ত হাদীস হইতে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ আছে। ফুঁ দিয়া হউক বা তা'বীজ লিখিয়া হউক অথবা সুতা (তাগা) ইত্যাদির উপর ফুঁ দিয়া গিরা লাগাইয়া হউক অথবা রোগীর হাতে বা গলায় বাঁধিয়া হউক, এই চিকিৎসার জন্য পারিশ্রমিক লওয়া জায়েজ আছে। কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ অথবা ফতোয়া লিখিয়া ইহার জন্য পারিশ্রমিক লওয়া জায়েজ আছে। কুরআন শরীফ বেচা-কেনা, উহার মুদ্রণ এবং প্রকাশনা ইত্যাদির ব্যবসা করা দুরুস্ত আছে, এই ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন। কুরআন পাঠ, কুরআন শিক্ষা দানের জন্য পারিশ্রমিক লওয়া দুরস্ত আছে। হাঁ, অবশ্য এই ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম জুহরী ও ইমাম ইসহাক (রাঃ) এর মতভেদ রহিয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণের মতে দুরস্ত আছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কুরআন শিক্ষা দানের জন্যও পারিশ্রমিক লওয়া সকলের ঐক্যমতে জায়েজ আছে। মুতায়াখ্‌খেরীন হানাফী ওলামায়ে কেরামের ফতোয়াও তাহাই ছিল, যাহাতে ধর্ম বিলীন হইয়া না যায়।

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ঐ ছাগলগুলি উক্ত সাহাবাগণের মধ্যে বন্টন করিতে এবং তাঁহার ভাগও রাখিতে এই জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন প্রমাণিত হয় যে, ইহা অত্যন্ত উত্তম ও পছন্দনীয় উপার্জন, যাহা আমিও এবং আমার সাহাবাগণও খাইতেছেন।

লক্ষ্যনীয় যে, নিজের খাদেমগণ হইতে কিছু চাওয়া না জায়েজও নহে, আর না ইহাতে কোন অসম্মানী রহিয়াছে। বরং ইহাতো খাদেমগণের জন্য গৌরবের বিষয়।

মোটকথা এই যে, কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা ঝাঁড়-ফুঁক করা এবং তাবিজ লেখা ইত্যাদি জায়েজ এবং ইহার জন্য পারিশ্রমিক লওয়া দুরস্ত আছে। আর পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-দাম করাও দুরস্ত আছে। যদি পারিশ্রমিক নির্ণয় না করে, বরং এমনি কিছু প্রদান করে, তবে উহা পারিশ্রমিক



বলিয়া পরিগণিত হইবে না, হাদিয়া (উপঢৌকন) হিসাবে গণ্য হইবে।

উভয় পক্ষের সম্মতির মাধ্যমে যে মজুরী স্থির করা হইয়া থাকে, উহাকে পারিশ্রমিক বলা হয়। অতঃপর উল্লেখিত হাদীস হইতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য দর-দাম করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া ছাবেত হইতেছে। দাওয়াতে শেফা ইত্যাদির জন্য যে সমস্ত দোওয়া এবং কুরআন শরীফ ইত্যাদি পাঠ করা হইয়া থাকে, ইহার জন্যও দর-দাম করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া উক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হইতেছে। হাদীয়া (উপঢৌকন) লওয়া সকলের ঐক্যমতে জায়েজ আছে।

ইমামতি, কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ্‌শাস্ত্র শিক্ষাদান, ওয়াজ-নছিহত, কুরআন তেলাওয়াত এবং তারাবীহ নামাজে খতমে কুরআন ইত্যাদি কাজে স্থান ও কালের পাবন্দীর পরিবর্তে পারিশ্রমিক লওয়া হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত (عبادت محضه) ইবাদতের জন্য পারিশ্রমিক লওয়া হয়না। দ্বীনের তাবলীগ ও দ্বীনের তা'লীমের জন্য পারিশ্রমিক লওয়া হারাম, কিন্তু দাওয়াত ওয়ালার পক্ষ হইতে সময় নির্দিষ্ট করিবার পরিপ্রেক্ষিতে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা জায়েজ হইবে। যদি ইহার জন্য পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা না হয়, তবে মসজিদগুলি ইমাম হইতে খালি এবং মাদ্‌রাসাগুলি শিক্ষকশূন্য হইয়া পড়িবে। কারণ, সকলে নিজের পেটের চিন্তায় লাগিয়া থাকিবে, যদ্দারা ধর্ম নিশ্চিহ্ন হইবার আশঙ্কা হইতেছে। ইমামতি, কুরআন-হাদীস ও ফেকাহশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দানের জন্য বোধ হয় সকলেই পারিশ্রমিক লইয়া থাকে এবং কোন আপত্তি ছাড়াই খুশীতে গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং ওয়াজ-নছিহতের ব্যাপারটিও ইহার অন্তর্ভূক্ত।

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইবাদতের জন্য পারিশ্রমিক লওয়া হয়না, বরং স্থান ও কালের পাবন্দীর জন্য পারিশ্রমিক লইতে পারে। আর ইহা জায়েজ আছে এবং নিয়তও সেইরূপ হওয়া উচিত।কোন কোন লোক হাদীয়া এবং পারিশ্রমিকের একই অর্থ বুঝিয়া লইয়াছে, অথচ উভয় শব্দের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন জায়গায় কুরআন শরীফ পড়িয়াছে, অথবা ওয়াজ-নছিহত করিয়াছে, তবে যদি কিছু বলা ব্যতীত তাহাকে এমনি খুশীতে কোন কিছু প্রদান করে, তাহা হইলে উহাকে হাদীয়া ও নাজরানা বলা হইয়া থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট করিয়া বলে, "এত টাকা আমাকে দিতে হইবে, নতুবা আমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী সময় এবং জায়গার পাবন্দী করিবনা, ইহাতে যদি সে রাজী হইয়া যায়, তবে উহাকে পারিশ্রমিক বলা হইয়া থাকে।

খতমে কুরআন, খতমে বুখারী এবং খতমে ইউনুছ ইত্যাদি যদি কোন রোগীর আরোগ্য লাভের জন্য অথবা কোন দুনিয়াবী মক্‌ছুদের জন্য পড়ানো হয়, তবে ইহার জন্য পারিশ্রমিক লওয়া উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। আল্লাহ্‌পাক কুরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফের মধ্যে এইরূপ বরকত এবং প্রতিক্রিয়া শক্তি রাখিয়াছেন যে, উহাদের মধ্যে রূহানী এবং শারীরিক উভয়ের চিকিৎসা রহিয়াছে।

আমি এইখানে উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে প্রত্যেক বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার বিস্তরিত বর্ণনা এইখানে সংকুলান হইবে না।

## আল্লাহর বান্দাকে রাসুলের বান্দা বলা দুরস্ত আছে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ كُلُّكُمْ عِبَادُ اللّٰهِ كُلُّ نِسَاءِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِىْ وَجَارِيَتِىْ وَفَتَائِىْ وَفَتَاتِىْ –رواه مسلم

অনুবাদঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- "তোমাদের মধ্যে কেহই কখনও তাহার দাস-দাসীকে এইরূপ বলিবে না, "আমার বান্দা ও আমার বাঁদী," বরং এইরূপই বলিবে "আমার দাস, আমার দাসী আমার যুবক ছেলে, আমার যুবতী মেয়ে।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ- এই হাদীসে নিজের দাস-দাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং নিজের গৌরব ও দাস-দাসীদের প্রতি ঘৃণা ও তিরস্কার পরিত্যাগ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নতুবা কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য বহু হাদীসে 'আবদুন্' অর্থাৎ বান্দা এবং 'আমাতুন্' অর্থাৎ বাঁদী শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। যেমন- আল্লাহ্‌পাক বলিতেছেন,

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ

"তোমাদের মধ্যে যে বিধবা স্ত্রীলোক রহিয়াছে এবং তোমাদের বান্দা ও বাঁদীর মধ্যে যাহারা বিবাহের উপযুক্ত, তাহাদিগকে বিবাহ কর।" আল্লাহ্‌পাক আরও বলিয়োছেন;

وَعَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّايَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ



"এমন একটি বান্দা, যে কোন কাজে শক্তি রাখেনা অর্থাৎ যে সম্পূর্ণ অন্য জনের অধিকার বা ইখতিয়ারাধীন।"

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী প্রখ্যাত মুহাদ্দেছ আল্লামা নববী (রঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখিয়েছেনঃ "উল্লেখিত হাদীস মাক্‌রূহে তান্‌জীহা এবং অপছন্দনীয় অর্থে প্রযোজ্য। মাক্‌রূহে তাহ্‌রীমা অর্থে নহে।"

অর্থাৎ عَبْدِىْ (আব্‌দী) বা আমার বান্দা বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করা অপছন্দনীয়। বরং غُلَامِىْ (গোলামী) বা আমার গোলাম বলিয়া সম্বোধন করাই অধিকতর পছন্দনীয়।

জানিয়া রাখা আশ্যক যে, নিজের চাকর-চাকরানীকে ঘৃণা ও তিরস্কার সম্বলিত শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা নিষিদ্ধ এবং নিজের অধিনস্থ মানুষকে অসম্মানী ও অবমাননাকর শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মত অথবা নিজের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন বলিয়া মনে করা উচিত। কারণ, সকলই আল্লাহ্‌তা'লার বান্দা। আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া হিসাবে সকলই এক সমান। হাঁ, অবশ্য মর্যাদা হিসাবে পার্থক্য রহিয়াছে।

কোন কোন লোক উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারা আবদুন্নবী, আবদুর রাছুল এবং আবদুল মুস্তফা অর্থাৎ রাছুলের বান্দা, নবীর বান্দা এবং মুস্তফার বান্দা ইত্যাদি না জায়েজ বলিয়া হুকুম দিয়া থাকে। অথচ উক্ত হাদীসে মুনিবদেরকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা তোমাদের গোলামকে নিজের বান্দা বলিওনা। যেন গোলাম ও বাঁদীর প্রতি তিরস্কার ও ঘৃণা করা না হয়। আর যদি গোলাম ও বাঁদী নিজে বলে, "আমি অমুক ব্যক্তির গোলাম অথবা বাঁদী," তবে এই হুকুম উক্ত হাদীসে অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

অধিকন্তু, উক্ত হাদীসে কোন মাখ্‌লুকের প্রকৃত বান্দা বলিতে অপ্রকৃত বান্দাকে বুঝায়। যেমন-কুরআন শরীফে উহার উল্লেখ রহিয়াছে। নতুবা কুরআনের বহু আয়াত ও রাসুলের হাদীসের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইবে।

'আব্‌দ' বা 'বান্দা' শব্দের সম্বন্ধ যদি সৃষ্টিকর্তার দিকে করা হয়, তবে উহার অর্থ পৃথক। আর যদি সৃষ্টি জীবের দিকে করা হয়, তবে উহার অর্থও পৃথক হইয়া থাকে। উভয় অর্থের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে পার্থক্য রহিয়াছে। মাখ্‌লুকের দিকে 'আব্‌দ' বা 'বান্দার' সম্বন্ধ করা হইলে 'শির্‌ক' এর ধারণা করা বুঝাইবে না। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট জীবের দিকে একই শব্দের সম্বন্ধ কুরআন-হাদীস দ্বারা ছাবেত আছে। দেখুন, 'ছালাত' শব্দটি যখন খোদার দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তবে উহার অর্থ রাহমত, যদি ইন্‌সানের দিকে করা হয়, তবে

'ছালাত' অর্থ দোয়া। আর ফেরেস্তার দিকে করা হইলে উহার অর্থ ইস্তেগফার বা গুনাহ্ মাফ চাওয়া হইবে এবং যখন উহার সম্বন্ধ পশু-পাখী ও চতুষ্পদ জন্তু প্রভৃতির দিকে হইবে, তখন 'ছালাত' অর্থ 'তাস্‌বীহ পাঠ' করাই হইবে। উহা দ্বারা প্রমানিত হইল যে, যাহার দিকে সম্বন্ধ করা হয়, উহার হিসাবে একই শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যদি কেহই এ কথা বলে, "যে শব্দটি আল্লাহ্‌পাকের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, উহার সম্বন্ধ মাখ্‌লুকের দিকে করা হইলে 'শির্‌ক' এর ধারণা মুক্ত হইবেনা।" তবে এইরূপ বলা কখনও সঠিক হইবেনা। কারণ, হাদীস শরীফে আছে-

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشَرَ مَرَّاتٍ

হুজুর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছে; "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ্‌পাক সেই ব্যক্তির উপর দশবার রহমত বর্ষণ করিবে।"

লক্ষ্য করুন, এই হাদীসে (صَلَّى) 'ছাল্লা' শব্দটি মাখলুকের দিকেও সম্বন্ধ করা হইয়াছে; আর আল্লাহ্‌পাকের দিকেও করা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট জীবের জন্য 'ছাল্লা' একই শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং যাহার দিকে সম্বন্ধ করা হইবে, উহার হিসাবে ঐ 'ছাল্লা' শব্দের অর্থও পার্থক্য হইবে। হাঁ, অবশ্য কতগুলি বিশিষ্ট শব্দ রহিয়াছে, যাহা শুধু খালেক বা সৃষ্টিকর্তার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মাখ্‌লুক বা সৃষ্ট জীবের জন্য ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করা শির্‌ক ও হারাম। আর এইরূপ কতগুলি শব্দ রহিয়াছে, যাহা শুধু মাখ্‌লুকের জন্য ব্যবহৃত করা জায়েজ এবং খালেকের জন্য না জায়েজ। বহু অর্থবোধক শব্দ খালেক এবং মাখ্‌লুক উভয়ের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ আছে। শুধু তুলনামূলক ভাবে অর্থের তারতম্য রহিয়াছে। উহা যাহার দিকে সম্বন্ধ করা হইবে, উহার হিসাবে অর্থ নির্দিষ্ট হইবে। সুতরাং ইহাতে কখনও শির্‌ক বা 'শির্‌ক' এর ধারণা হইবেনা।

'আব্‌দ' বা 'বান্দা' ও একটি বহু অর্থবোধক শব্দ। অতঃপর উহা যাহার দিকে সম্বন্ধ করা হইবে, উহার হিসেবে অর্থ নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। যেহেতু বহু অর্থবোধক শব্দগুলি খালেক এবং মাখ্‌লুকের দিকে সম্বন্ধ করা জায়েজ আছে, সুতরাং মাখ্‌লুকের দিকে 'আব্‌দ' বা 'বান্দা' শব্দের সম্বন্ধ করা দুরস্ত আছে। আল্লাহ্‌র বান্দার বান্দা হওয়া এবং রাসুলের বান্দা, নবীর বান্দা বলা দুরস্ত আছে। ইহাতে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারেনা।



মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট কেহই জিজ্ঞাসা করিল, "যে যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার বান্দা হইবেনা, সে খোদা পাইবেনা।" এই বাক্যটি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে বলিলেন-"উহার অর্থ দুরস্ত আছে। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া,১৯৮ পৃষ্ঠা)

যখন সাধারণভাবে বান্দার বান্দা হওয়া দুরস্ত আছে, তবে সর্ব বিশিষ্ট আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুব, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বান্দা বলা না জায়েজ ও শির্‌ক কিভাবে হইতে পারে?

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তাঁহার রচিত 'ইমদাদুল মোস্তফা' নামক কিতাবের তিরানব্বই (৯৩) পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; "আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে রাছুলের বান্দা বলা যাইতে পারে।"

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজের মক্কী (যিনি দেওবন্দী) গবেষণাগারের ছোট বড় সকলের পীর অথবা দাদা পীর মানিয়া থাকে। বিশেষতঃ যিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ দেওবন্দী আলেমগণের পীর ছিলেন। হাজী ছাহেবের কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্ম সমস্ত দেওবন্দীগণ দলিল হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। হাজী সাহেবের 'মালফুজাত' এবং তাঁহার জীবনের কার্য-প্রণালী জনাব মরতুজা খান ছাহেব পুস্তকাকারে লিখিয়াছেন এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব উহা পড়িয়া সংশোধন করেন। অতঃপর থানভী ছাহেবের সংশোধনের পরে উহা 'শামায়েমে ইমদাদীয়া' নামে প্রকাশিত হয়। 'শামায়েমে ইমদাদীয়া' নামক কিতাবের ২য় খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠায় আল্লাহর বান্দাকে রাছুলের বান্দা বলা এবং নজর-নেয়াজ, ফাতেহা-ওরশ এবং কেয়ামে-মিলাদ ইত্যাদি কাজকে জায়েজ, মুস্তাহাব ও মুস্তাহ্‌সান বলিয়াছে। বিস্তারিত ভাবে জানিতে চাহিলে আপনারা 'শামায়েমে ইমদাদীয়া' কিতাবটি পাঠ করুন।

আল্লাহপাক কুরআনে মজিদে বলিয়াছে-

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

"হে প্রিয় নবী! আপনি বলিয়া দিন, হে আমার বান্দাগণ! যাহারা অন্যায় আচরণে নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছ, আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা হইতে নিরাশ হইওনা।"

এই আয়াতে يٰعِبَادِيْ (ইয়াইবাদি) শব্দের মধ্যে যে "ى" আছে, সেই প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদটি নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর পরিবর্তে

বসিয়াছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব বলিয়াছেন, "উক্ত আয়াতে আলামাতও এই অর্থের দিকে নির্দেশ দিতেছে। যদি উক্ত সর্বনাম পদটি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বসিত, তবে مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ (মিন্ রাহমাতিল্লাহে) এর স্থলে مِنْ رَحْمَتِىْ (মিন্ রাহমাতী) বলিতেন। যেন عبادى (ইবাদী) শব্দের সহিত সামঞ্জস্য হয়।

হযরত আলী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন-

أَنَا عَبْدُ مَنْ عَلَّمَنِىْ حَرْفًا اِنْ شَاءَ بَاعَ وَاِنْ شَاءَ اِعْتَقَ

"আমি ঐ ব্যক্তির বান্দা, যিনি আমাকে একটি হরফ বা বর্ণ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বিক্রয় করিয়া দিবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, আজাদ বা মুক্ত করিয়া দিবেন।" (জামেউর রমুজ)

সাত ক্বারীগণের মধ্যে অন্যতম ক্বারী হযরত ইমাম নাফেয়' বলিয়াছেন-

أَنَا عَبْدُ مَنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ

"আমি ঐ ব্যক্তির বান্দা, যাহার নিকট আমি ক্বেরাত শিক্ষা করিয়াছি। (জামেউর রমুজ, ১ম খন্ড ৭ম পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ধর্মীয় ওস্তাদেরও বান্দা হওয়া এবং ধর্মীয় ওস্তাদের বান্দা বলিয়া পরিচয় দেওয়া সাহাবায়ে কেরাম এবং বড় বড় ইমামগণ হইতে ছাবেত রহিয়াছে। অতঃপর সমগ্র বিশ্বজগতের ওস্তাদ হযরত মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বান্দা হওয়া এবং তাঁহার বান্দা বলিয়া পরিচয় দেওয়া কিভাবে না জায়েজ হইতে পারে?

এমনি তো দানশীল লোকের বান্দা বলা আমাদের পরিভাষায় প্রচলিত আছে। যেমন- اَلْاِنْسَانُ عَبِيْدُ الْاِحْسَانِ "মানুষ দানশীলতার বান্দা।" অতঃপর সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল ছরকারে দো-আলম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বান্দা বলা কি রকম না জায়েজ কথা?

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ফরমাইয়াছেন- – كُنْتُ عَبْدَهٗ وَخَادِمَهٗ "আমি মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বান্দা ও খাদেম ছিলাম।" (ইজালাতুল খেফা)



হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সম্পর্কে হযরত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) ফরমাইয়াছেন-

اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ (ترمذى)

"আল্লাহপাক ওমরের মুখ এবং অন্তরে হক বা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" (তিরমিযী)

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে-

اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهٖ (ابو داؤد)

"আল্লাহ্‌তা'লা ওমরের মুখে সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সে সত্য কথাই বলে।" (আবু দাউদ)

আর এক বর্ণনায় আছে-

اِنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ (بيهقى)

"ওমরের মুখে শান্তি উচ্চারিত হয়।" (বায়হাকী) অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন, যদ্বারা অন্তর শান্তি ও আরাম পাইয়া থাকে। ইহা একটি গায়েবী জিনিস ছিল, যাহা হযরত ওমর (রাঃ) এর মুখে স্থাপন করা হইয়াছিল। অথবা তাঁহাকে ফেরেশ্‌তাগণ বলিয়া দিত। এইরূপ সত্যবাদী, অতি সম্মানিত সাহাবী হযরত ওমর (রাঃ) এর পবিত্র মুখ হইতে বিপুল সমাবেশে كُنْتُ عَبْدَهٗ وَخَادِمَهٗ "আমি মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বান্দা ও খাদেম ছিলাম।" বলিয়া প্রকাশ পাওয়া কতদুর না জায়েজ ও শির্ক বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে? এই হাদীসটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য আমার রচিত "আল-বায়ানুল মুসাফ্‌ফা ফি মাছয়ালাতে আবদিল মুস্তফা" পুস্তিকাটি পাঠ করুন।

অধিকাংশ দেওবন্দী আলেমগণ নিজেকে তাহাদের পীর মশায়েখের বান্দা বলিয়াছেন। যেমন- মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান সাহেব মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের মৃত্যু শোকের কবিতায় বলিয়াছেন।

অতঃপর যখন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর ফতোয়া "যে ব্যক্তি বান্দার

বান্দা হইবে না, সে খোদা পাইবে না।" এইরূপ বলা দুরস্ত আছে এবং উহার অর্থও সম্পূর্ণ দুরস্ত আছে। তবে যে ব্যক্তি জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বান্দা না হইলে, সে কিভাবে খোদা পাইবে? খোদা পাওয়া তো দুরের কথা, খোদা পাওয়ার গন্ধও তাহার ভাগ্যে জুটিবেনা। হ্যাঁ, খোদার বান্দা বলিতে খোদার সৃষ্ট এবং জনাবে মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বান্দা বলিতে তাহার গোলাম বুঝায়।

জামেউল মা'ক্বুল ওয়াল মান্‌কুল ইমামুল ফোক্‌হা ওয়াল মুহাদ্দেছীন হযরত আবদুল্লাহ আল্ খারাছানী (রাঃ) বলিয়াছেন- 'আব্‌দ' বা 'বান্দা' গোলাম এবং দাস শব্দগুলি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য মাখ্‌লুকের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তবে শরীয়ত অথবা আমাদের পরিভাষা মতেও উহা দ্বারা সৃষ্টি জীব বুঝাইবে না, বরং এই বিশেষ্যগুলি খাদেমগণের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অধিকন্তু, কুরআন মজিদেও 'আব্‌দ' বা 'বান্দা' গোলাম এবং দাস শব্দগুলি মাখ্‌লুকের দিকে সম্বন্ধ করা হইয়াছে। যেমন- আল্লাহপাক বলিয়াছেন- مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ "তোমাদের বান্দা এবং তোমাদের বাঁদী। فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ "তোমরা যে সমস্ত দাসগণের মালিক।" আর বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য বলা হইয়াছে- وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ "তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে গোলামগণ প্রদক্ষিণ করিবে।"

হাদীসে আছে- নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলিয়াছেন- هَذَا غُلَامُكَ "ইহা তোমার গোলাম।"

হযরত ইমাম শাইখ মুহাম্মদ আবেদ আল্-মদনী আল্-আনছারী (রাঃ) যিনি 'আস্-সনদী' উপাধি দ্বারা খ্যাত, তিনি আবদুন্নবী এবং আবদুর রাছুল নাম রাখা জায়েজ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি বর্ণনা করেন- "যে ব্যক্তি নিজের অথবা অপরের ছেলের নাম আবদুন্নবী, আবদুর রাছুল, আবদুল মুস্তফা অথবা গোলাম নবী, গোলাম মুহাম্মদ এবং গোলাম আহমদ নাম রাখিবে, আর ঐ নাম দ্বারা বরকত হাসেল করিবার ইচ্ছা রাখে, তবে ইহা অত্যন্ত ভাল এবং যাহার নাম রাখিয়াছে, তাহাকে ছওয়াব দেওয়া যাইবে।"

আবদুল মুস্তফা বা মুস্তফার বান্দা বলাকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের



নিকট আরজ এই- মুস্তফার বান্দা বা রাছুলের বান্দা বলার মধ্যে শির্‌ক এর ধারণা যুক্ত থাকার কারণে যদি ইহা না জায়েজ হয়, তবে আপনারা বলুন যে, ইসলাম ধর্মের আলেমগণকে 'মাওলানা' مَوْلَنَا (আমাদের মাওলা) শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হইয়া থাকে। এমনকি রাসুলের বান্দা বলাকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের আলেমগণকেও যদি 'মাওলানা' শব্দ দ্বারা তা'জীম করা না হয়, তবে তাঁহারা বড়ই রাগান্বিত হইয়া যায়।

হযরত আবদুর রহমান জামী এবং হযরত জালালুদ্দিন রুমী প্রমুখ মনীষীগণকেও সমগ্র পৃথিবীর লোকেরা 'মাওলানা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে 'মাওলা' শব্দটি আল্লাহপাকের নামসমূহ হইতে একটি বিশিষ্ট নাম। যেমন– কুরআনের আয়াতে রহিয়াছে–

اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

"হে খোদা! তুমি আমাদের মাওলা ..........।"

অতঃপর যখন 'মাওলানা' শব্দটি খোদা ব্যতীত অন্যান্য মাখ্‌লুকের জন্য বলা যায়,তখন ইহা দ্বারা তাহার বান্দা হওয়া প্রমাণিত হইতেছে এবং নিজেকে তাহার সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। কেননা, যখন আল্লাহপাকের নামের মধ্যে 'মাওলা' একটি বিশিষ্ট নাম, তখন যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে 'মাওলানা' বলিয়া সম্বোধন করা যায়, তখন সম্বোধনকারী উক্ত মাওলানার বান্দা ও সৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কারণ, 'মাওলা' তো আল্লাহর একটি নাম। সুতরাং 'মাওলানা' বলিয়া সম্বোধনকারী লোকটি আল্লাহপাকের বান্দা ও মাখ্‌লুক। অতঃপর প্রমাণিত হইল, কোন ব্যক্তি 'মাওলানা বলিয়া কোন আলেমকে সম্বোধন করা শিরক ও কুফরী হইবে না? অথচ আজ পর্যন্ত কেহই এই ফতোয়া দেয় নাই যে, কাহাকেও 'মাওলানা' বলিয়া সম্বোধন করা শিরক ও কুফরী। বরং সেইরূপ ফতোয়া প্রদানের স্থলে যদি কেহই 'মাওলানা' বলিয়া সম্বোধন না করে, তবে মাওলানা সাহেব অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া পড়ে।

এখন রাসূলের বান্দা বলাকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের নিকট আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, আপনারা 'মাওলানা' বলিয়া সম্বোধন করাকে শিরক ও কুফরীর ফতোয়া প্রদান করুন। যদি সেইরূপ ফতোয়া দিতে না পারেন,

তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করুন– যেই কানুনের ভিত্তিতে 'মাওলানা' বলা জায়েয আছে, তদ্রুপ ঐ নিয়মকানুনের ভিত্তিতে রাসূলের বান্দা বলাও জায়েয আছে। যদি আপনারা কাহাকেও 'মাওলানা' বলিয়া সম্বোধন করাকে শিরক ও কুফরীর ফতোয়া দেন, তবে আমরাও রাছুলের বান্দা বলাকে শিরক ও কুফরী বলিব। নতুবা, অহেতুক বকাবকী করা কোন লাভ হইবে না। যেহেতু, 'মাওলা' শব্দ তো আল্লাহপাকের একটি নাম, সুতরাং উক্ত শব্দ দ্বারা কাহাকেও সম্বোধন করা মানে তাহার বান্দা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া। যদি নিজেকে 'মাওলানা' বলিয়া ডাকিবার জন্য জনসাধারণের নিকট 'মাওলা' শব্দের বিভিন্ন তা'বিল বা যুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করা হয়, তবে বলুন– জনাবে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বান্দা বলার মধ্যে কেন সেই দরজাটি বন্ধ থাকিবে?

'ছুনানুল হুদা ফি মুতাবেয়াতিল মুস্তফা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকের নাম ছিল আবদুন্নবী (অর্থাৎ নবীর বান্দা)। যিনি আহমদ বিন আবদুল কুদ্দুছ গাঙ্গুহী হানাফী (রাঃ) এর ছেলে ছিলেন এবং বড় মুহাদ্দেছ ও আল্লামা ছিলেন। স্বয়ং দেওবন্দের আলেমগণ যাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। যদি আবদুন্নবী (নবীর বান্দা), আবদুর রাছূল (রাছূলের বান্দা) ও আবদুল মুস্তফা (মুস্তফার বান্দা) বলা শিরক বা নাজায়েয হইত, তবে এইরূপ হানাফী মযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দেছ নিজের নাম আবদুন্নবী (নবীর বান্দা) কখনও রাখিতেন না। অথচ তিনি নিজেই তাঁহার বংশের অনেক মাছয়ালার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়াছেন এবং বিভিন্ন অত্যাচার ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার প্রতিরোধে 'ছেমা' হারাম বলিয়া একটি পুস্তিকাও লিখিয়াছেন। তাঁহার আরও অনেক কিতাব আছে। এতবড় মুহাক্কেক আল্লামা নিজের নামটি শিরক সম্বলিত ছাড়িয়া দেন, আর অপরের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন, ইহা কিভাবে হইতে পারে? সম্রাট আকবর তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং হাদীস শুনিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে হাজির হইতেন। অধিকন্তু, আবদুন্নবী নামধারী এই আল্লামা এক হাজার হিজরীর পূর্ব যুগে ছিলেন। যখন ঈমান এবং জ্ঞানের অত্যন্ত চর্চা ছিল। বর্তমান যুগের মত এইরূপ মহা ফেৎনা-ফাসাদ কম ছিল। সেই সময়েই এই আল্লামা নিজের নাম আবদুন্নবী (নবীর বান্দা) বহাল রাখেন। আর সেই সময় উহা জায়েয ছিল এবং বর্তমান বার শতাব্দীর পরে যাহা ফেৎনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ যুগ, ইহাতে আবার হারামের ফতোয়া আসিয়া গেল!



এই আবদুন্নবী আল্লামা ৯৯১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা এখন ভাবিয়া দেখুন, কত যুগ পূর্বে এই নাম রাখা বরকতের কারণ বলিয়া বুঝা হইত।

মাওলানা আবদুল হাই লক্নৌভী সাহেব তাঁহার রচিত 'মজমুয়া ফতোয়া' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন– 'ফরায়েজ শরীফিয়া' নামক কিতাবের হাশিয়া লেখক ছিলেন আল্লামা আবদুন্নবী আহমদ নগরী ছাহেব। তাঁহার উক্তি দ্বারা মাওলানা লক্নৌভী ছাহেব উত্তরাধিকার সূত্রের একটি আশ্চর্য মাছয়ালার জবাব দেন।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মাওলানা লক্নৌভী ছাহেবের অনেক আগে অভিজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে কাহারও নাম ছিল আবদুন্নবী, কাহারও ছিল আবদুর রাছুল ইত্যাদি।

যদি আবদুন্নবী, আবদুর রাছুল ইত্যাদি নাম রাখা শিরক বা শিরকে সন্দেহ যুক্ত হইত, তবে এইরূপ মহাপুরুষগণ কখনও এই রকম নাম পছন্দ করিতেন না।

উর্দু ভাষার মধ্যেও গোলামকে বান্দা বলা হইয়া থাকে। যেমন-উর্দু ভাষার প্রখ্যাত কবি আল্লামা ইকবাল (রঃ) তাঁহার 'শেকওয়া' নামক কবিতায় বলিয়াছেন-

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود وایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ وصاحب ومحتاج وغنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

"এক ছফেতে ভুক্ত হতো গযনবী মাহমুদ আয়াজ,
পরখ নাহি থাক্ত তখন বান্দা কিবা বান্দা নওয়াজ।
গোলাম, মুনিব, ধনী, গরীব প্রভেদ নাহি থাক্ত পাছে,
সবাই তাদের এক হইত, আস্ত যখন তোমার পাছে।"

কোন কবি সুন্দর বলিয়াছেন–

اگرچہ خوار ہیں بدکار ہیں سیاہ کار وعاصی ہیں
مگر کچھ غم نہیں ہمکو کہ ہیں بندے محمد کا
خدا کے سامنے پیش ہوئی جسدم تو کہ دونگا
براہوں یابھلا لیکن ہوں میں بندہ محمد کا

"যদিও আমরা পাপী ও গুনাহ্গার হইনা কেন, তবুও আমাদের কোন ভয় নাই। কারণ আমরা হইলাম জনাবে মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বান্দা।"

খোদার সামনে যখন আমি উপস্থিত হইব, তখন বলিয়া দিব যে, ভাল হই বা মন্দ হই, কিন্তু আমি মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বান্দা।"

আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রেজা (রাঃ) বলেন-

خوف نہ رکھ تو ائے رضا تو توہے عبد مصطفے
تیرے لئے آمان ہے تیرے لئے آمان ہے

"হে রেজা ! তুমি কোন ভয় করিওনা, তুমি তো আব্দে মোস্তফা, রাছুলের বান্দা। তোমার জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে, তোমার জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে।"

কোন আশেক কবি বলিয়াছেন-

مریدی لاتخف کھکر تسلی دی غلاموں کو
قیامت تک رہے بیخوف بندہ غوث اعظم کا
اگر وہ ناز سے پوچھیں توکس کا بندہ ہے حافظ
کھو بے ساختہ شاھا جناب غوث اعظم کا

"হে আমার মুরিদগণ! তোমরা ভয় করিওনা" বলিয়া হযরত গাউছে পাক (রাঃ) তাঁহার গোলামদিগকে শান্তনা দান করিলেন। তাই কেয়ামত পর্যন্ত জনাবে গাউছে আজম (রাঃ) এর বান্দা ভয়হীন থাকিবে।"

যদি সে গৌরব করিয়া জিজ্ঞাসা করে "হে হাফেজ ! তুমি কাহার বান্দা ? তবে তুমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া দাও যে, তুমি জনাবে গাউছে আজম (রাঃ) এর বান্দা।"



## ইয়াজিদ মু'মিন কি না?

হযরত মুয়াবীয়ার (রাঃ) পুত্র ইয়াজিদ সম্পর্কে মুহাক্কেক ও প্রখ্যাত আলেমগণের বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইলঃ-

আল্লামা ইব্নে কছিরের মত মুহাক্কেক আলেম 'আল্-বেদায়া ওয়ান্-নেহায়া' নামক কিতাবে ইয়াজিদ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার পর শেষ ও স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন যে-

بل قد كان فاسقا (البداية والنهاية جلد٨)

"নিঃসন্দেহে ইয়াজিদ ফাসেক ও পাপাত্মা ছিল।"

আল্লামা ইবনে খাল্দুন তাঁহার বিখ্যাত 'মুকাদ্দিমা' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন-

اما الحسين فانه ظهر فسق يزيد عند الكافة من اهل عصره بعثت شيعة اهل البيت بالكوفة للحسين ان ياتيهم.

অর্থাৎঃ "যখন ইয়াজিদের ফাসেকী ও লাম্পট্য তৎকালীন সমস্ত অধিবাসীদের নিকট প্রকাশ পাইল, তখন কূফাবাসী নবী পরিবারের অনুসারীগণ হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে সেইখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল।"

আল্লামা ইবনে কছির (রঃ) ইয়াজিদ সম্পর্কে বলেন-

وقد روى ان يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغنا والصيد واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود من يوم الا يصبح فيه مخمورا وكان يشد القرد على فرس مرجة بحبال الخ.

অর্থাৎ বর্ণিত আছে যে, গান-বাদ্য, ভ্রমণ ও শিকার ইত্যাদি কাজে ইয়াজিদ তাহার যুগে প্রসিদ্ধ ছিল। সে সুন্দর সুন্দর কিশোর-কিশোরী, গায়িকা ও নর্তকী এবং কুকুর ইত্যাদি তাহার চারপাশে মওজুদ রাখিত। সে যুবক ছেলে, ছাগল-মেষ ও বাঁদর ইত্যাদির মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগাইয়া দিত। প্রতিদিন সকালে মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া যাইত এবং ঘোড়ার উপর

বাঁদরগুলি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া এইদিক সেইদিক ঘুরাইত। নব যৌবন প্রাপ্ত ছেলে ও বাঁদরগুলিকে সোনার টুপি পরাইত। ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা দিত। আর যখন কোন বাঁদর মরিয়া যাইত, তখন উহার শোক প্রকাশ করিত।" (ফতোয়ায়ে ফরিদিয়া)

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (রঃ) তাঁহার 'ছাওয়ায়েকে মুহ্‌রেকা' নামক কিতাবে বলেনঃ মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ (তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর নাতি ও ইয়াজিদের পুত্র ছিলেন । তিনি বড় ধার্মিক ও সৎস্বভাবের লোক ছিলেন) সাধারণ সভায় প্রকাশ্যভাবে তাহার পিতা ইয়াজিদের ভক্তবৃন্দের সামনে ঘোষণা করিয়াছিলেন-

وقد كان غير اهل له ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقت عمره وانتشر عقبه وصار فى قبره رهينا بذنوبه ثم بكى وقال ان من اعظم الامور علينا بسوء مصرعه ومنقلبه وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم واباح الخمر وخرب الكعبة.

"যদিও আমার পিতা ইয়াজিদকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু ইহাতে তিনি একেবারেই উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি আল্লাহর রাসুলের নাতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন শেষ হইয়া গেল এবং তাঁহার অনুসারীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি কবরে নিজের গুনাহের কারণে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।" ইহার পর মুয়াবিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, আর বলিলেনঃ "তাঁহার খারাপ মৃত্যু এবং তাঁহার খারাপ ঠিকানাই আমাদের জন্য বড় কলঙ্কের বিষয়। তিনি রাসূলের বংশধরগণকে হত্যা করেন, মদ্য পান হালাল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কা'বা শরীফকে নষ্ট করেন।"

হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ছোলাইমান ফল্‌ওয়ারী সাহেব 'শাহাদতে হুসাইন' নামক কিতাবের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ

"ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল্লামা ইবনে জাওজী, আল্লামা জালালুদ্দীন ছায়ুতি, আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাজানী ও তাফ্‌সীরে রুহুল মা'আনীর লেখক সৈয়দ মাহমূদ আলুসী প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দেস ও বুজুর্গানে দ্বীন ইয়াজি



দকে কাফের বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাঁহারা ইয়াজিদকে একেবারেই মুসলমান নহে বলিয়া মনে করেন।"

'তাফসীরে মাজহারী' নামক কিতাবে সূরায়ে মুহাম্মদ এর ব্যাখ্যায় আছে-

قال ابن جوزى انه روى القاضى ابويعلى فى كتاب المعتمد الاصول عن سنده عن صالح بن احمد بن حنبل انه قال قلت لابى يابت يزعمه بعض الناس انا نحب يزيد بن معاوية فقال احمد يا بنى هل يسوغ لمن يؤمن بالله أن يحب يزيد ولم يلعن رجل لعنه الله فى كتاب قلت يابت اين لعن الله يزيد فى كتابه قال حيث قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذى لعنهم الله.

অর্থাৎ, আল্লামা ইবনে জওজী বলিয়াছেন যে, কাজী আবু ইউলা 'আল্ মুতামাদুল উসূল' নামক কিতাবে সনদ সহকারে বর্ণনা করেন, ছালেহ্ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'আব্বা! কোন কোন লোক ধারণা করে যে, আমরা ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়াকে ভালবাসিয়া থাকি।' তদুত্তরে আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) বলিলেন, বাপু! যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, তাহার নিকট কি এই খবর পৌঁছিতে পারে যে, সে ইয়াজিদকে ভালবাসে। আর ঐ ব্যক্তি কেন অভিশপ্ত হইবে না, যাহাকে আল্লাহ্‌পাক কুরআন মজীদে অভিশপ্ত করিয়াছেন? আমি বলিলাম, আব্বাজান! কুরআন মজীদের কোন্ জায়গায় আল্লাহতায়ালা ইয়াজিদকে লা'নত করিয়াছেন! তিনি উত্তরে বলিলেন, এই আয়াতে যে আল্লাহপাক বলিয়াছেন, তোমরা যখন শাসক নিযুক্ত হইবে, তখন কি তোমরা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে এবং নিজের আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দিবে? এই প্রকার লোকগুলিকে আল্লাহ পাক অভিশপ্ত করিয়াছেন।"

'তাফসীরে মাজহারী' নামক কিতাবে 'সূরা ইব্রাহীমে' কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) বলিয়াছেন-

قلت اما بنو امية فمتعوا بالكفر حتى اسلم ابوسفيان ومعاوية وعمر وبن العاص وغيرهم ثم كفر يزيد ومن معه بما انعم الله عليهم وانتصبوا العداوة آل محمد وقتلوا حسينا ظملا وكفر يزيد بدين محمد صلى الله عليه وسلم.

"আমি বলি যে, বানু উমাইয়া কুফরী দ্বারা ফায়দা উঠাইয়াছে, এমনকি আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর ইয়াজিদ ও তাহার সহচরবৃন্দ আল্লাহর নেয়ামতের সহিত কুফরী করিয়া বসিল, যে নেয়ামত আল্লাহপাক তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। তাহারা মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বংশধরগণের সহিত সক্রুতা করিল এবং হযরত ইমাম হুসাইনকে জুলুম ও কুফরীর সহিত হত্যা করিল। অতঃপর ইয়াজিদ হযরত মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর ধর্মের সহিত কুফরী করিল।"

হযরত শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহ্লভী (রঃ) 'আশ্য়াতুল লুমআত' নামক কিতাবে বলেন– آں شقى بدار البوار رفت "ঐ দুষ্ট পাপাচারী ইয়াজিদ জাহান্নামে গেল।"

শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহ্লভী (রঃ) 'তাক্মিলুল্ ঈমান' কিতাবে ইয়াজিদের কুফরী সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং উত্তর সহকারে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন।

'জাজ্বুল কুলুব' নামক কিতাবে ইয়াজিদের জুলুম ও অত্যাচার পূর্ণ কাজগুলি লিপিবদ্ধ আছে।

ইমাম কুরতবী বলেন– ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া মুসলিম ইবনে ইত্বাকে বিরাট সৈন্য বাহিনীর সেনাপতিত্ব দান করিয়া মদীনায় পাঠাইয়া দিল এবং ঐ সৈন্যবাহিনী দ্বারা তিন দিন পর্যন্ত মদীনা মোনাওয়ারার বে-ইজ্জতি করা হইল, আর মদীনা শরীফে সতরশ' মুহাজির ও আনসার তাবেয়ী আলেমগণকে হত্যা করা হইল। সাতশ' হাফেজে কোরআন এবং সাতান্নব্বই জন কুরাইশী লোককে কতল করা হইল। মদীনা শরীফে লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, ব্যভিচার প্রভৃতি



ঘৃণিত কাজ জায়েয করা হইল। এমনকি তাহাদের এই ব্যভিচারের পরবর্তী সময়ে একহাজার নারী অবাঞ্ছিত সন্তান প্রসব করিল। মসজিদে নববীর মধ্যে ঘোড়া বাঁধা হইল এবং তিনদিন উক্ত মসজিদে আজান দেওয়া হয় নাই। হযরত ছায়ীদ ইবনে মুছাইয়াব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "আমি তিনদিন পর্যন্ত হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাজার শরীফ হইতে আজান শুনিয়া নামাজ আদায় করিয়াছি এবং আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম।"

ইয়াজিদকে পূজা করিবার বাইয়াত গ্রহণের জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করা হইল যে, যদি ইয়াজিদ ইচ্ছা করে, তবে তোমাদিগকে রাখিবে অথবা বিক্রয় করিয়া দিবে। আর যখন পাপিষ্ট ইয়াজিদের সামনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জমআ' (রাঃ) কুরআন শরীফের বাইয়াত করার শর্ত আরোপ করেন, তখন তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হইল। ইন্না লিল্লাহে .........।

আসল কথা হইল যে, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ, হযরত শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহ্লভী, ইমাম কুরতবী, ইমাম ইবনে জাওজী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হান্জালা, আল্লামা ইবনে কছির, ইমাম ওয়াকিদী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গছিলে মলায়েকা, আবদুল্লাহ ইবনে আবি আমর ইবনে হাফছ, মুজাদ্দেদ আল্ফে ছানী, হাফেজ ইবনে হাজর আস্কালানী, শাহ্ আবদুল আজিজ মুহাদ্দেছে দেহলভী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত কাজী আবু ইউলা, হযরত ছালেহ ইবনে আহমদ, কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী, ইমাম জালালুদ্দিন ছাইয়ূতি, ইবনে হাজর হায়তামী, বাহ্রুল উলুম আবদুল আলী, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, আল্লামা ছৈয়েদ আমীর আলী, আল্লামা তাফ্তাজানী প্রমুখ মনীষীগণ পাপিষ্ট ইয়াজিদকে অভিশপ্ত ও জাহান্নামী বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। এমনকি কোন কোন মনীষীগণ তাহাকে কাফের বলিয়া মনে করেন।

ইয়াজিদের জুলুম ও অত্যাচার পূর্ণ ঘৃণিত কাজগুলি সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহার দ্বারা হুসাইন হত্যায় সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) এর বংশধরগণের অপমানিত করার প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন আল্লামা

তাফ্তাজানী (রঃ) এর 'শরহে আকায়েদ' নামক কিতাবে আছে–

والحق ان رضا يزيد بقتل الحسين استبشاره بذلك واهانته اهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم لما تواتر معناه وان كان تفاصيله احاد.

অর্থাৎ সত্য কথা এই যে, হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)কে হত্যা করার ব্যাপারে ইয়াজিদের সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং ইহাতে রাজী থাকা, আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধরগণকে অপমানিত করার ব্যাপারটি অগণিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, যদিও ইহার বিস্তারিত বিবরণে মতবিরোধ রহিয়াছে।

হযরত বাহ্রুল উলুম আল্লামা আবদুল আলী (রঃ) 'শরহে মুসাল্লামুচ্ছবূত' কিতাবে বলিয়াছেন–

ان يزيد كان من اخبث الناس وكان بعيد المراحل من الامانة بل شك فى ايمانه خذله الله.

অর্থাৎ "ইয়াজিদ অত্যন্ত অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল এবং সে ইমামত তথা খেলাফতের পদ উপযোগী হইতে শুধু অনেক দূরে ছিল না বরং তাহার ঈমানে সন্দেহ আছে। আল্লাহ তাহাকে লাঞ্ছিত করুন।"

উল্লেখিত মাছয়ালাটির বিস্তারিত বিবরণ এই কিতাবে সংকুলান হইবে না। যদি আরও অধিক তথ্য লাভের ইচ্ছা হয়, তবে 'তাকমীলুল ঈমান', 'জাজ্বুল কুলুব', ইমাম ওয়াকিদীর 'কিতাবুল হুর্‌রা', 'আশয়াতুল লুমআত', মুজাদ্দেদে আল্‌ফে ছানীর 'মক্‌তুবাত' 'ফতহুল বারী', 'তাফসীরে মাজহারী', শাহ্ আবদুল আজীজ প্রণীত 'ছির্‌রুশ শাহাদাতাইন', 'ছওয়ায়েকে মুহ্‌রেকা' 'তারিখুল খোলাফা' শরহে আকায়েদে নছফী' 'বাহ্রুল উলুম শরহে মুসাল্লামুচ্ছবূত' 'হাশিয়ায়ে নিব্‌রাছ' 'তফসীরে মুয়াহিবুর রহমান' 'বেদায়া নেহায়া', মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খাল্‌দুন' প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী পাঠ করুন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

# মুর্শেদে বরহক আল্লামা আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.) এর রচয়িত কিতাব সমূহের তালিকা

১। ফরমানে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
২। ফজায়েলে দরুদ শরীফ।
৩। আল্-বায়ানুল মোছাফ্ফা ফী মাস্‌য়ালাতে আবদিল মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৪। আত্-তোহ্ফাতুল মাতলুবা।
৫। এরশাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৬। আযানের আগে দরুদ পড়া জায়েজ।
৭। আস্-সায়েক্বাহ্।
৮। আল্-ক্বাওলুল হক।
৯। শানে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১০। আল্-বোরহান।
১১। আল্-বায়ানুন্নাজীহ ফী নেজাতে আম্মিন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১২। আত্-তোহ্ফাতুল গাউছিয়া।
১৩। কেফায়াতুল মোবতাদী ফী মোছ্তালেহাতে হাদিছুন্ নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১৪। আত্তাওজীহুল জামিল বে-শর্হে হাদীসে জিব্রীল।
১৫। উসূলে তাফসীর।
১৬। আত্তাহ্কীকুল আ'জীব আ'লা ছলাতিন নাবীয়্যীল হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১৭। শরহে মজমুয়ে শত্ আহাদীছ।
১৮। নেদায়ে এয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১৯। এমতেনায়ুন নজীর।
২০। আদ্দালায়েলুল ওয়াজেহাত ফী হুকমীচ্ছুজুদিত্ তাহিয়াহ্।
২১। আররেসালাতুল জালিল আন তান্‌জিহতিল মাছীল।
২২। তাজ্‌কেরাতুল মাক্বামাতির রাফীয়াতে লিল-ইমাম আবি হানিফাহ্ ফীল আহাদীছিন্ নববীয়াহ্।
২৩। আচ্ছালাতুত্ তা-তাউওয়ায়ু বে-ইক্বতেদায়ীল মুতাউয়ে।

## প্রাপ্তিস্থান

- ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা
- হাটহাজারী আনোয়ারুল উলুম নোমানিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা
- বেতবুনিয়া মুঈনুল উলুম রেজভীয়া সাঈদীয়া দাখিল মাদ্‌রাসা
- কাজেমী মিলনায়তন
  ৩৪৫/২, কদম মোবারক, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
- মোহাম্মদী কুতুবখানা
- রেজভী কুতুবখানা
  শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- আল্লামা ফরহাদাবাদী ও ইমাম শেরে বাঙ্গালা (রহঃ) একাডেমী
  ১৫, শাহ আমানত (রহঃ) মাজার শরীফ লেইন, চট্টগ্রাম।